বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদের সময়কাল

মোহাম্মদ খোশবু

বাংলাদেশের

ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

এরশাদের সময়কাল

মোহাম্মদ খোশবু

স্টুডেন্ট ওয়েজ
ঢাকা

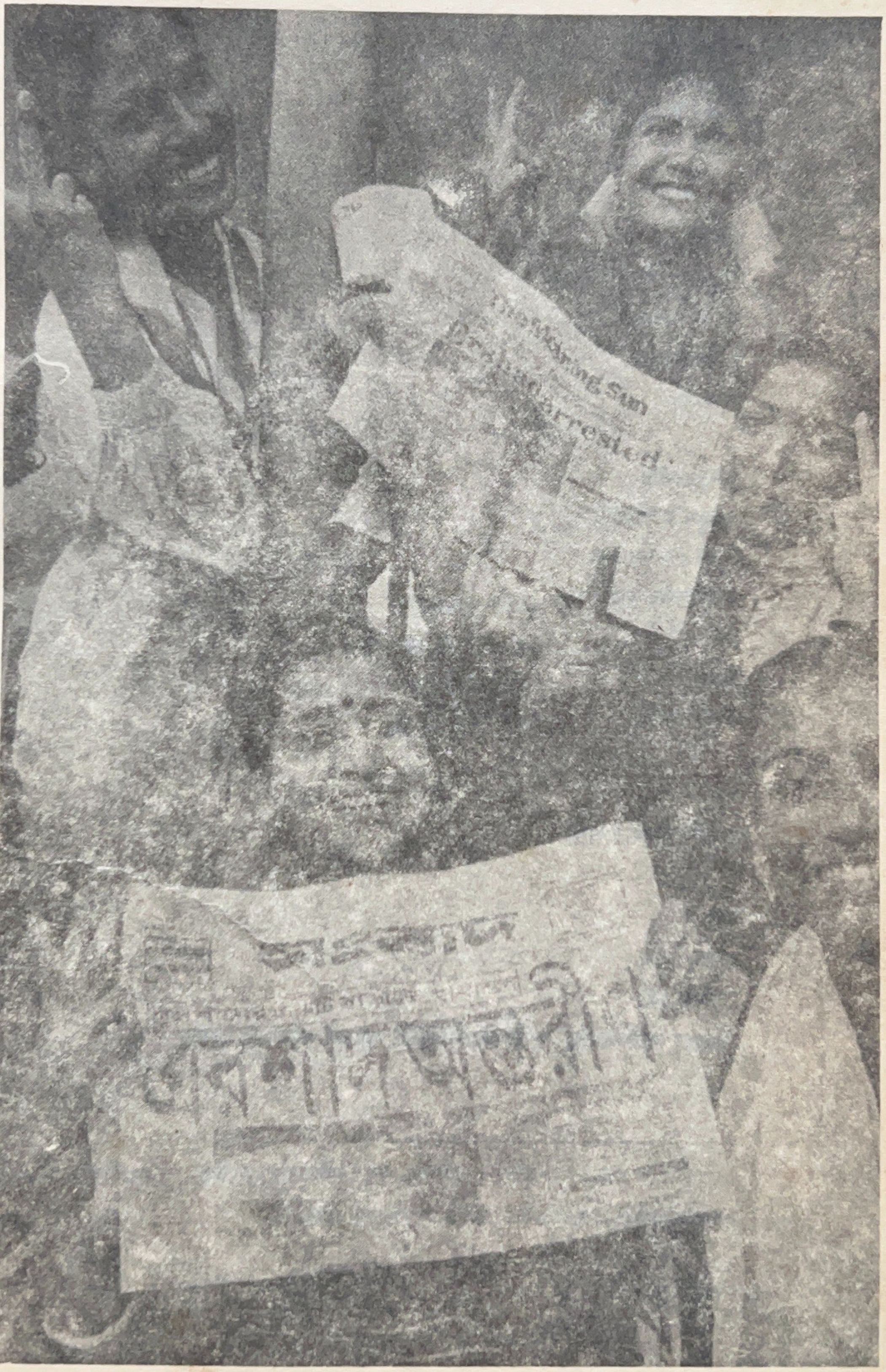

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৩৯৭
ফেব্রুয়ারী ১৯৯১

প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
স্টুডেন্ট ওয়েজ
৯ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

অক্ষর বিন্যাস
সুন্দরম কম্পিউটার
৮ নর্থ ব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ
কাজী আজাদ

স্বত্ব
মাহমুদ রায়হান প্রান্ত

মূল্য
সুলভ: ৮৫
শোভন: ১২৫
ভেতরের আলোকচিত্র দু'টো আলোকচিত্রী পাভেল রহমানের তোলা

HISTORY OF THE STUDENT MOVEMENT IN BANGLADESH (ERA OF ERSHAD), 1982-1990,
BY MOHAMMED KHUSHBU, STUDENT WAYS, DHAKA.

PRICE $10

আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব
জনাব হারুন উর রসিদ মন্টু
এবং প্রয়াত শামসুজ্জামান চৌধুরী
এই দুই মুক্তিযোদ্ধাকে

নান্দীপাঠ

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস: এরশাদের সময়কাল, গ্রন্থটি একটি সময়ের দাবী।
এই দশকের সবচেয়ে বড় ঘটনা জেনারেল এরশাদের মতো একজন সমরনায়ক ও স্বৈরশাসকের পতন।

১৯৯০ সালের শুরুতেও কেউ ভাবে নি, রাজনৈতিক মঞ্চের এই একনায়কের এতো দ্রুত পতন ঘটবে। অথচ ১৯৮২ সালে তিনি যখন বন্দুক কাঁধে নিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতায় আবির্ভূত হন, তখন অনেকেই ভাবতে পারেন নি, এই গ্রহের পতন হতে এতো সময় লাগবে।

কারণ এই সময়ের রাজনীতিবিদগণ চরম চরিত্রহীনতার পরিচয় দেন। দেখা যাচ্ছিল, জেনারেল এরশাদ যে দলে হাত দিয়েছেন, সেই দল থেকেই যে কোনো রাজনীতিবিদ কিনতে সক্ষম হয়েছেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে বেশী এরশাদ বিরোধী ভূমিকা নিতে দেখা গেছে, তাঁকেই দেখা গেছে পরদিন এরশাদের মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েছেন। খুব কম রাজনীতিবিদই ছিলেন যার ঈমানের জোর দৃঢ় ছিল।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। বস্তুত রাজনীতিবিদদের বিশ্বাসভঙ্গই এরশাদ সময়কাল অতি দীর্ঘ হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের নায়ক এদেশের ছাত্র সমাজের ক্লান্তিহীন লেগে থাকাই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতিতে নিয়ে যেতে সক্ষম

হয়। ছাত্র সমাজের সেই বীরগাঁথা লেখাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে এই সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাও প্রাসঙ্গিক কারণে এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

তবে অত্যন্ত ঘটনাবহুল এই সময়ের ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন সংগঠনের আন্ত:ঘটনাবলী, সম্মেলন, একীভূত হওয়া, ভাঙন, মতাদর্শগত বিরোধ ইত্যাদি বিষয়ের কাহিনী এই গ্রন্থে উপস্থাপন করা সম্ভব হল না একমাত্র সময়ের অভাবে।

এরশাদ আমলের আর্থ–সামাজিক অবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরাও আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একই কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠলো না

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বিভিন্ন দলিল সহযোগে এই সময়ের ছাত্র আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র রূপায়ণ করার ইচ্ছা রইলো।

'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস' নামে একটি ধারাবাহিক গ্রন্থের চার খন্ড বাজারে রয়েছে। এর লেখক মোহাম্মদ হাননানের কাছে আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী এই জন্যে যে, তাঁর কাছ থেকে ইতিহাসের বৃহত্তর স্বার্থে গ্রন্থের এই শিরোনাম ব্যবহারে অনুমতি নিতে পারি নি। যদিও এই ধরণের ঘটনা শিষ্টাচার বহির্ভূত।

গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে যাদের পরিশ্রম ও সহায়তা আমাকে উৎসাহিত করেছে তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

তবে বিশেষ করে বন্ধু প্রতীম ইলিয়াস মল্লিক, এনায়েত হোসেন খান, মিজানুর রহমান মতি, আবুদল বারেক এবং মোঃ শাজাহানের উৎসহ ও আগ্রহ এই গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশক নিশ্চিত করেছে।

প্রকাশক জনাব লিয়াকতউল্লাহ স্বল্প সময়ে এই গ্রন্থের প্রকাশনার ঝুঁকি নেওয়ায় আমি যথার্থ অর্থেই বিস্মিত হয়েছি।

স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য ও ইতিহাসের উপাদান সংযুক্ত করে এই গ্রন্থকে আকর্ষণীয় ইতিহাসোচিত করার প্রচেষ্টা আমার ছিল, তা পাঠক হৃদয়ে সামান্যতম অনুরণন ঘটলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

মোহাম্মদ খোশবু
পয়লা ফাল্গুন
১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১

সূচীপত্র

এরশাদের ক্ষমতা দখল নাটক ১
এরশাদ আগমনকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ২
এরশাদের সামরিক আইন জারীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ৩
৮২ সালের ছাত্র রাজনীতির অবস্থা ৪
এরশাদ আমলে রাজপথে প্রথম ছাত্র মিছিল ৬
শিক্ষা দিবস সামনে রেখে প্রস্তুতি ৭
এরশাদ আমলে ছাত্রদের প্রথম বিবৃতি ৮
মজিদ খানের শিক্ষানীতি নিয়ে সূত্রপাত ৯
৮ নভেম্বর (১৯৯২)র নাটকীয় ঘটনা ১১
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও সাংবাদিক সম্মেলন ১৩
১১ জানুয়ারী: ভেতরের কাহিনী ১৫
ছাত্রদের সাথে জেনারেলদের বৈঠকের চেষ্টা
জিয়াউদ্দিনবাবলুর গোপন যোগাযোগ ১৬
পনের দল ও সাত দল গঠন ২১
মধ্য ফেব্রুয়ারীর ঘটনা ২১
জিয়াউদ্দিন বাবলু: অথঃ সমাচার ২৩
১০ দফা প্রণয়ন ২৪
জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন মতাদর্শগত লড়াই ২৪
সচিবালয় ঘেরাও: ১৯৮৩ ২৯
সেলিম দেলোয়ার ও তাজুল হত্যা ৩০
এরশাদের 'ছোটভাই' ৩২
৮ ডিসেম্বর হরতাল এবং অন্যান্য ঘটনা ৩৩

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি	৩৪
ঢাকায় মহাসমাবেশ: অর্থনীতিতে লুটপাট	৩৪
এরশাদ: 'আমি পিতা হতে চলেছি'	৩৬
বসুনিয়া হত্যা	৩৭
১৯৮৬: নির্বাচন বিতর্ক: আসলাম হত্যা	৩৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধ	৪২
ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনের মামলা পুনরুজ্জীবন	৪৫
১৯৮৬: অর্থনৈতিক অবস্থা	৪৭
কবির লড়াই: ১৯৮৭	৪৯
পাসকোর্স ছাত্র আন্দোলন	৪৯
১৯৮৬–৮৭: শিক্ষা চিত্র	৫০
তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ: পত্রিকা নিষিদ্ধ করার কৃতিত্ব	৫২
সিলেটে মাদ্রাসার ছাত্রদের স্কুল বালিকাদের উপর হামলা	৫২
শহীদ মিনারে জাতীয় নেতাদের ছবি: ১৭ ছাত্র সংগঠনের বিবৃতি	৫৩
বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ	৫৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবাঞ্ছিত বন্ধ থাকার খতিয়ান	৫৬
ছাত্রদলে আরেকদফা ভাঙন	৫৭
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য বিরোধী আন্দোলন	৫৯
ছাত্রদল নেতা বাবলু নিহত	৫৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র ইউনিয়নের প্রত্যাবর্তন	৬২
কুড়িগ্রামে কিশোর ছাত্র নতুনকে হত্যা	৬২
'রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত ও সামরিক ব্যক্তিকেরাজনী তিমুক্ত কর'	৬৩
জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল: বন্দুক লড়াই	৬৪
এরশাদের ভাষণ: জাতীয় ছাত্র সমাজ বিলুপ্ত	৬৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসী ছাত্রদের বহিষ্কার	৬৮
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: ১৯৮৭	৭১
ছাত্র বেতন ও বাজেট বিরোধী ছাত্র আন্দোলন: ১৯৮৭	৭২
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন	৭৩

ছাত্রদের আবার শিক্ষা আন্দোলনে প্রত্যাবর্তন ৭৩
নভেম্বর আন্দোলন: ১৯৮৭ ৭৪
আতাউস সামাদ গ্রেফতার এবং বিবিসি নিষিদ্ধ ৭৭
'হরতাল ও ধর্মঘট' শব্দ উধাও ৭৯
ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী: ১৯৮৮ ৮০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ ৮১
শিল্পীদের টেলিভিশন বর্জন ৮২
২৪ জানুয়ারী (১৯৮৮): চট্টগ্রাম ঘটনা ৮২
এরশাদকে 'বিশ্ব বেহায়া' খেতাব প্রদান ৮৪
হাসিনা–খালেদা যুক্ত ঘোষণা ৮৫
২২ ছাত্র সংগঠনে ভাঙন ৮৬
আ. স. ম রবকে 'ক্লাউন' খেতাব প্রদান ৮৭
আওয়ামী লীগের সভায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন ৮৮
রাষ্ট্রধর্ম বিল ও ছাত্র বিক্ষোভ ৮৯
'আল্লাহর বিরুদ্ধে হরতাল' ৯৩
গোলাম আযম বিতর্কে আলেম সমাজ ৯৪
হাসনা মওদুদের লাঞ্ছনা ৯৫
মন্ত্রীর বাড়ীতে আবার খুনের আসামী ৯৬
শিল্পীদের উপর পুলিশের বীরত্ব ৯৬
'মুক্তিযুদ্ধে আলেম সমাজ' সেমিনার ৯৭
ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল মতাদর্শগত লড়াই ৯৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদে ভাঙন ৯৯
বার্মার ছাত্র আন্দোলনে সংহতি ১০১
নীরুর বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে ছাত্রদলের আন্দোলন ১০২
বন্যায় আর্তের সেবায় ছাত্র সমাজ ১০৪
১৯৮৯: শুরুতেই মাওলানা সাঈদী ১০৫
সাঈদীর প্রতি আলেমদের চ্যালেঞ্জ: কাফের ঘোষণা ১০৮
'অস্ত্র দ্বারা রাজনীতি নয়, রাজনীতি দ্বারা অস্ত্র নিয়ন্ত্রিত হোক' ১১০

'ছাত্রদের শুধু বই পড়লে চলবেনা' ১১২
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন: ১৯৮৯ ১১৩
ছাত্রীদের বিজয় মিছিলে হামলা ১১৪
ডাকসু নির্বাচন নিয়ে খালেদা জিয়ার অভিযোগ ও বাদানুবাদ ১১৫
ডাকসুর অভিষেকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ১১৬
ইউকসু, রাকসু ও বাকসুতে নির্বাচন ১১৭
নকলের বিরুদ্ধে যুব আন্দোলন ১১৮
শিবিরের টুপীর ভেতরে বোমা ১১৮
বি. সি. এস অফিসারদের ক্ষোভ ১১৯
অশোভন উক্তির প্রতিবাদে নারী সংহতি ১১৯
চীনের ছাত্র আন্দোলনে বাংলাদেশের দুটি সংগঠন ১২০
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কনভেনশন ১২০
ডাকসুতে অশনি সংকেত ১২২
ছাত্রদলের ঠেকে শেখা ১২৩
খালেদা জিয়ার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি ১২৪
সুপ্রীম কোর্টে এরশাদ পরাজিত হলেন ১২৭
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে ভাঙন ১২৮
তিব্বতের আদর্শ ও ড: আশরাফ সিদ্দিকীর আহ্বান ১৩৩
হরিপুরের তেল নিয়ে যুব আন্দোলন ১৩৫
খালেদা জিয়ার অনশন: ডান-বাম, রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধার সম্মিলন ১৩৫
এরশাদের সাথে ছাত্রনেতাদের বৈঠক ১৩৬
আবার সাম্প্রদায়িকতা: ১৯৮৯ ১৩৭
থিয়েটারের উৎসব: উৎসের সন্ধানে ১৩৮
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতীক অনশন ১৩৯
হাসিনার সশস্ত্র বিপ্লব ও খালেদার ফাইনাল খেলা ১৩৯
বাংলার মানুষ দু'টি স্বাধীনতা ও ১১টি সরকার দেখেছে ১৪০
আরিফ হত্যা: শোকের নিস্তব্ধতা ১৪০
বিশ্ব ছাত্র ধর্মঘট ১৪১

কিশোরগঞ্জে পীরদের সশস্ত্র যুদ্ধ	১৪২
১৯৮৯ ছিল এরশাদের সুখের সংসার	১৪২
কমিউনিস্ট পার্টির পদযাত্রা	১৪৪
'পরাজিত হয় না মানুষ'	১৪৪
ছাত্রনেতা চুন্নু নিহত	১৪৫
আ. স. ম রবের বায়না	১৪৫
সিলেট, খুলনায় স্থানীয় আন্দোলন	১৪৭
মন্ত্রিসভা উপচে পড়লো	১৪৮
নীরুর কারাউত্তর সংবর্ধনা	১৪৮
জ্যোতি পাউডারে মাননীয় মন্ত্রীরা	১৪৮
ডাকসু নির্বাচন:১৯৯০	১৪৯
হাসনাতের ডিগবাজী: রাজনীতিকদের চরিত্রহীনতা	১৫১
'শেষবারের মতো প্রার্থী হব'	১৫২
'ছাত্ররা শুধুমাত্র ছাত্র নয়'	১৫২
'এমন মজাদার দেশ কোথাও দেখিনি'	১৫২
'একাত্তরের চেয়ে ১৫ আগস্ট বড়'	১৫৩
'জয় বাংলা আর নতুন বাংলারা দেশকে ধ্বংস করছে'	১৫৩
নিউজপ্রীন্টের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ	১৫৪
সারাদেশে ডাক্তারদের লাগাতার ধর্মঘট	১৫৫
ডাকসুর উদ্যোগে ছাত্র কনভেনশন: ১৯৯০	১৫৬
১০ অক্টোবর (১৯৯০): মোড় পরিবর্তনের সূচনা	১৫৬
সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন	১৫৮
শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্র: উচ্চমহলের সকলেই জড়িত	১৬৩
বিভিন্ন জেলায় ক্ষুব্ধ গর্জন	১৬২
জয় বাংলা বিতর্ক এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনতার অভিযোগ	১৬৭
গণঅভ্যুত্থানের সম্ভাবনা	১৬৯
সারাদেশে রাজপথ, রেলপথ, পানিপথ অবরোধ	১৭০
আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: ইনকিলাব, ভোআ ইত্যাদি	১৭১

জেলায় জেলায় ছাত্রনেতাদের গণসংযোগ	১৭৪
'বিদায় না দিয়ে ঘরে ফিরব না'	১৭৬
'বিরোধী আন্দোলন শীতকালীন মেলা'	১৭৭
রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঘেরাও	১৭৮
ছাত্র-শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিল	১৭৯
মন্ত্রিপাড়া ঘেরাও: 'লাশ হয়ে ফিরে যাবে'	১৮১
এরশাদের প্রতি প্রশ্ন: কোন সংবিধান বলে ক্ষমতায় এসেছিলেন?	১৮২
শিক্ষক মোর্চা গঠন	১৮৩
অভির মুক্তি লাভ এবং শঙ্কা	১৮৪
যুব মোর্চা গঠন	১৮৪
গণদুশমন ঘেরাও এবং পাল্টা গুন্ডা সমাবেশ	১৮৪
আমলাদের উপর হামলা	১৮৬
সচিবালয়ে 'লিফলেট'	১৮৭
তিন জোটের যৌথ ঘোষণা	১৮৮
জাতীয় পার্টির সমাবেশ বানচাল	১৮৯
নীরু-অভি বাহিনীর অভিযান: সরকারের মুখোশ উন্মোচন	১৯০
অবশেষে খালেদা জিয়ার বোধদয়: নীরু-অভি বহিষ্কার	১৯০
২৫ নভেম্বর (১৯৯০): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা	১৯১
ডা: মিলন হত্যা: আগুন ছড়িয়ে পড়লো	১৯৬
সংবাদপত্রে ধর্মঘট: শিক্ষকদের পদত্যাগ: এরশাদের টঙ্গি ব্রীজ পরিদর্শন	১৯৮
গুলী: হত্যা: গায়েবানা জানাযা	১৯৯
ভ্রাম্যমান আদালতে এরশাদের ফাঁসি কার্যকর	২০০
সচিবালয়ে মিছিল	২০০
'এরশাদ কাইত হইছে'	২০১
অবশেষে এরশাদের পদত্যাগ: মুক্তির আনন্দে বিজয় উল্লাস	২০১
মন্ত্রীদের পলায়ন: মানুষের নৃত্য	২০২
সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতায়	২০৩
বিশ্ব বেহায়ার বিদায়	২০৪
ইতিহাসের শিক্ষা	২০৪

গণতন্ত্র
মুক্তি
পাক

এরশাদের ক্ষমতা দখল নাটক

২৩ মার্চ (১৯৮২) দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত দু'টি খবর পড়ে দেশবাসী চমকে ওঠে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল (বি. এন. পি) তখন ক্ষমতায়। খবর দু'টি হলো, বি. এন. পি আমলেরই যুবমন্ত্রী (সম্প্রতি মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়েছিল) আবুল কাশেমের মিন্টু রোডের সরকারী বাসভবন থেকে খুনের আসামী কুখ্যাত ইমদাদুল হক ইমদুকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

অপর খবরটি একইরকম চাঞ্চল্যকর। বি.এন.পি মন্ত্রিসভা থেকে কয়েকদিন আগে বাদপড়া একজন উপপ্রধানমন্ত্রী এস. এ বারী এ. টি এবং মন্ত্রী কে. এম. ওবায়দুর রহমান বাংলাদেশ হাইকোর্টে অগ্রীম জামিনের জন্যে আবেদন করেছেন।

দেশবাসী বুঝতে পারছিল একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু তা এতোটা তড়িৎগতিতে ঘটবে তা কেউ আশা করে নি। লেফট্যান্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতার হিস্যার দাবীতে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সাপ্তাহিক হলিডে, তাঁর সামরিক হিস্যার দাবীর উপর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধগুলির মূল বিষয়, জেনারেল এরশাদ 'বাংলাদেশ আর্মী জার্নাল' এর ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী সংখ্যায়ও একবার প্রকাশ করেছিলেন। এর মূল বক্তব্য ছিল, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং বাংলাদেশের মতো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে তা হবে একটি ন্যায্য প্রক্রিয়া।[১]

সাবেক যুবমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি আবুল কাশেমের বাড়ীতে সেদিন সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল, অথবা ঘটনা সাজানোর জন্যে কি কি ষড়যন্ত্র হয়েছিল তা এখনো রহস্যময় হয়ে আছে। তবে ২৩ মার্চের এই ইমদু

কাহিনী যাতে ২৪ মার্চে সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়, তার জন্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিদপ্তর খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে।

জেনারেল এরশাদের পক্ষে আর ধৈর্য ধরা সম্ভব ছিল না। তিনি তড়িঘড়ি করে বেতার ও টেলিভিশনে এক বক্তৃতায় জাতির উদ্দেশ্যে সামরিক শাসন জারীর কথা ঘোষণা করেন। বি.এন.পি-র নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার পদত্যাগ করেন এবং তিনিও জাতির উদ্দেশ্যে এক নজিরবিহীন ভাষণে এরশাদের উদ্যেগের মঙ্গল কামনা করেন। নজিরবিহীন এই কারণে যে, ক্ষমতাচ্যুত ও ক্ষমতা গ্রহণকারী দু'জনই অভ্যুত্থানটির সাফাই গান।

২৫ মার্চ (১৯৮২) সংবাদপত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪জন ছাত্রনেতাও এরশাদের সামরিক আইন জারীর ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। এরা হচ্ছেন, মহসিন হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মজিবুল হক চুন্নু ও জামালউদ্দীন আহমদ এবং এফ. রহমান হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান মাসুম ও সোহেল রানা।

সামরিক আইনের সাথে সান্ধ্য আইনও (কারফিউ) জারী করা হয়েছিল। ২৫ মার্চ ১১৫ জন, ২৮ মার্চ ২৩৩ জন এবং ২৯ মার্চ ২৬৫ জনকে সান্ধ্য আইন লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেফতার করার খবর প্রকাশিত হয়।

৯ এপ্রিল বি.এন.পি আমলের কুখ্যাত সন্ত্রাসী 'গালকাটা কামাল' খ্যাত খুনী আসামীর বিচার শুরু হওয়ার খবর প্রচার করা হয়। ৯ এপ্রিল বলা হয়, বি. এন. পি আমলের মাথাভারী প্রশাসন ছোট করা হবে। পদক্ষেপ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৪২ থেকে ১৭ তে নামিয়ে আনা হয়।

১১ এপ্রিল জেনারেল এরশাদ যিনি নিজেকে এরই মধ্যে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন, ঢাকা জেলা ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সদস্যদের উদ্দেশ্যে ঢাকায় এক গরম বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, 'আমি এমন এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো, যা ইতিহাস হয়ে থাকবে'।[২]

এরশাদ আগমনকালীন রাজনৈতিক অবস্থা

১৪ এপ্রিল দৈনিক দেশ 'বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গন এখন নীরব' শীর্ষক একটি ছোট খবর পরিবেশন করে। এই সময়ে মূল রাজনৈতিক সভা সমাবেশ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হতো এবং বি.এন.পি. দলীয় জিয়া ও সাত্তার

সরকারের বিরুদ্ধে ১০ দলীয় জোটের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বায়তুল মোকাররম বেশ সরব হয়ে উঠেছিল। এরই মধ্যে ২৪ মার্চ এরশাদ কর্তৃক রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ফলে বায়তুল মোকাররম চত্ত্বর নীরব নিভৃত অঙ্গনে পরিণত হয়।

মার্চ মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রনেতা, বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ছাত্র সদস্য, রাকসু নেতৃবৃন্দ প্রমুখের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

জেনারেল এরশাদ সাইকেলে চেপে অফিসে যাচ্ছেন এমন এক ছবি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয় এবং সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। কৃচ্ছতাসাধন এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রকাশ করা হয়। (পরবর্তীকালে এরশাদ সাইকেল থেকে হেলিকপ্টারে চলে আসেন, এমনকি প্রতি শুক্রবার জুমআ নামাজ পর্যন্ত তিনি হেলিকপ্টারে চড়ে আদায় করতে আটরশি যেতেন)।

এরশাদের সামরিক আইন জারীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক প্রতিবাদ

কিন্তু বায়তুল মোকাররম নীরব থাকলেও নতুন করে সামরিক শাসন জারীর প্রতিবাদে ২৪ মার্চ রাতেই ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সকাল বেলায়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলি আক্রান্ত হয়। খোদ সামরিক বাহিনীই হলগুলোতে চলে আসে। প্রচন্ড ত্রাস সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। সামরিক আইন জারীর কয়েকদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দেশ দিয়ে পোষ্টার তোলা হচ্ছিল। 'হোয়াইট ওয়াশ' চলে দেওয়ালগুলিতে ক্রমাগত।

কিন্তু পাল্টা পোষ্টারও পড়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর ৩ জন ছাত্রনেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে রাতের অন্ধকারে পোষ্টার লাগাতে গিয়ে ধরা পড়ে। এতে কাইয়ুম শিবলী, হাবিব ও আঃ আলী সহ ৫ জনকে সামরিক আদালতে পরে ৭ বছর করে কারাদন্ড দেওয়া হয়।

কথায় কথায় তখন ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢুকতে শুরু করে দিল। এমন একটা অবস্থায় ছাত্র সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে কিছু করার জন্যে ঘন ঘন বসতে থাকে। পোষ্টার লাগাতে গিয়ে যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের মুক্তি চেয়ে প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলি একটি বিবৃতি দেয়। কিন্তু সরকার তা পরদিন কাগজে প্রকাশ করতে দেয় নি।

৮২ সালের ছাত্র রাজনীতির অবস্থা

আন্দোলন গড়ে তোলার এই পর্যায়ে তৎকালীন ছাত্র সংগঠনগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

সামরিক শাসন জারীর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে। এতে দ্বিধাবিভক্ত জাসদপন্থী ছাত্রলীগ থেকে বেরিয়ে আসা নবগঠিত বাসদ ছাত্রলীগের নেতা আখতারুজ্জামান ও জিয়াউদ্দিন বাবলু ডাকসুর সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

জাতীয় রাজনীতিতে তখন ১০ দলীয় জোট নামে একটি মাত্র বিরোধী জোট আন্দোলনে সক্রিয় ছিল, এতে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সকলেই সংশ্লিষ্ট ছিল। মূলতঃ ক্ষমতাসীন জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে এই জোট গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, গণআজাদী লীগ, বাকশাল, জাতীয় একতা পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল এই ১০ দলীয় জোট।

প্রধানভাবে এই ১০ দলীয় জোটের ধারাতেই এদের মিত্র ছাত্র সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতো। ১৯৮১ সালে ডাকসু নির্বাচনের সময় আখতার-বাবলুর নেতৃত্বাধীন বাসদ ছাত্রলীগ এই ধারার বাইরে ছিল। ফলে নির্বাচনে ১০ দলীয় রাজনৈতিক জোটের মিত্র ছাত্র সংগঠনগুলি একটি ঐক্যবদ্ধ প্যানেল দেওয়ার চেষ্টা করে।

এই সময় আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ দুটি সমান বিবদমান উপদলে বিভক্ত ছিল। একটি মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন ও খ. ম. জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বাধীন, তারা ছাত্রলীগ (জা-জা) নামে পরিচিত ছিল, অন্যটি ফজলুর রহমান ও বাহালুল মজনুন চুন্নুর নেতৃত্বাধীন, তারা ছাত্রলীগ (ফ-চু) নামে পরিচিত হতো।

জাসদ ছাত্রলীগ তখন মুনিরউদ্দিন আহমদ ও আবুল হাসিব খান নেতৃত্বাধীন এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক ও আনোয়ারুল হক। নবগঠিত ছাত্র একতা কেন্দ্র ও ছাত্র সমিতিও এই সময় ক্ষুদ্র আকারে সক্রিয় ছিল

ডাকসুতে আখতার-বাবলু পরিষদের বিপরীতে চুন্নু-আকাশ (আকাশ, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন) পরিষদ দেওয়ার কথা চলতে থাকে। কিন্তু জাসদ ছাত্রলীগ থেকে চুন্নু-হাসিব পরিষদ দেওয়ার দাবী তোলা হলে ১০ দলীয় রাজনৈতিক ধারায় ডাকসু নির্বাচন সম্ভব হয় নি। তবুও এই ৭টি ছাত্র সংগঠন এক হয়ে কাজ করতো।

বি.এন.পি.র প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশের প্রথম সামরিক রাষ্টপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরে জিয়ার হত্যাকারী হিসেবে ১১ জন সামরিক অফিসারকে ফাঁসি দিলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এর বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনে গড়ে ওঠে। এই সময় এই আন্দোলনে দুটো পৃথক জোট হয়। একটি ছাত্রলীগ (আওয়ামী লীগপন্থী), ছাত্রলীগ (জাসদপন্থী), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র একতা কেন্দ্র, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি সহ বিভিন্ন প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠন। মূলতঃ ১০ দলীয় রাজনৈতিক ধারার ভিত্তিতে এটি গঠিত হয়।

অন্য ছাত্র জোটটি গঠিত হয় ডাকসুর নেতৃত্বে বাসদপন্থী ছাত্রলীগ, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্র ঐক্য ফোরাম প্রমুখ সংগঠনকে নিয়ে।

ডাকসু নিবার্চনের পর কেবলমাত্র বাসদ ছাত্রলীগকে বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল সংগঠনের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের একটি জোরপ্রচেষ্টা চলে। বাসদ ছাত্রলীগকে বাদ দেওয়ার কথা ওঠে প্রধানতঃ তাদের পূর্ববর্তী সংগঠন জাসদ ছাত্রলীগ থেকে। মাহমুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান ও জিয়াউদ্দীন বাবলুর বিরুদ্ধে জিয়া সরকারের আমলে সরকারের সাথে জোগসাজস রয়েছে এবং তারা নিয়মিত বঙ্গভবনে যান বলে অভিযোগ আনা হয়েছিল। এসব নানা কারণ মিলিয়ে বহিষ্কার-পাল্টা বহিষ্কারে জাসদ ছাত্রলীগ থেকে বাসদ ছাত্রলীগ গঠিত হয়।[৩]

৭টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় ২৩ মার্চ (১৯৮২) রাতে। রাত ৯ টায় ছাত্র ইউনিয়নের হোসেনী দালানের অফিসে কর্মসূচী ঠিক করা হয় এবং ২৫ মার্চ জনসভা ডাকা হয়। জনসভাতেই সংগ্রাম পরিষদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার কথা হয়েছিল।

কিন্তু এভাবে শেষ পর্যন্ত আর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন সম্ভব হয় না। কারণ পরদিনই এরশাদের সামরিক শাসন চলে আসে। ফলে নতুন করে, নতুন ধাঁচে ছাত্র সমাজ আন্দোলন ও জোট গড়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

এরশাদ আমলে রাজপথে প্রথম ছাত্র মিছিল

এই সময় আন্তর্জাতিকভাবে একটি ঘটনা ঘটে। প্যালেস্টাইনের অধিকৃত অঞ্চলে তখন তীব্র দমন নীতি, হত্যা, গুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্ব, ইসরাইলের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের ছাত্র ও যুব মানসের মধ্যেও এর তীব্র প্রতিক্রিয়া পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশে তখন দু'এক মাস হয় সামরিক শাসন জারী হয়েছে। সকল প্রকার মিছিল-মিটিং ছিল নিষিদ্ধ।

কিন্তু ঘুম ভেঙে দিল জেনোরেল ইউনিয়ন অব প্যালেস্টাইনিয়ান স্টুডেন্টস-এর বাংলাদেশ শাখা। এর সদস্য ঢাকায় অবস্থিত প্যালেস্টাইনী ছাত্রনেতা জেহাদ, কাইওয়ান, আবদুল্লাহ তাকাশি, ছাকী প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মধুর কেন্টিনে বাংলাদেশের ছাত্র নেতাদের সাথে দেখা করে একটি যৌথ প্রতিবাদ সমাবেশের প্রস্তাব করেন। ঠিক হয় পরদিন (রোজার মাস ছিল এই সময়) জামাদুল বিদা, শুক্রবারে জুমআ নামাজের পরে বায়তুল মোকাররম থেকে প্রতিবাদ মিছিল করে ইসরাইলের মদতদাতা মার্কিন দূতাবাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে।

রমজানের শেষ জুমআ জামাতুল বিদার দিনে ছাত্ররা বায়তুল মোকাররম মসজিদে নামাজ আদায় করে মিছিল নিয়ে আদমজী কোর্টে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের দিকে মার্কিন-ইসরাইল বিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে অগ্রসর হতে থাকে।
রাস্তার দু'পাশের লোক অবাক হয়ে এই মিছিল অবলোকন করে। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ এই মিছিল সম্পর্কে কোনো কিছুই অবগত ছিল না। ফলে একেবারে নির্বিঘ্নে মিছিলটি দূতাবাসের সামনে চলে যায়।

বাংলাদেশে অবস্থিত প্যালেস্টাইনী ছাত্র ও নেতারা (উপরি উল্লিখিত ছাত্র নেতাদের সহ) এই মিছিলে অংশ নেয়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা খন্দকার ফারুক ও আনোয়ারুল হক, জাসদপন্থী ছাত্রলীগ নেতা মুনিরউদ্দিন আহমেদ, মুশতাক হোসেন এবং সলিমউল্লাহ খান, বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের শহিদুল ইসলাম প্রমুখ ছাত্রনেতা মিছিলটি পরিচালনা করেন।

বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা এই মিছিলে অংশ নেওয়ায় বাংলাসহ মোট ৩টি ভাষাতেই শ্লোগান দেওয়া হয়। ইংরেজীতে বলা হয়,'উই আর উইথ ইউ-প্যালেস্টাইন, প্যালেস্টাইন'। আরবীতে শ্লোগান দেওয়া হয়, 'তাব্বাত ইয়াদা-ইসরাইলু ইসরাইলু' (ইসরাইলের হস্ত ধ্বংস হোক)। আরবী শ্লোগানটি তৈরী করেন ছাত্রকর্মী মোহাম্মদ হাননান। ' তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবেউ' (আবু লাহাবের হাত ধ্বংস হোক) সুরার অনুকরণ করে এই শ্লোগানটি মিছিলেই তৈরী করা হয়।

শ্লোগান দিতে দিতে মিছিলটি মার্কিন দূতাবাসের অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ করে এবং কক্ষের আসবাব ভাঙচুর করে। ষ্টেটের প্রতীক বিশাল 'ঈগলে' একজন প্যালেষ্টাইনী ছাত্র একটি জুতা ঝুলিয়ে দেয়। কিংকর্তব্য বিমূঢ় প্রহরারত বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন কনষ্টেবল হটাৎ করেই এরপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং এক-দুই হাত মাত্র দূরে ছাত্রদের দিকে রাইফেল তাক করে গুলী ছুঁড়তে উদ্ধত হয়।

এই সময় একজন প্যালেষ্টাইনী ছাত্র তার শার্টের বুতোম খুলে নিজের বুক পুলিশের রাইফেলের নলের মুখে পেতে তাকে গুলী করতে আহবান জানালে বাংলাদেশের পুলিশ প্যালেষ্টাইনের অমিততেজা ছাত্রটির কাছে হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং রাইফেল নামিয়ে ফেলে।

ছাত্ররা তাদের বিজয় হয়েছে ভেবে শ্লোগান দিতে দিতে মতিঝিল থেকে দৈনিক বাংলা হয়ে শিশু একাডেমীর পাশ দিয়ে আবার মধুর কেন্টিনে ফিরে যাচ্ছিল। এই সময় বাঁশি বাজাতে বাজাতে সেনাবাহিনী ভর্তি কতকগুলি গাড়ী শাহবাগ-ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র-হাইকোর্ট রাস্তা দিয়ে আসছিল। সেনাবাহিনীর গাড়ীগুলিও এমন বন্ধের দিনে এবং সামরিক আইনের মধ্যেও এমন একটি মিছিল দেখে প্রথমে তারা একেবারে আর্শ্চযই হয়ে পড়ে এবং সকল গাড়ীর চাকাই মিছিলটির পাশ ঘেষে থেমে যায়। ছাত্ররা দেখতে পায় গাড়ীতে বসে আছেন স্বয়ং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

এইরকম একটি হতচকিত অবস্থায় ছাত্ররা যে যার মতো দৌড়ে পালাতে শুরু করে কিন্তু পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গাড়ী তাদের পিছু নেয় এবং পুলিশ ছাত্রদের বেধড়ক পেটাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মিছিলটি আর মধুর কেন্টিনে ফিরে যেতে পারেনি। দোয়েল চত্ত্বর থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অনেক ছাত্র সেদিন পুলিশের এই হামলায় আহত হয়।

বাংলাদেশের কোনো সংবাদপত্রে এরশাদ আগমনের মাত্র দেড় মাসের মধ্যে সামরিক আইনের মধ্যেও রাজপথে প্রকাশ্যে প্রথম মিছিল করার খবর প্রকাশ হতে পারে নি। এটাই এরশাদ আমলে প্রথম প্রকাশ্য রাজপথের মিছিল।[৪]

শিক্ষা দিবস সামনে রেখে প্রস্তুতি

এরশাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এরপর ছাত্ররা বৃহত্তর ছাত্র ঐক্যের উপায় খুঁজতে থাকে। এই সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের একটি পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক মহলে পেশ করেন। তিনি এটি বাংলাদেশ ছাত্র

ইউনিয়ন নেতাদের কাছেও পৌছে দেন এবং বৃহত্তর ছাত্র ঐক্যের জন্যে তাদের উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। পরিকল্পনায় ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৮২) শিক্ষা দিবসকে কেন্দ্র করে আন্দোলন দানা বেঁধে তোলার কথা বলা হয়।

কিন্তু বৃহত্তর ছাত্র ঐক্যের তখন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল। আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দু'টি আলাদা উপদল প্রকাশ্যে কাজ করছিল এবং একদল আরেকদলকে স্বীকার করতে চাইতো না। একটি কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান ও বাহালুল মজনুন চুন্নু এবং অন্যটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও খ. ম. জাহাঙ্গীর নিজেদের বৈধতার প্রশ্নে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অটল ছিলেন। ফলে একটি উপদল, অন্য উপদলের সাথে এক জোট হয়ে সংগ্রাম পরিষদের নামে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

অন্যদিকে, জাসদ ছাত্রলীগও বাসদ ছাত্রলীগের সাথে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। জাসদ ছাত্রলীগ থেকে বের হয়ে আসা বাসদ ছাত্রলীগের নেতাদের সাথে এক যোগে কাজ করতে তারা প্রস্তুত ছিলনা। জাসদ ছাত্রলীগ প্রস্তাব করে, ডাকসু নেতা আখতারুজ্জামান ও জিয়াউদ্দীন বাবলুই যেহেতু বাসদপন্থী ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সেহেতু তাদের ডাকসু নেতা হিসেবে ধরা যাবে না। জোটে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছাত্র সংগঠন হিসেবেই থাকেব, ডাকসু হিসেবে নয়।

এরশাদ আমলে ছাত্রদের প্রথম বিবৃতি

কিন্তু শত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরও ১৪টি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৪ সংগঠনের একটি বিবৃতি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে দেওয়া হয়। ছাত্রলীগ (জালাল-জাহাঙ্গীর) শেষ পর্যন্তও ছাত্রলীগ (ফজলু-চুন্নুর) ব্যাপারে আপত্তি উঠিয়ে না নেওয়ায় এই বিবৃতিতে তারা স্বাক্ষর করেনি। এরশাদ বিরোধী বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এটাই প্রথম বিবৃতি। বিবৃতিতে ছাত্রদের বৃহত্তর ঐক্যের আহবান জানানো হয়েছিল।

১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ছিল বৃহস্পতিবার। এই সময় সরকার বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করেছিল। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলি শিক্ষা দিবস পালনের কর্মসূচী একদিন এগিয়ে আনে ১৬ সেপ্টেম্বর বুধবারে।

সামরিক বিধি বলে ৫ জনের বেশী একত্রে জমায়েত নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি মিলাদ মহফিল অনুষ্ঠানের জন্যেও রমনার পুলিশ 'কন্ট্রোল রুম' ও আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসকের কার্যালয় থেকে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ ছিল।

ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নেয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের মধ্যে শুধু একটি মৌন মিছিল করবে। খুব সংক্ষিপ্ত হবে অনুষ্ঠান। কোনো শ্লোগান হবে না। তবু সামরিক আইনের মধ্যেও শিক্ষা দিবস পালন করা হবে।

এই সংবাদ সামরিক কর্তাদের কাছে চলে যায়। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রাবাসের প্রাধ্যক্ষদের ডেকে নেয়। কিন্তু প্রাধ্যক্ষরা গেলে সামরিক অফিসাররা শিক্ষকদের দাঁড়িয়ে রেখেই কথা বলে, বসতেও বলে না। শুধু ছাত্রদের ব্যাপারে নির্দেশমালা শুনিয়ে তাদের ফেরৎ পাঠানো হয়।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের কার্যালয় এই সময় ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৬ সেপ্টেম্বর ছাত্ররা কলাভবন চত্ত্বরে মৌন মিছিল করলো। সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করে তবু একটি ছাত্র শেষ পর্যন্ত 'এরশাদের ধ্বংস কামনা' করে একটি শ্লোগান দিয়ে ফেলে। ডাকসুর সহসভাপতি আখতারুজ্জামান মিছিল শেষে কোনো বক্তৃতা দেন নি। শুধু বলেন, 'মিছিল শেষ হলো।'

১৭ সেপ্টেম্বরের (১৯৮২) কর্মসূচী হিসেবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল শহীদ মিনারে নীরবে ফুল দেওয়া হবে। কিন্তু দু'তিনবার পুলিশ এসে ছাত্রদের কাছ থেকে ফুল কেড়ে নিয়ে যায়। ফলে উপস্থিত সিদ্ধান্ত হয়, গোপনে সবাই জগন্নাথ হলে যাবে এবং সেখান থেকে তড়িৎ শহীদ মিনারে ফুল দেবে। কিন্তু পুলিশ এই গোপন সংবাদ পেয়ে যায় এবং জগন্নাথ হল ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পুলিশ ঘিরে রাখে। এর ফলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ছাত্ররা জগন্নাথ হলের শহীদ মিনারেই পুষ্প স্তবক অর্পণ করে।

কিন্তু ঘটনাটি এখানেই শেষ হলো না। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যে ভাবেই হোক একটি ছাত্র ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে উঠে পড়ে। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফজলুল হালিম চৌধুরী পরে তাকে ছাঁড়িয়ে আনে। এরশাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে এভাবে আরেক ধাপ অগ্রগতি ঘটে।[৫]

মজিদ খানের শিক্ষানীতি নিয়ে সূত্রপাত

অক্টোবর মাসের (১৯৮২) প্রথম থেকেই এরশাদ সরকার কর্তৃক নতুন একটি শিক্ষানীতি দেওয়ার কথা চলতে থাকে। এরশাদ ক্ষমতায় এসেই মে মাসে মার্শাল-ল-ষ্টাডি কমিটি গঠন করেছিলেন। এর বিভিন্ন সুপারিশের আলোকেই তাঁর নতুন শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খান শিক্ষানীতিতে পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নেন। ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৮২) এই শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়।

এতে চার স্তরে শিক্ষাকে বন্টণ করে নাম দেওয়া হয়, মৌলিক, প্রস্তুতি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তর।

শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হবে তা বিশেষজ্ঞদের তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানানো হয়।

প্রাথমিক পর্যায় থেকে আরবী ও ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

এই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতিকে দূরে রাখার সংকল্পও মজিদ খান ব্যক্ত করেন।[৬]

১৪টি ছাত্র সংগঠন দ্রুত এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দেয়। এতে বলা হয়: '১৯৮২-৮৭ সালের জন্যে ঘোষিত নতুন শিক্ষানীতি ও কর্মসূচীতে প্রাথমিক শিক্ষার শুরুতেই দুটি বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। শিশু বয়সে এক সাথে তিনটি ভাষা শেখানোর প্রচেষ্টা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়-শিশু মনোবিজ্ঞানের নীতিবিরোধীও বটে। এ ছাড়া নতুন শিক্ষানীতিতে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর মাধ্যমিক সার্টিফিকেট দেবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার উপনিবেশিক কাঠামো বজায় রেখে এধরণের নীতি গ্রহণ করা হলে অভিভাবকদের পক্ষে মৌলিক সার্টিফিকেট লাভের জন্য তাদের সন্তানদের দু'বছর বাড়তি পড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ইউকসু)-র সহসভাপতি খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক, আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান ও বাহালুল মজনুন চুন্নু, আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগের অপর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও খ. ম. জাহাঙ্গীর, জাসদপন্থী ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মুনিরউদ্দিন আহমদ ও আবুল হাসিব খান, বাসদপন্থী ছাত্রলীগের সভাপতি ও ডাকসুর সহসভাপতি আখতারুজ্জামান এবং সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন বাবলু, ছাত্র ঐক্য ফোরামের গোলাম কিবরিয়া ও মিজানুর রহমান, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর ফজলে হোসেন বাদশা ও আতাউর রহমান ঢালী, বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের কামরুল ইসলাম ও শহীদুল ইসলাম, জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের আবদুল্লাহ আল মামুন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের মিজানুর রহমান মানু, সমাজবাদী ছাত্র জোটের সোহরাব হোসেন, ছাত্র সমিতির খবির উদ্দিন আহমদ ও আসাদুল্লাহ তারেক, ছাত্রলীগের কাজী আবদুল্লাহ

আল মামুন এবং বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের ভিন্ন উপদলের আশরাফ গিরানী ও ইসরারুল হক।[৭]

একই সময় দেশের ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির মৌলিক দিক সমালোচনা করে বিবৃতি দেন। এতে স্বাক্ষর করেন আবুল ফজল, অধ্যাপক আবু মহামেদ হাবিবুল্লা, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক এ. আর. মল্লিক, অধ্যাপক মুসলেউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবির, অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, সরদার ফজলুল করিম, বদরুদ্দিন উমর, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

একই সাথে ১৪টি ছাত্র সংগঠন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। এতে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়ে নয়া শিক্ষানীতি প্রণয়নের আহবান জানানো হয়। গণস্বাক্ষর অভিযানের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মাঝে সারাদেশেই আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকে। ছাত্র সংগঠনগুলির বিভিন্ন কর্মসূচীতে সমর্থক কর্মীদের বাইরেও সাধারণ ছাত্ররা আসতে শুরু করে।

ছাত্রদের নিজস্ব দাবী শিক্ষা বিষয়কে কেন্দ্র করে দানাবেধে ওঠা ছাত্র আন্দোলনকে সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে থাকেন ছাত্রনেতারা।

ছাত্রদের গণস্বাক্ষর কর্মসূচীর পাল্টা হিসেবে সরকারও 'জনমত যাচাইয়ের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রশ্ন মালা ছেপে বিতরণ করে। সেখানে (লম্বা পুস্তিকায়) প্রশ্ন করা হয়: 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র অসন্তোষের সর্বপ্রধান কারণ কি? শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ?'

এর ফলে নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যময়তা ছাত্রদের কাছে ধরা পড়ে যায়।

৮ নভেম্বর (১৯৮২)–র নাটকীয় ঘটনা

এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের 'সিপাহী বিপ্লবের' সপ্তম বার্ষিকী পালন করার জন্যে জাসদপন্থী ছাত্রলীগ এক কর্মসূচী নেয়। কিন্তু ৭ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। ৮ নভেম্বর (১৯৮২) বিশ্ববিদ্যালয় খুললে ছাত্রলীগ ৭ নভেম্বরের কর্মসূচী একদিন পর ৮ নভেম্বরে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৮ নভেম্বর (১৯৮২) জাসদ ছাত্রলীগের একটি মিছিল কলাভবনে শ্লোগান দিতে থাকে। এই সময়ই ক্যাম্পাসের বাইরে টহলরত পুলিশ প্রস্তুতি নিতে থাকে। মিছিল কলাভবন ছেড়ে মধুর কেন্টিনে যাওয়ার পথেই পুলিশ আচমকা তাদের উপর হামলা চালায়। ফলে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় মধুর কেন্টিনে অবস্থানরত ১৪টি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরাও পুলিশ প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করে। ক্রমাগত কাঁদুনে গ্যাস ও গুলী সমগ্র ক্যাম্পাসকে কাঁপিয়ে তোলে। ফলে এক পর্যায়ে সাধারণ ছাত্ররাও পুলিশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্টবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নূরুল আমীন ব্যাপারী ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা মাহমুদা খাতুন তাদের নিজেদের কক্ষে বসে টিউটোরিয়াল ক্লাশ নিচ্ছিলেন। পুলিশ তাদের কক্ষে প্রবেশ করে। শিক্ষকরা পরিচয় দেওয়ার পরও তাদের লাঞ্চিত করে এবং গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পুলিশ সমগ্র ক্যাম্পাসে ঢুকে ক্লাশরুমের কাঁচের জানালা ভাঙতে থাকে এবং জানালা ফুটো করে গ্যাসের সেল, ক্লাশরত ছাত্র-শিক্ষকদের উপর মারতে থাকে। এভাবে সমগ্র ক্যাম্পাসে এক নারকীয় ঘটনার উদ্ভব হয়। কোন কোন পুলিশ কনস্টেবল অতি উৎসাহে ছাত্রীদের কমন রুমে প্রবেশ করে এবং অশ্লীল ইঙ্গিত করতে থাকে। ভয়ে পালানো অবস্থায় করিডোরে অনার্স-এম. এ ক্লাসের ছাত্রদের মাটিতে ফেলে একজন ৫ম শ্রেণী পাশ করা পুলিশ কনষ্টেবলকে দেখা যায় বুট-জুতা দিয়ে লাথি মারছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে এই নারকীয় তান্ডবলীলা পার্শ্ববর্তী উদয়ন ও ল্যাবরেটরী স্কুলেও ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু কিশোর ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়।

পুলিশ এই সময় রায়টকার নিয়ে আসে এবং উত্তেজিত ও প্রতিবাদমুখর ছাত্রদের উপর গরম রঙিন পানি ছিটিয়ে দেয়। পুলিশ সূর্যসেন হলেও প্রবেশ করে।[৮]

কর্তব্যরত আলোক চিত্রশিল্পী ও সাংবাদিকরাও পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পায় না। কামরুজ্জামান (সরকারী দৈনিক বাংলা), লুৎফর রহমান বীনু (সংবাদ), মোহাম্মদ খালেদ (আজাদ), মীর্জা তারেক (দৈনিক দেশ) প্রমুখ এই সময় আহত হয়।

ছাত্র শিক্ষক সহ মোট ৩৭ জনকে ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩ দিনের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি অভিযোগ করে, রাষ্টবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নূরুল আমীন বেপাড়ীকে তাঁর কক্ষে টিউটোরিয়াল ক্লাশ নেওয়া অবস্থায় পরিচয়

দেওয়ার পরও পুলিশ প্রহার করে এবং আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে গ্রেফতার করে।

এক বিবৃতিতে শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক আহমেদ কামাল, সামরিক সরকারের এই হস্তক্ষেপকে নজীরবিহীন ও নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেন।

সন্ধ্যার পরে গ্রেফতাকৃতদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এক প্রেসনোটে ঘটনার জন্যে কার্যত ক্ষমা চেয়ে সরকার জানায়, দায়ী পুলিশ কনষ্টেবলদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করার কথা বলে।[৯]

৮ নভেম্বরের (১৯৮২) ঘটনার পর ১৪ নভেম্বর পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলে। কিন্তু ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করে 'অপরাজেয় বাংলা'র পাদদেশে অনুষ্ঠিত ১৪টি ছাত্র সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ সমাবেশে যোগদান করে। ডাকসুর সহসভাপতি আখতারুজ্জামান, রাকসুর সহসভাপতি ফজলে হোসেন বাদশা এতে বক্তব্য রাখেন। ছাত্রনেতা মুনীর উদ্দিন আহমেদ ১৪ সংগঠন প্রণীত একটি ইশতেহার পাঠ করে শোনান।

ইশতেহারে সরকারী প্রেসনোটকে 'গরু মেরে জুতো দান' উল্লেখ করে বলা হয়, 'কিছু সংখ্যক পুলিশের উপর দায় চাপিয়ে দিয়ে সমস্ত ঘটনাকে ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু উপরতলার কর্মকর্তা যারা পুলিশের দমননীতির আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, তাদের বিচার কে করবে? সরকার কি বলতে চান পুলিশের উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই, আর সেটা যদি সত্যি হয় এমন সরকার কেমন করে দেশ চালাবে।

আমরা স্বরাষ্টমন্ত্রণালয় ও সরকারের উদ্দেশ্যে পুনর্বার ঘোষণা করতে চাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্যাম্পাস প্যারেড গ্রাউন্ড বা খেলার মাঠ নয়। অব্যাহত পুলিশী তৎপরতা ও দমননীতি আমাদের শিক্ষাজীবনকে নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে।[১০]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও সাংবাদিক সম্মেলন

এরই মধ্যে ১৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ২১ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একটি লিখিত দাবীনামার খসড়া সাংবাদিকদের পড়ে শোনান হয়। বাংলাদেশ ছাত্র

ইউনিয়ন নেতা আনোরুল্ল হক খসড়াটি তৈরী করেন। আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ নেতা মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন খসড়াটি আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিকদের পড়ে শোনান।

সাধারণভাবে সাংবাদিক সম্মেলনে কোনো বক্তৃতা হয় না। কিন্তু ছাত্র সংগঠগুলি তখনো সংগঠনগত সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে আসতে পারে নি। ফলে সমঝোতা হিসেবে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের খসড়া পাঠের পর ডাকসু ও বাসদ ছাত্রলীগের নেতা আখতারুজ্জামান এবং ইউকসু ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা খন্দকার মোহাম্মদ ফারুকও এতে বক্তৃতা করেন।

ছাত্রদের কর্মসূচীতে এবার শিক্ষার দাবীর সাথে সাথে দমননীতি ও সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবীও যুক্ত হয়। সামরিক সরকারকে বলা হয়, 'Self style' সরকার।

সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী করা হয়, স্বল্প সময়ের মধ্যে সারাদেশের দুই লক্ষেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষানীতি বাতিলের দাবীতে স্বাক্ষর দিয়েছে। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আনোয়ারুল্ল হক এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান লেখকের কাছে দাবী করেন, একমাত্র ছাত্র ইউনিয়নই সেদিন সারাদেশে দেড়লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে সারাদেশে গ্রেফতারকৃত, সাজাপ্রাপ্ত এবং হুলিয়া জারীকৃত ছাত্র নেতাদের মুক্তি দাবী করা হয়। সামরিক আদালতে শিবলী কাইয়ুম, আলী আহমদ, হাবিবুর রহমান এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান মনি, আখতারুজ্জামান, সামশে মওলা, নূর আহমদ বকুল, সাইফুল ইসলাম শিশির, জহিরুল্ল হক দুলাল ও মনোয়ারুল্ল হক প্রমুখের উপর থেকে সামরিক অত্যাচার প্রত্যাহারের আহবান জানানো হয়।

সাংবাদিকদের দেখানোর জন্যে বস্তাভরা স্বাক্ষর দেওয়া কাগজ সম্মেলন স্থানেই স্তুপাকারে রাখা হয়। ছাত্ররা মজিদ খানের শিক্ষানীতিকে সমগ্র জাতি পঙ্গু করার 'কুখ্যাত সনদ' বলে ঘোষণা করে।

১৪ নভেম্বরে (১৯৮২) অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে যে ছাত্র জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেই ২৯ নভেম্বর সারাদেশে দাবী দিবস পালনের কথা ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবী দিবসের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

২৯ নভেম্বর সারাদেশে ছাত্রদের দাবী দিবস পালিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবী দিবস পালন কালে পুলিশী হামলা চলে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ নভেম্বর কতিপয় ছাত্র-শিক্ষকের উপর চড়াও হওয়ার প্রতিবাদে ২৯ নভেম্বর সেখানেও কর্মসূচী পালিত হয়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় কলাভবনের বটতলায়। ছাত্রনেতারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেভাবে ১৪টি ছাত্র সংগঠন, ১০টি শ্রমিক সংগঠন, ৮টি কৃষক সংগঠন একত্রিত হয়েছে, সেভাবে রাজনৈতিক দলগুলিকেও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানায়।

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাহাজানি, ছিনতাই বেড়ে যায়। সরকার ও পত্র-পত্রিকা ঢালাও প্রচার চালায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার রাস্তাগুলিতে ছাত্ররাই এসব করে বেড়াচ্ছে। ছাত্রদের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখা এবং ছিনতাইকারীদের ধরার জন্যে ১৪টি ছাত্র সংগঠন ২৪ নভেম্বর থেকে ছাত্র বিগ্রেড তৈরী করে রাত ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত পাহাড়ার ব্যবস্থা করলে ছিনতাইয়ের ঘটনা বন্ধ হয়।

২৯ নভেম্বরের (১৯৮২) সমাবেশ থেকে ছাত্রনেতারা ১৩ ডিসেম্বর দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মজিদ খান ঘোষিত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করে। এই উপলক্ষে সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ও সারাদেশে ব্যাপক সফর ও যৌথ কর্মীসভা এবং ছাত্রসভার কর্মসূচীও গ্রহণ করে।

ছাত্র নেতারা বলেন, সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ এই কর্মসূচী সফল করতে যখন সারাদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন যাওয়া-আসার সময়ই ছাত্রনেতাদের মধ্যে আলোচনা হতে থাকে, পরবর্তী কর্মসূচী কি দেওয়া যায়। আরেকটি ছাত্রধর্মঘট, ছাত্র মহাসম্মেলন, ছাত্র কনভেনশন ইত্যাদি কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জনমত গড়ে তুলে সচিবালয় অভিমুখী মিছিল ও স্বারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচীর কথা আলাপ হতে থাকে।[১১]

১১ জানুয়ারী: ভেতরের কাহিনী

১৩ ডিসেম্বর ধর্মঘটের পূর্বদিন ১২ ডিসেম্বর ১৪ ছাত্র সংগঠনের সভা বসে পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করতে। এখানে জাসদপন্থী ছাত্রলীগ, বাসদপন্থী ছাত্রলীগ, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর পক্ষ থেকে ১১ জানুয়ারী (১৯৮৩) সচিবালয় ঘেরাও করার প্রস্তাব আনা হয়।

করতে থাকেন। একমাত্র ক্ষুদ্র ছাত্রসংগঠন ছাত্র ঐক্য ফোরাম বাদে বাকী ১৩ ছাত্র সংগঠন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদের সাথে বৈঠকের প্রস্তাব মেনে নেয়।

উপাচার্য ফজলুল হালিম চৌধুরী এই সম্মতি পেয়ে জেনারেল এরশাদের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু এবার সরকার পক্ষ থেকে কান্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া হয়। সরকার ভাবে ছাত্ররা দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। ফলে জেনারেল এরশাদ জানান, রাজারবাগে পুলিশ দিবসের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি এখন ব্যস্ত থাকবেন, ফলে এই রাতে ছাত্রনেতাদের সাথে বৈঠক করার তাঁর কোন অবসর নেই। জেনারেল এরশাদ আরো বলেন, পরবর্তী কোন এক সময় তিনি তা বিবেচনা করে দেখবেন, তবে শর্ত থাকে যে, ১১ জানুয়ারী (১৯৮৩) ছাত্রদের শান্ত থাকতে হবে, মিছিল করতে পারবে না।

এমন একটা অবস্থায় ছাত্রনেতারা খুব সমস্যায় পড়ে যায়। তারা ১১ জানুয়ারীর কর্মসূচী নিয়ে ভড়কে যান। বিরাট এক রক্তপাতের আশঙ্কা করছিল সবাই। কারণ সরকার মিছিল মোকাবেলার বিরাট প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

এদিকে ছাত্রনেতাদের সাথে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (সি. এম. এল. এ.)-এর বৈঠকের খবর কর্মী মহলে জানাজানি হয়ে গেলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এতে ইন্ধন যোগায় জাসদপন্থী ছাত্রলীগের নেতা মোহন রায়হান। তার নেতা আবুল হাসিব খানের এতে সুস্পষ্ট সমর্থন ছিল। কার্যতঃ এক্ষেত্রে জাসদপন্থী ছাত্রলীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে মুনির ও হাসিবের সিদ্ধান্তের মধ্যে।

ছাত্র কর্মীরা নেতাদের সিদ্ধান্তকে আপোষরফা হিসেবে ভাবতে থাকে এবং সন্ধ্যার পর 'আপোষ না সংগ্রাম' শ্লোগান তুলে হলে হলে মিছিল করে। ছাত্রনেতারা তখনো তাদের সভা চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল ইসলাম হলে, মতান্তরে আহসানউল্লাহ হলে। কেউ একবারও ভাবেননি তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কর্মীদের ব্রীফিং করার প্রয়োজন রয়েছে। ফলে ছাত্রকর্মীরা মোহন রায়হানের গুজবে বিভ্রান্ত হয় এবং ছাত্র নেতাদের সম্পর্কেও কর্মীদের মনে প্রশ্ন জাগ্রত হয়।

ছাত্রনেতারা উপাচার্যকে মধ্যস্থতা করার ইতিবাচক প্রস্তাব জানিয়ে যখন উপাচার্য ভবন ত্যাগ করছিলেন তখন সকলে একসঙ্গে দেখতে পান, 'লালফ্লাগ' উড়িয়ে সারি সারি পুলিশের গাড়ী যাচ্ছে। হল রেট হবে ভেবে নেতারা আর হলে ফেরেননি এবং

গভীর রাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে ১৪ ছাত্র সংগঠনের যে সভা হওয়ার কথা ছিল তা আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে, পুলিশের গাড়ী ঐ রাতে সব যাচ্ছিল রাজারবাগের দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে নয়। ফলে যে ভুলটা হয়ে গেল, ছাত্র নেতারা সবাই সাধারণ ছাত্র ও কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেন সারারাত, কর্মীদের মনোভাব তারা বুঝে উঠতে পারলেন না। এই শূন্যতা পরের দিন বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

পরের দিন সকাল ৮টায় ছাত্রনেতারা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল ইসলাম হলে বৈঠকে বসে। নেতাদের সকলের চোখে-মুখেই একটা ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব ছিল গতরাতের। পূর্বে নেওয়া কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতেই হবে এমন তেজ ও জঙ্গী মনোভাব তখন অনেকেরই কমে এসেছিল। ভিন্নমত সত্ত্বেও ১৪টি ছাত্র সংগঠন তাদের এদিনের কর্মসূচী স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী নতুন কর্মসূচী ঘোষণার কথা বলে। বটতলার এদিনের জমায়েত পূর্ব কর্মসূচীর সচিবালয়ের দিকে না নিয়ে শহীদ মিনারে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাসদপন্থী ছাত্রলীগের সভাপতি মুনিরউদ্দিন আহমেদ ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সকল ছাত্রনেতাই বক্তৃতা করবেন বলে ঠিক হয়। কিন্তু ছাত্রনেতারা সিদ্ধান্ত নিতে নিতে বড় বেশী দেরী করে ফেলেছিলেন।

এদিকে সারা শহর থেকে হাজার হাজার ছাত্র বটতলায় সমবেত হতে থাকে এবং ছাত্রনেতারা আপোষে ব্যস্ত এমন গুজবে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। বেলা পৌনে বারটায় ছাত্রনেতারা বটতলায় পৌছে। এর আগে থেকেই মাইকে গরম গরম বক্তৃতায় দ্বিতীয় সারির নেতারা ছাত্রদের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচীতে উদ্বুদ্ধ করছিল এবং আপোষের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছিল।

ছাত্রনেতারা এই খবর রাখতেন না। এমন 'গরম আবহাওয়ায়' কারণগুলি বিশ্লেষণ না করেই জাসদপন্থী ছাত্রলীগ নেতা মুনিরউদ্দিন আহমদ কর্মসূচী স্থগিতের কথা ঘোষণা করেন। আর সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় তান্ডব। ছাত্রকর্মীরা তাদের নেতাদের আক্রমণ করে বসে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং জাসদ ছাত্রলীগের সমর্থক ও কর্মী মহলে সবচেয়ে বিক্ষোভ দেখা দেয়। নেতাদের বিরুদ্ধে সরকার থেকে টাকা খাওয়ার অভিযোগও তোলা হয়। ডাকসুর সহসভাপতি ও বাসদপন্থী ছাত্রলীগের নেতা আখতারুজ্জামান মাইকে বক্তৃতা দিয়ে উত্তেজিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, 'আল্লাহর কসম' আমরা টাকা খাই নাই'।

দেখা যাচ্ছিল, প্রায় সকল ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা তাদের যার যার দলের নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছে । গত ৯, ১০ ও ১১ জানুয়ারী (১৯৮৩) কিসব ঘটনা ঘটেছিল তা একমাত্র বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া আর কোন সংগঠনে ব্রীফ ছিল না। কার্যতঃ ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরাই বেড়ী বাঁধ দিয়ে সকল সংগঠনের নেতাদের এই সময় রক্ষা করে।

আর কোনো ছাত্রনেতার বক্তৃতা দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর পরিস্থিতি ছিল না। মিছিল শুরু হয়ে যায়। ছাত্রনেতারা মিছিল নিয়ে যেতে চায় শহীদ মিনারের দিকে কিন্তু জাসদপন্থী ছাত্রলীগের নেতা মোহন রায়হান, পাল্টা মিছিল বের করে সচিবালয়ের দিকে মিছিলকে ধাবিত করেন। ছাত্রনেতাদের সাথে খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রই শহীদ মিনারে যায়। অধিকাংশই পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী সচিবালয়ের দিকে যায় এবং হাইকোর্টের মোড়ে পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে মৃদু ঘটনা ঘটে, মোহন রায়হান একজন পুলিশ সার্জেন্টের কাছ থেকে একটি মেগাফোন চেয়ে নিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলে ছাত্রদের মধ্যে তার সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠে–তার সাথে পুলিশের সখ্যতার কথা নিয়ে।

এরপর মোহন রায়হান অল্পকিছু সংখ্যক জাসদকর্মী নিয়ে হাইকোর্ট থেকে ডাকসু কার্যালয়ের দিকে আসেন। দীর্ঘদিন থেকে বাসদ ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব–সংঘাত চলে আসছিল। আখতার–বাবলুর নেতৃত্বে বাসদ ছাত্রলীগ তখন ডাকসুতে ক্ষমতায়। এই সুযোগে মোহন রায়হানের নেতৃত্বে আলাদা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং 'ডাকসু ভিপি মোহন রায়হান–লাল সালাম লাল সালাম' শ্লোগান দিয়ে একদল ডাকসু কার্যালয় আক্রমণ এবং ভাঙচুর করে।

এদিন (১১ জানুয়ারী ১৯৮৩) সন্ধ্যাতেই বিধ্বস্ত ডাকসু কার্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং 'জাসদ ছাত্রলীগের কার্যাবলী হঠকারী' বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকারান্তরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে জাসদ ছাত্রলীগ নিন্দিত হয় এবং মোহন রায়হানের বিরুদ্ধে তার নিজ সংগঠন জাসদ ছাত্রলীগ ব্যবস্থা নেবে বলে কথা দিয়ে আসে।

এই প্রস্তাব নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন জাসদকর্মী খবর নিয়ে আসে যে, 'দাদা' সিরাজুল আলম খানের বাসা থেকে সাদা পোশাকধারীরা মোহন রায়হানকে ধরে নিয়ে গেছে। পত্রিকায় জাসদ ছাত্রলীগ বিবৃতি দেয় কিন্তু সরকার তার গ্রেফতারের কথা অস্বীকার করে। কয়েকদিন পরই সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার এসে হাজির হয়।

তবে সব মিলিয়ে ১১ জানুয়ারীর বিতর্কিত কর্মসূচীর পর সাধারণ ছাত্র সমাজে অনেকটা হতাশা নেমে আসে। এর মধ্যে হটাৎ করে একদিন সরকার বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও ইউকসুর সহসভাপতি খন্দকার মোহাম্মদ ফারুককে গ্রেফতার করে। খন্দকার ফারুকের গ্রেফতার এই হতাশার পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। গরম হয়ে ওঠে আবার ছাত্র রাজনীতি এবং সরকারের জন্যেই তা বুমেরাং হয়ে ওঠে। এই প্রথম ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কোনো নেতা গ্রেফতার হলেন। ২৭ জানুয়ারী ঢাকায় এবং ২৮ জানুয়ারী সারাদেশে এর প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হল। পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে পারে ভেবে সরকার তাঁকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে তাঁকে সিলেট কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এভাবে ছাত্র আন্দোলনে আবার একটা গরম আবহাওয়া তৈরী হয়ে যায়। কারণ সামনেই ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারী কর্মসূচী। ১১ জানুয়ারীর কর্মসূচী পরিবর্তন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৪ ফেব্রুয়ারী সচিবালয় ঘেরাও করার কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল।[১৪]

পনের দল ও সাত দল গঠন

একুশকে (১৯৮৩) সামনে রেখে এরই মধ্যে জানুয়ারীতে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলকে নিয়ে ১৫ দল ও ৭ দল গঠিত হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, জাতীয় একতা পার্টি, গণআজাদী লীগ প্রমুখ দল নিয়ে ১৫ দল গঠিত হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (কাজী জাফর) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগ আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ। প্রমুখ দল নিয়ে ৭ দল গঠিত হয়।

মধ্য ফেব্রুয়ারীর ঘটনা

১৫ দল এক বৃহৎ কর্মসূচী হাজির করে। একুশে উপলক্ষে গণমিছিলের ঢল নামানোর পরিকল্পনা করে তারা। একই সঙ্গে সারাদেশে কর্মসূচী ঘোষণা করে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় ১৫ দলে। ১৫ দল আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রদের মধ্য ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী পরিবর্তন করে একুশের পরে নিতে বলে, যাতে ছাত্র আন্দোলন একা আগাতে গিয়ে মাঝপথে থেমে না পড়ে। রাজনৈতিক আন্দোলন

দানা বেঁধে ওঠার আগেই সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে একমাত্র ছাত্ররাই বিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা ১৫ দলের নেতৃবৃন্দ করছিলেন।

কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৫ দলের প্রস্তাব বিবেচনা করতে রাজী হয়নি। একমাত্র বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া সকল সংগঠন এর বিরোধিতা করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মনে করে, ছাত্রদেরই অগ্রীম মৌল কর্মসূচী দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো স্থবিরতা কাটাতে সাহায্য করতে হবে। জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ছিল এই তত্ত্বের প্রবক্তা।

১৪ ফেব্রুয়ারীর (১৯৮৩) কর্মসূচীর ঠিক আগের দিন ১৫ দল নেতা শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের সিদ্দিকুর রহমানের বাসভবনে ১৫ দল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ দলের পক্ষে আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ ফরহাদ, আবদুর রাজ্জাক ও রাশেদ খান মেনন বক্তব্য রাখেন। যৌথসভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১৪ ফেব্রুয়ারী মিছিল হবে। তবে সরকার যদি সংঘর্ষ বাঁধাতে চায়, তাহলে প্রয়োজনবোধে সচিবালয়ে না গিয়ে মিছিল রাজপথে জনতার কাছে নিয়ে যেতে হবে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতারা এই প্রস্তাবে একমত হন।

এর মধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে। ইসলামী ছাত্র শিবির সাধারণভাবে বটতলায় সভা করে না। এই সময় ছাত্র শিবির বটতলায় সভা আহবান করলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় তাদের বটতলায় সভা করতে দেবেনা। ফলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে মারাত্মক ছাত্র সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। সংঘর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। কলাভবন থেকে মিছিল হাইকোর্টের মোড়ে গেলে পরেই পুলিশ একধারে গুলী, টিয়ার গ্যাস ও গরম পানি ছিটাতে থাকে। পাখির মতো গুলী করে সেদিন ছাত্রদের মারা হয়। শিশু একাডেমীতে এই সময় চলছিল শিশুদের একটি অনুষ্ঠান। ভয়ে ছিল শিশুরা, সন্ত্রস্ত শিশুদের উপরও হামলা চলে। গুলী করে সেদিন শিশুদেরও হত্যা করা হয়। কে বা কারা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল, ছাত্ররা একজন পুলিশের চোখ উপড়ে নিয়েছে। এই খবরে পুলিশগণ মানুষ সমন্ধীয় সকল প্রকার চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং মধ্যযুগীয় নারকীয় ঘটনা ঘটায়।

১৪ ফেব্রুয়ারী জাফর ও জয়নাল নিহত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী নিহত হয় জগন্নাথ কলেজের ছাত্র মোজাম্মেল। দু'দিনই লাশ নিয়ে ছাত্র-পুলিশ হাঙ্গামা হয়। ছাত্ররা বটতলায় জাফর-জয়নালের লাশ নিয়ে জানাযা পড়তে গেলে বিকেলে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও পুলিশ হামলা চালিয়ে শতশত ছাত্র গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

মধ্য ফেব্রুয়ারীর এই ঘটনার পরে ছাত্র নেতাদের সবচেয়ে বিচলিত করে তোলে একটি ঘটনা, তাহলো বাসদপন্থী ছাত্রলীগের নেতা ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দীন বাবলুকে পাওয়া যাচ্ছিল না মধ্য ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর থেকে। তাঁর নিখোঁজ হওয়ার খবর সকলকে চিন্তায় ফেলেছিল এই কারণে যে, তাঁর প্রাণনাশ বা কিডন্যাপের আশঙ্কা করছিল সবাই।

কেউ কেউ বলে, বাবলুকে ১৪ ফেব্রুযারী তারা মহসিন হলে দৌড়ে যেতে দেখেছে। মহসিন হল থেকে গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ১৪ ফেব্রুয়ারী ঘটনার পর জেল থেকে ছাড়া পাওয়া দু'একজনের কাছে বাসদ ছাত্রলীগের নেতারা জানতে পারে, বাবলুকে পুলিশের আস্তানায়ও গ্রেফতারকৃত অবস্থায় কেউ দেখতে পায় নি।

কিন্তু ছাত্রনেতারা পরে জানতে পারে মহসিন হলের হাউস টিউটর-এর বাসায় বাবলু ঘটনার দিন পালিয়ে থাকে এবং সেখান থেকে টেলিফোন করলে সেনাবাহিনীর জীপ এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়।

বেশ কিছু দিন পরে জিয়াউদ্দিন বাবলু বাসদ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় হাজির হন। ছাত্রলীগ নেতার মতে, তিনি তাঁর নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে একটি 'আষাড়ে গল্প' উপস্থাপন করেন। বাবলু বলেঃ পুলিশের জীপ থেকে গ্রেফতার এড়ানোর জন্যে তিনি গ্রীন রোডে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁর ছাত্র সংগঠন বানানো এই গল্প বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে সভাপতি আখতারুজ্জামানকে দায়িত্ব দিয়ে এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই সময় ছাত্রলীগ নেতারা উপাচার্য ফজলুল হালিম চৌধুরীর কাছে জানতে পারে যে, বাবলুকে তিনি প্রায়ই সি. এম. এল. এ (প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের) কার্যালয়ে দেখতে পান।

আখতারুজ্জামানের কাছে পরে জিয়াউদ্দিন বাবলু সমগ্র ঘটনা খুলে বলে যে, টেলিফোনে মেজর মুন্নার সাথে যোগাযোগ করার পর মতিঝিল থানার ও. সি তাকে মহসিল হল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দল, ডাকসু ও বাসদ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে বাবলুকে পদত্যাগ করতে বলে। তাঁকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় যাওয়া থেকেও নিষেধ করা হয়। বাবলুও যথারীতি পদত্যাগ করেন।[১৫]

এক সাক্ষাৎকারে জিয়াউদ্দিন বাবলু আর্মীর কিংবা পুলিশের জীপে করে তাঁর পালানোর কথিত অভিযোগ অস্বীকার করেন।[১৬]

১০ দফা প্রণয়ন

মধ্য ফেব্রুয়ারী ঘটনার পর সরকার একতরফাভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলে ছাত্রনেতারা দীর্ঘস্থায়ী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে এই বন্ধটি কাজে লাগান। এই সময়ই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রণয়ন করে ১০ দফা।

২৬ মার্চ (১৯৮৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা সত্ত্বেও অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০দফা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।

ঘোষণায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সাম্প্রতিক ছাত্রগণআন্দোলনে ১০ দফা শুভ সূচনা ও মাধ্যম হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করে। বলা হয়, সামরিক শাসনের বেড়া জালে আবদ্ধ সমাজে ১০ দফার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই ১০ দফায় আন্দোলনের সফলতার পূর্ব শর্ত হচ্ছে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ। সামরিক বাদের উচ্ছেদ।

১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর সরকার ৩ মাস জোর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলে ১৮ মে (১৯৮৩)। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের যৌথ শোকসভা ও মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এদিন। ৩মিনিট নীরবতা পালন করা হয় প্রতিটি ক্লাশের শুরুতে।

২২ মে মধ্য ফেব্রুয়ারীর হত্যাকান্ডের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়। ২৩ মে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাযা। ২৫ মে বটতলায় সর্বদলীয় ছাত্র-গণ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী শোক পালন করা হয়। ছাত্ররা কালব্যাজ পরে ক্লাশে আসে।

জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন মতাদর্শগত লড়াই

৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের পর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিয়ে জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন পরস্পর মতাদর্শগত সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে জাসদপন্থী ছাত্রলীগের সমর্থক গ্রুপটির পক্ষ থেকে একটি

প্রচারপত্র ছাড়া হয়। এতে অভিযোগ করা হয়, কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রবল আপত্তির জন্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৮৩ সালের ২৪ মার্চ (১৯৮৩) কাল দিবসের কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই প্রচারপত্রের জবাবে 'সামনে আছে জোর লড়াই' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এতে উপরিউক্ত অভিযোগের জবাবে বলা হয়ঃ

'১৪ ফেব্রুয়ারীর গুলী খাওয়া, বারুদ পোড়া ছাত্র আন্দোলন নানা মত ও পথের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠেছে...। ২৪ মার্চ সামরিক সরকারের বর্ষপূর্তির দিন। এই দিন ওদের সেন্টিমেন্ট। আর ঠিক সেই কারণেই এইদিন ওদের চাকে খোঁচা মার– এটাই এই মতের অনুসারীদের বক্তব্য।

'কিন্তু ভীমরুলের চাকে খোঁচা মেরে মজা দেখা ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য আন্দোলনের বিকাশ ও দাবি আদায়। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলো বন্ধ ছিল। এস. এস. সি. পরীক্ষার কারণে স্কুল গুলোও বন্ধ ছিল। তাই ঐ সময়টা আমাদের জন্য খুব সুবিধাজনক দিন ছিল না। আমরা লড়বো আমাদের সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে। ২৪ মার্চ ওদের দিন–কিন্তু দু'দিন পরেই, ২৬ মার্চ আমাদের দিন, স্বাধীনতার দিন, জনগণের দিন। এই দিন আমাদের শক্তি বেশী। তাই দ্বিতীয় মতের (ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থক গোষ্ঠীর–লেখক) অনুসারীদের বক্তব্য ছিল ২৪ মার্চ শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হয়ে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে ব্যাপক সমাবেশ করে আগামী দিনের আন্দোলনের কর্মসূচী তুলে ধরা হোক..। কিন্তু ওদের কথা হচ্ছে, ২৪ মার্চ হয় একটা 'ঘটনা ঘটানোর কর্মসূচী নিতে হবে, নয়তো কোন কর্মসূচীই নয়...।

'এই অসহিষ্ণু মহলটি ১৪ ফেব্রুয়ারীর পরপর গোপনে শলাপরামর্শ করে ২০ ফেব্রুয়ারী হরতালসহ তিনদিনের এক কর্মসূচী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে আহবান করেছিল। অথচ সংগ্রাম পরিষদের বেশিরভাগ দলই এই কর্মসূচীর ব্যাপারে কিছুই জানতো না। আবার ২৪ মার্চ কাল দিবসের কোন কর্মসূচী সংগ্রাম পরিষদে গৃহীত হওয়ার বহু পূর্বেই ওরা জেলায় জেলায় খবর চালান দিয়েছিল যে, ২৪ মার্চ সংগ্রাম পরিষদ একটা কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরকম কেন হয়? কেন কিছু সংখ্যক উগ্র মস্তিস্ক ব্যক্তি ১৪ ফেব্রুয়ারী শহীদের লাশ ফেলে রেখে হঠাৎ করে বটতলা থেকে ছুটে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষকদের ধাওয়া করে? এ কোন ধরনের বিপ্লবীপনা? এটা ঠিক যে ১৪–১৫ ফেব্রুয়ারীর হত্যকান্ডের প্রতিবাদে সেসময় ভালভাবে প্রচার চালিয়ে সারাদেশব্যাপী হরতাল ইত্যাদি ধরণের একটা বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতো। কিন্তু সেটা ঠিক ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব দিনেই

কেন? আর দুই তিনটা দল মিলে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবেই বা কেন? এটা তো সংগ্রাম পরিষদের সব দল মিলে আলাপ-আলোচনা করেই ঠিক করা যেতো। আর তাহলে ২১ ফেব্রুয়ারীর পর পরই ২৩ বা ২৪ ফেব্রুয়ারী খুব সফল ও জঙ্গীভাবেই একটা হরতাল করা যেতো। দেশের সর্বত্র একুশের সমাবেশগুলো থেকে জনগণের মধ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েই হরতাল করা যেতো। কিন্তু তা করা গেল না। এবং এর জন্য দায়ী ঐ মহলটিই। ওদের কাজের ফল হলো একটি সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা'।

১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারীর (১৯৮৩) কর্মসূচীর তারিখ-স্থান নিয়েও মতভেদ ছিল। ছাত্র ইউনিয়ন গোষ্ঠী তাদের 'সামনে আছে জোর লড়াই' পুস্তিকায় এই সম্পর্কে আরো বলেঃ

'১৪ ফেব্রুয়ারী পরিস্থিতির দুইটি বৈশিষ্ট্য। একদিকে ঐদিন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় বটতলায় হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এক জঙ্গী সমাবেশ। বুলেট বেয়োনেটের মুখে সামরিক আইন ভেঙ্গে মিছিল নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় শপথে বলিয়ান এক উত্তাল তরঙ্গ। আর অন্যদিকে সেই সময়ে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী ও জনগণের অন্যান্য অংশের মধ্যে আন্দোলনমুখী সক্রিয় তৎরপতা তুলনামূলকভাবে অনেক পেছনে। সেই সময় ২০ ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে ১৫ দলের ঐক্য সবে মাত্র গড়ে উঠছিল, কিন্তু তখনই একটা চূড়ান্ত লড়াইয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে নাই...।

,আমাদের অজানা নেই যে.., এই সামরিক সরকার প্রধানের পকেটে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগানের ব্যক্তিগত চিঠি থাকে এবং তা তিনি জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে গর্বের সাথে পাঠ করেন।...

'ছাত্র সমাজের জমায়েত ও আন্দোলন হিসাবে ১৪ ফেব্রুয়ারী আমাদের শক্তি সমাবেশে ছিল বৃহত্তম ও সবচেয়ে জঙ্গী। আমাদের দাবি ও আন্দোলন ছিল খুবই ন্যায্য। কিন্তু সেদিন লড়াই-এর ময়দানে সক্রিয় শক্তি হিসেবে আমরা ছিলাম একা। সরকার এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় এবং...চরম আঘাত হানে।

'তাহলে আমাদের মিছিলের কর্মসূচীটি যদি ১৪ ফেব্রুয়ারী না হয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারী হতো? সেদিনও কি সরকার ঠিক একইভাবে একই কায়দায় আঘাত হানতে পারতো? যদি তা করতো তাহলে ১৫ ফেব্রুয়ারী যতুটুকু প্রতিবাদ হয়েছে তার চেয়ে আরও বেশি ও সংগঠিতভাবে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে পারতো দেশের রাজনৈতিক শক্তি গুলো, দেশের মানুষ। কারণ ২১ ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করেই ১৫ দল, শ্রমিক

সংগঠগুলো, কৃষক সংগঠনগুলো, বুদ্ধিজীবী সমাজ সকলেই আন্দোলনমুখী একটা সংগঠিত প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন।

'এখানেই আন্দোলনের দিনক্ষণ স্থির করার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রশ্ন। একটা 'দিবসই' আন্দোলন নয়। বরং আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের পক্ষে নিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য থেকেই মিটিং 'মিছিলের দিনক্ষণ স্থির করা বাঞ্ছনীয়।

এখানে একটা কথা চলে আসে যে ছকবাঁধা পথে আন্দোলন হয় না। কিন্তু তাড়াহুড়া করেও হয় না। এর একটা বিজ্ঞান আছে...।

'১৪ ফেব্রুয়ারী আমাদের সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচীটা আমরা আজ একটু ভিন্নভাবেও বিচার করে দেখতে পারি। সচিবালয়টা কি? এটা সরকারের আস্তানা।... জনতাকে জাগিয়ে তুলে সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারপর সচিবালয় অভিযানের কর্মসূচী নিতে হতো। তখন দেখতাম, ছাত্র–জনতার বুকে সরকার কেমনে গুলী চালায়।

'কিন্তু আমরা তা করলাম কই? জনগণকে সাথে না নিয়েই আমরা পৃথকভাবে অগ্রসর হলাম। জনগণকে সঙ্গে নেয়ার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন ছিল। আর ঠিক এই 'সময়টুকু' নিয়েই তো মহল বিশেষের অধৈর্য ও তাড়াহূড়া!

'১৪ ফেব্রুয়ারী আমাদের মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছিল এক মাসের অধিকাল পূর্বে ১১ জানুয়ারী। সেদিন এই দিবস ঘোষণার ব্যাপারে একটা তাড়াহূড়া ভাব আমাদের মধ্যে ছিল। মিছিলের দিনক্ষণ ঠিক করার ব্যাপারে ধীর স্থির ভাবে চিন্তা ভাবনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নেয়া হয়নি বা নেয়া সম্ভব হয়নি। কারণ একক বা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও ছাত্র সমাজকে এখনই একটা চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষায় নামতে হবে এরকম একটা প্রবণতা আমাদের একাংশের মধ্যে কাজ করছিল। এই প্রবনতা সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে উস্কে দেয়ার জন্যও ১৪ দলীয় ছাত্র নেতৃত্বের পরিকল্পনার বাইরে মিটিং মিছিল সংগঠিত করা হচ্ছিল...। শেষ পর্যন্ত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভূমিকা নেয় এবং তাদের সতর্ক করে।

'এর পরেও ১৪ ফেব্রুয়ারীর পূর্বে ১২ ফেব্রুয়ারী এই মহলের উস্কানীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটি রক্তদান অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে জেনারেল এরশাদের আসার কথা ছিল। সেই অজুহাতে আগুন দেয়া হয়। কিন্তু আন্দোলনের আর কোন পথ কি ছিল না? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন করতেও এরশাদ গিয়েছিলেন। কিন্তু তার সে অনুষ্ঠান পন্ড করা হয়েছিল স্রেফ স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু সংগঠিত বয়কট দ্বারা। ঢাকা মেডিকেলেও কি সেরকম কিছু করা যেত না? এই উগ্র প্রবনতার অনুসারী মহলটি কি চাইছিল?

'তাদের মনে যাই থাকুক বাহ্যত ওরা চাইছিল ছাত্র ও সরকারী বাহিনীর সাথে একটা 'বীরত্বপূর্ণ লড়াই' এখনই হয়ে যাক। সরকারের কাম্যও ছিল ঠিক তাই। আমাদের ছাত্র আন্দোলনকে 'শায়েস্তা' করার জন্য সরকারও খুঁজছিল এমন একটা সময় যখন চরম আঘাত হানলেও ছাত্র আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়াবার মত প্রস্তুতি জনগণের অন্যান্য অংশের থাকবেনা, বরং ভেঙ্গে যাবে। ১৪ ফেব্রুয়ারী সেরকম একটা সুবিধাজনক সময় সরকার খুঁজে পেয়েছিল। এইভাবে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় উগ্র ও হঠকারী কাজগুলো আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরেই সরকারের হাতকে শক্তিশালী করছিল এ ধরনের তৎপরতা আজও সক্রিয় রয়েছে'।[১৭]

জাসদপন্থী ছাত্রলীগ মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে গিয়ে এর জবাব প্রদান করে। তাদের মুখপত্র 'ইশতেহার'–এ 'দোলায়মান তত্ত্ব বনাম ইশতেহার' শীর্ষক নিবন্ধে মন্তব্য করে:

'ছাপার অক্ষরে বেরোনো মতামতগুলোর মধ্যে সাপ্তাহিক 'একতা' সাপ্তাহিক 'নতুন বাংলা,' বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের 'জয়ধ্বনি' বেনামী সংগ্রামী ছাত্র সমাজের 'সামনে আছে জোর লড়াই' ও অন্যান্য কয়েকটি প্রকাশনা একটা নির্দিষ্ট বক্তব্যের ওকালতি করছে। এ সমস্ত বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে যে, মধ্য ফেব্রুয়ারীর রক্তক্ষয়ী ছাত্র আন্দোলন সময় না বুঝেই চূড়ান্ত লড়াইয়ে নেমেছে, ভীমরুলের চাকে খোঁচা মেরেছে, সামাজিক বিপ্লব করতে চেয়েছে, সরকার ও ছাত্র সমাজ উভয়পক্ষ বাড়াবাড়ি করে অনভিপ্রেত ঘটনার জন্ম দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি...।

'উল্লিখিত পত্রিকাগুলোর মতধারীরা আরো মনে করেন যে, এ মুহূর্তে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হচ্ছে হঠকারী প্রবণতা, বাড়াবাড়ি বিপ্লব করার নেশা, নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক প্রভৃতি...।

'সামরিক জান্তার পাশবিক নির্যাতনের মাত্রা নজীরবিহীন ও অকল্পনীয় ছিল বলেই আন্দোলনকে ব্যর্থ 'বিপ্লব' বলে চিত্রিত করা যায় না..।

'তবে হ্যাঁ। ভাল হোত যদি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য মেহনতী ও গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলন আনুপাতিক ভাবে সম্পৃক্ত থাকত এবং তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অবস্থান করতো। এটা হচ্ছে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় একটি দিক..।

'রাজনৈতিক দগুলোর অধিকাংশের সমালোচনার মানে কি এই যে, সামাজিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে ছাত্ররাই?

'রাজনৈতিক অঙ্গনের সমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দুর্বলতাগুলোকে নির্মমভাবে উন্মোচিত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পরিবেশ সৃষ্টি করা, উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তি ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো...।

'যদি রাজনৈতিক দলসমূহ নেতৃত্ব দিতে এমনিভাবে বারবার অক্ষমতা প্রকাশ করতে থাকে তাহলে জনতা তাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলবেই...।

'রাজনৈতিক দলের সমালোচনা হটাৎ নতুন করে ১৪ ফেব্রুয়ারীর পরে হাজির হয়নি, কিম্বা ইশতেহার পত্রিকার একক পুঁজি না। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গত ১৯৭৯–৮১ সনের বার্ষিক সম্মেলনে লিখিত রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে ১৯৮১ সালে গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন মাঝপথে থেমে যাওয়ার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলেছেন: 'ছাত্র সংগঠনগুলি রাজনৈতিক দলগুলির পিছুটানে নিরূপায় শিকার হয়েও নির্জীব হয়ে গেছে'...।
'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ফজলু–চুন্নু) জাতীয় সম্মেলন ৮৩ সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, 'এর বিপরীতে জাতীয় রাজনীতির প্রগতিশীল ধারা আজ দারুণ সংকটে নিপতিত'।...
'ছাত্র আন্দোলনকে অনেকে দোষারোপ করেন ১৫ দলীয় জোটের জানার বাইরে বিচ্ছিন্ন আচমকা ঘটনা হিসেবে। ১৪ ফেব্রুয়ারীর ছাত্র বিক্ষোভ তাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, যা তাদের সাজানো সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীকে নাকি লন্ডভন্ড করে দিয়েছে...। নিজেদের অক্ষমতা ও শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা ঢাকতে গিয়ে ছাত্র আন্দোলনে হঠকারী ও বেশী অগ্রসরমান আন্দোলন, বলে চালিয়ে দিলেই পার পাওয়া যায় না'।[১৮]

সচিবালয় ঘেরাওঃ ১৯৮৩

২৮ নভেম্বর (১৯৮৩) ১৫ দল ও ৭ দল যৌথভাবে সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দেয়। বিশাল জমায়েত ও অগ্নিমূর্তি ধারণকারী জনতার ঢল নামে এই দিন সচিবালয়ের চতুর্দিকে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই কর্মসূচীর প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ব্যক্ত করে এবং প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।

সরকার পূর্ব থেকেই সচিবালয়ের চতুর্দিকের রাস্তায় ১৪৪ ধারা জারী করে। আইন ভঙ্গ করলে রক্তক্ষয়ের ইঙ্গিত প্রচার করতে থাকে সরকার।

জনতার উদ্দেশ্যে ২২ দলের নেতৃবৃন্দ শ্লোগান মুখর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এই সময় রায়টকার থেকে গরম রঙিন পানি ও টিয়ার গ্যাস অবস্থান ধর্মঘটীদের উপর ছোঁড়া হয়। ফলে লঙ্কাকান্ড ঘটে যায়। জনতাও উন্মত্ত হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিও গুলী চালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। সচিবালয়ের ছাদে পর্যন্ত অস্ত্রধারী সৈন্য ও পুলিশ এবং বিডিআর আশ্রয় নিয়ে ক্রমাগত গুলী চালায়।

প্রতিবাদকামী মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একদল সচিবালয়ের দেয়াল ভেঙে ফেলে। বিদ্যুতের তার বেয়ে বেয়ে মানুষ সচিবালয়ের দেওয়ালে উঠে আসে। এক রণক্ষেত্রে পরিণত হয় বাংলাদেশ সচিবালয়ের চতুর্দিক। সেদিন পাখীর মতো গুলী করে মানুষ হত্যা করা হয়। অন্ততঃ ১১ জন নিহত হয় বলে অনুমান করা হয়েছে। প্রেসক্লাবের গেটে সাংবাদিকদের পেটানো হয়। পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবাসে ঢুকে ছাত্রদের পাইকারীভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

২২ দল প্রতিবাদে ২৯ নভেম্বর ঢাকায় এবং ৩০ নভেম্বর (১৯৮৩) সারাদেশে হরতাল ডাকে।

এরশাদ সরকারের উস্কানী ও দমননীতির মধ্যেও এ হরতাল ব্যাপক সফলতা লাভ করে। এই সময় স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার উপজেলা নির্বাচনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেন।

সেলিম: দেলোয়ার: তাজুল হত্যা

তিনি ভাবেন, নির্বাচন দিতে পারলে মানুষ এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং বিরোধী দলের লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচী মার খাবে।

কিন্তু ২২ দল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উপজেলা নির্বাচন বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। বিরোধী দল ৪ মার্চ (১৯৮৪) পর্যন্ত উপজেলা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা বেধে দেয়। ৮ থেকে ২৩ মার্চ উপজেলা নির্বাচন প্রতিরোধ পক্ষ পালন এবং ২৪ মার্চ (এরশাদের ক্ষমতা আরোহনের দিন) 'কালো দিবস' পালনের আহবান জানায় ২২ দল।

এই কর্মসূচী সফল করতে ঘন ঘন মিছিল হচ্ছিল ঢাকা রাজধানী শহরে। ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৪) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উপজেলা নির্বাচন বিরোধী একটি মিছিল বিশ্বদ্যািলয় থেকে গুলিস্তান অভিমুখে রওয়ানা হয়। ফুলবাড়িয়ার কাছে এক ট্রাক

পুলিশ মিছিল ধাওয়া করে এবং উন্মত্ত পিশাচের মতো মিছিলের ওপর পুলিশের ট্রাকটি তুলে দেয়। আওয়ামী লীগপন্থী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা সেলিম এবং দেলোয়ার হোসেন এই ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে শাহাদাৎ বরণ করে।

পয়লা মার্চ পূর্ব নির্ধারিত হরতাল ছিল। এই হরতাল সফল করার কর্মসূচীতে হামলা হয় আদমজীতে। সায়েদুল হক সাদু নামে কুখ্যাত শ্রমিক গুন্ডা হত্যা করে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন নেতা ও স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নেতা তাজুল ইসলামকে। পয়লা মার্চে আহত তাজুল ২ মার্চ মৃত্যু বরণ করেন।

এসব ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপের প্রতিবাদে ৪ মার্চ (১৯৮৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় প্রতিবাদ সভা এবং ৫ মার্চ সারাদেশে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়।

সারাদেশে ধরপাকড় চলতে থাকে এই সময়। ছাত্র ইউনিয়নের সহসভাপতি ও ইউকসুর সাধারণ সম্পাদক মাহতাবউদ্দিন, ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, তুষার সাহা, ধুর্জটি প্রসাদ, ছাত্রলীগ (মান্নান–নানক) এর এফ. রহমান হল শাখার নেতা জহিরউদ্দিন, ছাত্রলীগ টি এন্ড টি কলেজের নেতা হেলালউদ্দিন, লিয়াকত সুজা, ঢাকা কলেজের নেতা জুয়েল, উজ্জ্বল দত্ত, ছাত্রলীগ (ফ–চু)–এর তেজগাঁও থানার নেতা তাহের, ঢাকা শহর ছাত্র নেতা হাবিবউদ্দিন, জাহাঙ্গীর, ছাত্রলীগ (শি–মু) এর কর্মী তৌহিদ, এস. এম. হল শাখার কাজী আনোয়ার, আবুল হাশেম সহ অসংখ্য কর্মী ও সমর্থককে এই সময় গ্রেফতার করা হয়।

শুধু তাই নয়, পুলিশ কন্ট্রোলরুমে তাদের সাথে পাশবিক আচরণ করা হয়। অনেকেরই এতে অঙ্গহানি হয়। ইউকসুর ছাত্রনেতা মাহতাবউদ্দিনকে পুলিশ কন্ট্রোলরুম থেকে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয় আরেকদফা নির্যাতনের জন্যে।

সারাদেশেই নির্যাতনের এই ধারা অব্যাহত রাখা হয়। বগুড়ার ছাত্রলীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আমজাদ হোসেন, নেত্রকোণা ছাত্রলীগ নেতা আমিনুল খান মুকুল ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আবুল কাসেম ও আবদুর রহমান প্রমুখকে গ্রেফতার করে নির্যাতন চালানো হয়।

এরশাদ এই সময় ১৮ দফা ঘোষণা করেন এবং এককালীন মুসলিম লীগ নেতা মাহাবুবুর রহমান ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদের আহবায়ক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

সাংবাদিক আবদুর রহমান ও দুলালকে হত্যাকারী জাসদপন্থী ছাত্রলীগ নেতা আযম খানকেও এই সময় মুক্তি দেওয়া হয়। আযম খান পরে আওয়ামী লীগ নেতা সংসদ নেতা ময়েজউদ্দীনকেও প্রকাশ্যে কালিগঞ্জের রাস্তায় হত্যা করে। বাসদ ছাত্রলীগের ঢাকা নগর শাখার সভাপতি হিসেবে আযম খান, জিয়াউদ্দিন বাবলু ও দেলোয়ার হোসেন রাজা ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদে যোগ দিয়ে সামরিক প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রতি তাদের আস্থা জ্ঞাপন করে।

বাংলাদেশে তেজোদীপ্ত ও আপোষহীন ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে কলঙ্কময় ঘটনা হলো, একজন সামরিক একনায়ক এরশাদ, ডাকসুর সাধারণ সম্পাদকের মতো ছাত্রনেতাকে কিনে নিতে সক্ষম হন। এরশাদের পূর্ববর্তী সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াও এতবড় ছাত্রনেতা তাঁর পক্ষে শেষ পর্যন্ত নিতে সক্ষম হননি। যদিও জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মতো শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন গঠন করে তাঁর পক্ষে ব্যাপক ছাত্রদের সম্মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বড় কোনো ছাত্রনেতাকে তিনি তাঁর দলে ভেড়াতে পারেন নি। এরশাদ বাসদ ছাত্রলীগ নেতা জিয়াউদ্দীন বাবলুকে খুব সহজেই কিনে নিতে সক্ষম হন।

এই সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বাবলু বলেন, জেনারেল এরশাদ এই সময় ছাত্রদের প্রায় সবগুলো ন্যায্য দাবী মেনে নিয়েছিলেন এবং জাতীয় পুর্নগঠনে তাঁর গণমুখী কর্মসূচী আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।[১৯]

আযম খান, দেলোয়ার হোসেন রাজা প্রমুখ ছিলেন প্রথমে জাসদের সশস্ত্র গণবাহিনীর সদস্য। খুন, হত্যা, লুণ্ঠন ও ছিনতাই ঘটনার সাথে তাঁরা প্রতিনিয়ত জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জাসদ ও জাসদপন্থী ছাত্রলীগের পূর্ণ সমর্থন পেতে থাকেন তারা। জাসদ ছাত্রলীগ ভেঙে গেলে তাঁরা বাসদপন্থী ছাত্রলীগে যোগদান করে। এই সময় বাসদ ছাত্রলীগেরও পূর্ণ সহযোগিতা তাঁরা পায়। সাংবাদিক রহমান–দুলাল হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত হয়ে আযম খান জেলে যান এবং বাসদ ছাত্রলীগ তাঁর মুক্তি দাবী করে।

একজন খুনী ছাত্রনেতাকে কেন এভাবে একটি আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন সমর্থন করে যাচ্ছিল তা কোনো রহস্যময় ঘটনা নয়। বাংলাদেশের সকল ছাত্র সংগঠন প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র দলগুলির সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্যেই পরস্পর খুনী ও সন্ত্রাসীদের এভাবে আশ্রয় দিয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বাসদপন্থী ছাত্রলীগের তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় নেতা মোস্তফা ফারুক স্বীকার করে বলেন, 'জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ভেঙে আমরা সবেমাত্র

বাসদ ছাত্রলীগ করেছি, ওদের সাথে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিল, ফলে রহমান–দুলালের হত্যার সাথে জড়িত জেনেও তাঁকে বহিস্কার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আযম খান জেল থেকে মুক্তি পেয়েই তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর দাবী জানালে, আমরা তা মেনে নেইনি। এই সময়ই সে এরশাদপন্থী হয় এবং বাবলু–রাজার সাথে যোগ দেয়'।[২০]
৪ আগষ্ট (১৯৮৩) আযম খান, দেলোয়ার হোসেন রাজা ও জিয়াউদ্দীন বাবলুর সমর্থক গোষ্ঠী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সশস্ত্র হামলা করে মধুর কেন্টিন দখল করে নেয়। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্মীরা তাদের চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। সকাল সাড়ে দশটার দিকে তারা পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় প্রায় ৩০ জন ছাত্র–ছাত্রী আহত হয়।
পরে এরা নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ নামে আবির্ভূত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে লেবানন নগরীতে পরিণত করে। এরপর থেকে গুলী, বোমার আওয়াজে বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বর প্রতিনিয়ত কম্পিত হতে থাকে।

এই সময় কালিগঞ্জের এক জনসভায় জেনারেল এরশাদ, আযম খানকে তাঁর 'ছোট ভাই' বলে ঘোষণা দেন। উপস্থিত কালিগঞ্জবাসী তাঁর এই ঘোষণায় হতবাক হয়ে পড়ে।

৮ডিসেম্বর হরতাল এবং অন্যান্য ঘটনা

৮ ডিসেম্বর (১৯৮৩) ১৫ দল ও ৯ দলের উদ্যোগে ২৪ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগরীতে কতকগুলি ঘটনা ঘটে যা রাজনৈতিকভাবে ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।
হরতাল চলাকালীন সময়ে সকাল ১১টার দিকে কিছু সংখ্যক ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং কথিত আফগান মুজাহিদ সংহতি পরিষদের নেতা আবুল কালাম আজাদের বাসায় যায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে অধ্যাপক সাহেব, ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ৩ রাউন্ড গুলী ছুঁড়েন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।
পরে বিকেল পৌনে ৪ টার দিকে উপাচার্য ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের মধ্যস্থতায় তাকে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রলীগ (চি–ই), ছাত্র ইউনিয়ন, ডাকসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মশিহুজ্জামান পৃথক পৃথক ভাবে জনাব আজাদের নিন্দা করে বিবৃতি দেয়। তাঁরা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপসারণেরও আহবান জানান।

হরতালকারীরা এদিন সাবেক রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক, প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, জাসদ নেতা আ.স.ম আবদুর রব, নতুন বাংলা জন যুব সংহতির আহবায়ক শেখ শহীদুল ইসলাম, জাতীয় ছাত্র পরিষদের আহবায়ক জিয়াউদ্দিন বাবলু, টেলিভিশনের 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ফজলে লোহানীর বাড়ী আক্রমন করে।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি

এরশাদের ক্ষমতাকালীন এই সময়ে চাউল ছাড়া আর সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকারের এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ডাইরেকটরেট প্রকাশিত ২৬ ডিসেম্বর (১৯৮৩) এবং ২ জানুয়ারী (১৯৮৪)-র সাপ্তাহিক বাজার দর থেকে এই মূল্যবৃদ্ধির সত্যতা প্রকাশিত হয়ঃ[২১]

দ্রব্যের নাম	সের প্রতি দাম (বছরের শুরুতে)	সের প্রতি দাম (বছরের শেষে)
চাউল		
(আমন)	৮.২৫-৮.৫০	৮.৫০-৮.৭৫
(ইরি)	৬.৭৫-৭.০০	৬.৭৫-৭.০০
আটা	৫.০০-৫.৫০	৫.৫০-৬.০০
ডাল	১০.০০-১২.০০	১৩.০০-১৪.০০
সোয়াবিন তৈল	২১.০০-২২.০০	২৮.০০-৩০.০০
মরিচ	১৬.০০-১৮.০০	৩০.০০-৩২.০০

ঢাকায় মহাসমাবেশ: অর্থনীতিতে লুটপাট

১৯৮৪-র ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহ এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহে এরশাদ শাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলন দাবানলের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। হরতাল, ধর্মঘট, বিক্ষোভে সারাদেশ একাকার হয়ে পড়ে। উপায়ন্তর না দেখে সরকার তার গুন্ডা বাহিনী দিয়ে খুন, জখম, হত্যা ইত্যাদি জঘন্য কর্মকান্ড পরিচালিত করতে থাকে।

হরতালকারীরা এদিন সাবেক রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক, প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, জাসদ নেতা আ.স.ম আবদুর রব, নতুন বাংলা জন যুব সংহতির আহবায়ক শেখ শহীদুল ইসলাম, জাতীয় ছাত্র পরিষদের আহবায়ক জিয়াউদ্দিন বাবলু, টেলিভিশনের 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ফজলে লোহানীর বাড়ী আক্রমন করে।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি

এরশাদের ক্ষমতাকালীন এই সময়ে চাউল ছাড়া আর সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকারের এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ডাইরেকটরেট প্রকাশিত ২৬ ডিসেম্বর (১৯৮৩) এবং ২ জানুয়ারী (১৯৮৪)-র সাপ্তাহিক বাজার দর থেকে এই মূল্যবৃদ্ধির সত্যতা প্রকাশিত হয়ঃ[২১]

দ্রব্যের নাম	সের প্রতি দাম (বছরের শুরুতে)	সের প্রতি দাম (বছরের শেষে)
চাউল		
(আমন)	৮.২৫-৮.৫০	৮.৫০-৮.৭৫
(ইরি)	৬.৭৫-৭.০০	৬.৭৫-৭.০০
আটা	৫.০০-৫.৫০	৫.৫০-৬.০০
ডাল	১০.০০-১২.০০	১৩.০০-১৪.০০
সোয়াবিন তৈল	২১.০০-২২.০০	২৮.০০-৩০.০০
মরিচ	১৬.০০-১৮.০০	৩০.০০-৩২.০০

ঢাকায় মহাসমাবেশ: অর্থনীতিতে লুটপাট

১৯৮৪-র ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহ এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহে এরশাদ শাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলন দাবানলের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। হরতাল, ধর্মঘট, বিক্ষোভে সারাদেশ একাকার হয়ে পড়ে। উপায়ন্তর না দেখে সরকার তার গুন্ডা বাহিনী দিয়ে খুন, জখম, হত্যা ইত্যাদি জঘন্য কর্মকান্ড পরিচালিত করতে থাকে।

৮৪-তে আরেকটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় ঢাকার আদূরে কালিগঞ্জে। হরতাল কর্মসূচী পালনকালে প্রকাশ্য দিবালোকে আযম খান আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য ময়েজউদ্দীনকে হত্যা করে।

৮৪-র অক্টোবরে ঢাকার শেরেবাংলা নগরে ১৫ দলের উদ্যোগে স্মরণাকালের বৃহত্তম মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় ঐতিহাসিক ২১ দফা।

১৭ ডিসেম্বর (১৯৮৪) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বেতার ও টেলিভিশনে একতরফা ও বিশেষ দলীয় প্রচার এবং মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় চেতনা বিরোধী অপসংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি প্রচার বন্ধের দাবীতে জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করে। অবস্থান ধর্মঘটের সমাবেশে স্মারকলিপি পাঠ করেন ছাত্রনেতা আনোয়ারুল হক।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, জাতীয় প্রচার মাধ্যম বেতার ও টেলিভিশন সামরিক সরকারের প্রধান ও জনদলীয় মন্ত্রীদের প্রচারের বাহন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। স্মারকলিপিতে অবিলম্বে রেডিও বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশ বেতার করার দাবী জানানো হয়। বেতার ও টেলিভিশনের প্রযোজক, ঘোষক, পাঠক ও পাঠিকাদের মিথ্যা খবর পরিবেশনে বিরত থাকা ও সরকারী নিদের্শ না মানার আহবান জানানো হয়।

১৯ ডিসেম্বর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালন করে। এতেও একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এতে বলা হয়, দেশে বিরাজমান গণবিরোধী লুটেরা অর্থনীতিতে গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা অথবা গণতন্ত্র কোনোটাই বাস্তবায়িত হতে পারে না।

ঘোষণায় আরো বলা হয়, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে লোকসানী খাতে পরিণত করে সেগুলো ব্যক্তিমালিকানায় ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে। ২৪৫ কোটি টাকা দামের ২৯টি পাটকল মাত্র সাড়ে ৫ কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছে এবং ৩০০ কোটি টাকার পূবালী ব্যাংক মাত্র ১৬ কোটি টাকায় পানির দরে বিক্রি করে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। ঘোষণায় এই সব লুটপাটের অর্থনীতি প্রতিরোধ কল্পে ১২ দফা দাবী নামা ও পদক্ষেপ চূড়ান্ত করা হয়।

বস্তুত: এরশাদের চরিত্র এই সময় সাম্রাজ্যবাদী থেকে মাফিয়া চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। সাম্রাজ্যবাদীদেরও দেশপ্রেম থাকে, কিন্তু মাফিয়ারা দেশের সব কিছু এই সময় বিক্রি করে দিচ্ছিল। ন্যূনতম দেশপ্রেম তাদের কাছে পাওনা মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়।

২২ ডিসেম্বর (১৯৮৪) শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ডাকে সারাদেশে পালিত হয় ঐতিহাসিক ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘট। সারাদেশে এই ধর্মঘট স্বৈরশাসক এরশাদকে স্তব্ধ করে দেয়। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে পুলিশের গুলীতে এই সময় শহীদ হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাসদপন্থী ছাত্রলীগের নেতা শাহজাহান সিরাজ।

এরশাদ: 'আমি পিতা হতে চলেছি'

১৯৮৫ সালের ১৪ জানুয়ারী জেনারেল এরশাদ রাজনীতিতে নতুন এবং গরম খবর পরিবেশন করেন। এদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে জড়িত আসামী, 'একে ধরিয়ে দিন' খ্যাত রাজাকার মাওলানা মান্নানের সভাপতিত্বে জমিয়তে মোদারেসীন আয়োজিত এক সম্মেলনে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এরশাদ বলেন, 'আমার ২৬বছরের বিবাহিত জীবন, কিন্তু আমি নিঃসন্তান। আল্লাহ আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছেন। আমি পিতা হতে চলেছি'।

উল্লেখ্য, জেনারেল এরশাদ ঐদিন তাঁর পিতা হওয়ার সংবাদের সূত্র হিসেবে একটি চাদরের অবদানের কথা স্মরণ করেন। চাদরটি মাওলানা মান্নান ১৯৮১ সালের জুন মাসে বাগদাদে অবস্থিত বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)–এর মাজার থেকে এনে দিয়েছিলেন বলে দাবী করা হয়।

এরশাদের পিতা হওয়ার পেছনে মূল অবদানকারী মাওলানা মান্নান ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যার খুনী আসামী হলেও ১৯৭৫ সালের পর জেনারেল জিয়ার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরে পরিণত হন। ১৯৮১ সালের ২৭ নভেম্বর বি. এন. পি মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে রাজাকার মাওলানা মান্নান রাষ্টীয় মর্যাদায় পুনর্বাসিত হন। পরে তিনি জেনারেল এরশাদের কাছে 'রত্ন' হিসেবে দেখা দেন এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মন্ত্রী হিসেবে পরিগণিত হন।

কয়েকদিন পরই এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদ 'মাতা' হিসেবে হটাৎ করেই জনগণের সামনে আবির্ভূত হয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। কারো মতে, এই সন্তান 'সাদ' আসলে ছিল তাঁর বোনের সন্তান, কারো কারো মতে, এই সন্তান একটি এতিমখানার অজানা পিতা–মাতার সন্তান।

তবে এদিন বুড়ো বয়সে এরশাদের বাবা হওয়ার সংবাদের চেয়েও যে মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ও গতির সঞ্চার করলো, তাহলো শহীদ মিনারে আলপনা আঁকার বিরুদ্ধে এরশাদের অকারণ কটুক্তি। এই দিন জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট করার সঙ্কল্পও ব্যক্ত করেন।

সারাদেশে তাঁর এইসব বক্তব্যের প্রতিবাদে ঝড় ওঠে। সামনেই ছিল একুশে ফেব্রুয়ারী। ছাত্র ও সংস্কৃতি সেবীগণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে, ফুটপাতে, রাজপথে যে যেখানে পেরেছে, সে সেখানেই আলপনা এঁকে পথ-প্রান্তর ভরে তোলে। একুশে উপলক্ষে প্রতিবছরই আলপনা আঁকা হতো, কিন্তু এই বছরের মতো এতো আলপনা বাংলাদেশে আর কখনো আঁকা হয়নি।

আলপনা আঁকাকে এরশাদ মিছেই ধর্মীয় অনুভূতির সাথে মিলিয়ে প্রগতিশীল ছাত্র-জনতাকে ঘায়েল করলেন এবং 'না-জায়েজ' কাজ বলে ঘোষণা করে আলেম সমাজকে ছাত্র ও সংস্কৃতিসেবীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইলেন। এর ফল এরশাদের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াল।

বসুনিয়া হত্যা

১৯৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঐদিন জাতীয় ছাত্রলীগের প্রতিশ্রুতিবান ছাত্রনেতা রাউফুন বসুনিয়াকে হত্যা করা হয়। একটি মহল দাবী করে সরকারই চক্রান্ত করে বসুনিয়াকে মেরেছে। আরেকটি মহল দাবী করে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাতীয় নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্যেই একটি পরিকল্পিত নাটক থেকে বসুনিয়াকে হত্যা করেছে।

কিন্তু কিভাবে এমন একজন ছাত্রনেতা নিহত হলেন, একজন প্রত্যক্ষদর্শী, এরশাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা মোস্তফা ফারুক তার বিবরণ দেন:

'এফ রহমান হলে সরকার সমর্থক নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের একটি সশস্ত্র দল গুলী বর্ষণ করে যাচ্ছিল। ওদের দিকে পাল্টা গুলি ছুঁড়ছিল মহসিন হল থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সশস্ত্র গ্রুপটি। আমি নিজে ছাত্রদল নেতা সানাউল হক নীরুকে গুলী চালাতে দেখি।

'এই সময় জাতীয় ছাত্রলীগের একটি মিছিল যাচ্ছিল। তারা গোলাগুলীর কথা জানতো না। হটাৎ করেই মিছিলটি দুই সশস্ত্র দলের মাঝে পড়ে যায়। আর সাথে সাথেই একটি ঘাতক বুলেট বসুনিয়াকে বিদ্ধ করে। আমি স্তম্ভিত হৃদয়ে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করি।[২২]

বসুনিয়ার হত্যাকান্ড সমগ্র রাজনৈতিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নামিয়ে আনে। এটা যে একটা চক্রান্ত ছিল এবং পরিকল্পিতভাবেই তা সাজানো হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দু'সপ্তাহের মধ্যেই। মাত্র ১৫ দিন পরেই জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্যে নতুন করে সামরিক আইন জারী করেন। সামরিক আইন

জারীর পটভূমি তৈরীর জন্যে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের নামে অবস্থানকারী সরকার সমর্থকদের দিয়ে একটা গন্ডগোল সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি ঘটনা ঘটানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। রাউফুন বসুনিয়া এই নীল নকশার নিষ্ঠুর শিকার।

১৯৮৬: নির্বাচন বিতর্ক: আসলাম হত্যা

নতুন করে ঘোষিত এই সামরিক শাসনের মধ্যে নির্বাচনে যাওয়া শুদ্ধ হবে কি হবে না–এই সময় বিতর্কে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই সময় বেশ জড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, এই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তার ১০দফা, ছাত্র সমস্যা, শিক্ষানীতি ইত্যাদি ছাত্র বিষয়ক আন্দোলন থেকে একেবারে দূরে সরে এসে জাতীয় রাজনীতির ডামাডোলে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কর্মসূচীই ৮৪, ৮৫, ৮৬ সালের সমগ্র অংশ ছাত্র রাজনীতিকে প্রভাবিত করে রাখে। ছাত্রদের নিজস্ব দাবী–দাওয়ার বিষয়টি তখন একেবারে চাপাই পড়ে থাকে। একটাই লক্ষ্য এরশাদের পতন, একটাই উদ্দেশ্য এরশাদকে হটানো।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনের ব্যাপারে খুব বেশী উৎসাহী হয়ে পড়ে। তারা বারবার এই যুক্তি তুলে ধরতে থাকে যে, নির্বাচনের
সুযোগ নষ্ট করলে সীমাবদ্ধ এই গণতন্ত্রের সুবিধাও এরশাদ সরকার কেড়ে নেবে। ছাত্রলীগ (সুলতান–রহমান) অংশ এ ব্যাপারে খুব একটা সক্রিয়তা দেখাতো না। নির্বাচন বিতর্কে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে তারা কার্যতঃ নীরবই থাকতো। জাসদপন্থী ছাত্রলীগ নির্বাচন বিরোধী অংশের সবচেয়ে সোচ্চার কণ্ঠ হিসেবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে সক্রিয় ছিল।

এভাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের দুই বিপরীত ধারায় প্রথম থেকেই বিভক্ত হয়ে পড়ে। আবুল হাসিব খান ও আনোয়ারুল হক দুই কট্টর বিপরীত মতাদর্শের ছাত্রনেতা দুই বিবদমান মতাদর্শী গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

১৯৮৬ সালের মার্চের দিনগুলো কূটনৈতিক মারপ্যাচে বিরোধীদল সরকারী দলকে নাস্তানাবুদ করে ফেলে। বিরোধী দল নির্বাচনে যাবে কি, যাবে না, এই বিতর্কে রাজনৈতিক মহল ছিল সরগরম।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৫ দলে একটা নির্বাচনী হাওয়া পূর্ব থেকেই তোলার চেষ্টা করছিল। তাদের ধারণা ছিল, ক্রমাগত অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশে পুনরায় সামরিক শাসন নিয়ে আসতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টি মূল্যায়ন করে, নির্বাচন রাজনৈতিক আন্দোলনেরই একটি অংশ। তারা বলতে শুরু করে, বিরোধী

দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে গেলে এরশাদ সরকারকে পরাজিত করা সম্ভব হবে। কমিউনিস্টরা এ ব্যাপারে একটু বেশী উৎসাহই প্রকাশ করে।

কিন্তু বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে গেলে আসন বন্টনের সমস্যাও ছিল। আওয়ামী লীগ ও বি. এন. পি-র মধ্যে কে কয়টা আসনে দাঁড়াবে তা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। এরও সমাধান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ নিয়ে আসেন অন্যভাবে। তিনি প্রস্তাব করে বসেন, শেখ হাসিনা ১৫০টি এবং খালেদা জিয়া ১৫০টি আসনে দাঁড়াবেন। এভাবে শুধুমাত্র ১৫ ও ৭ দল থেকে দু'নেত্রীই নির্বাচনে দাঁড়াবেন এবং সারাদেশের মানুষ এরশাদ বিরোধী ভোটের রায় রাখবেন।

এই রকম একটি অসাধারণ প্রস্তাব রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং সারাদেশেও এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। কেঁপে ওঠে সরকার এবং তড়িঘরি করে একদিনের মধ্যেই অধ্যাদেশ জারী করে ঘোষণা দেয়, একজন ব্যক্তি ৭ টির বেশী আসনে দাঁড়াতে পারবে না। বিরোধী দলের কূটনীতিকে সরকার মোকাবেলা করে অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে। ফলে উপরিউক্ত প্রস্তাবটি নিয়ে আর আগানো সম্ভব হয় নি।

মার্চের শেষ সপ্তাহে (২১ মার্চ) জেনারেল এরশাদ বেতার ও টেলিভিশনে হঠাৎ করে এক ভাষণে বিরোধীদলের কতকগুলি দাবী মেনে নিয়ে ২৪ ঘন্টার সময় দেন নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোকে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে, এরশাদ কার্যতঃ সেদিন ভাষণে বিরোধী দলগুলোকে হুমকি প্রদান করেন নির্বাচনে আসার জন্যে।

২১ মার্চ ১৯৮৬, সারারাত ১৫দল ও ৭দলের সভা হয়। ১৫ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে মত দেয়। ৫ টি দল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং তারা ১৫দল থেকে বেরিয়ে এসে ৫ দলের জন্ম দেয়।

৫ দল, বি. এন. পি. নেত্রী খালেদা জিয়াকে ধরে, যাতে তিনি নির্বাচনে না যান। খালেদা জিয়া প্রকৃতপক্ষে প্রথমে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও মত পরিবর্তন করে ৫ দলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এতে বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক মহলে নতুন অচলাবস্থা ও সংকটের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ১ দিন আগেও এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যেতে অস্বীকার করেছিল। শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, এরশাদের অধীনে যারা নির্বাচনে যাবে, তারা 'জাতীয় বেঈমান' স্বীকৃতি পাবে।

একদিন পর হঠাৎ করে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, বাকশাল ও কমিউনিস্ট পার্টি (যারা পরে ৮ দল নামে অভিহিত হয়) নির্বাচনে যাওয়াতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু নির্বাচনে যাওয়াতে আবার তারা একটি বিষয় প্রমাণ করেন, ঐক্যবদ্ধভাবে সকল দল নির্বাচনে গেলে এরশাদের পরাজয় অবধারিত ছিল। কারণ কেবল ৮ দলের নির্বাচনী জোট সারাদেশে একটির পর একটি আসন যেভাবে জিতে যেতে থাকলো, সমগ্র সামরিক প্রশাসন তাতে হকচকিয়ে যায়।

ফলে বেতার-টেলিভিশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা বন্ধ রাখে। ৭ দিন পর সরকার ঘোষণা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জাতীয় পার্টি জিতে গেছে। এভাবে 'মিডিয়া ক্যু' করে নির্লজ্জের মতো এরশাদ সরকার ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইলেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো যদি সকল বিরোধী দল নিয়ে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারতো, তাহলে হয়তো ১৯৮৬ সালেই এরশাদের সামরিকতন্ত্র উচ্ছেদ হয়ে যেত।

কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র সমাজে বড় ধরণের ক্ষতি সাধিত হয়। ১৫ দলের মতো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও নির্বাচন পন্থী ও নির্বাচন বিরোধী এই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্বাচন বিরোধী নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে তাঁকে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে অনুরোধ করে কিন্তু শেখ হাসিনা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল অনড় থাকেন। সাপ্তাহিক বিচিত্রা তাদের 'বাংলাদেশ বর্ষপত্র ৯১' সংখ্যায় তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'জনগণ শেখ হাসিনাকে মনে করে বিচক্ষণ রাজনীতিক ও কৌশলী নেত্রী হিসেবে'। বাস্তবিক পক্ষে তা হলেও তিনি ১৯৮৬ সালে সফল হন না, এরশাদের নির্লজ্জ বেহায়াপনা, মিথ্যাচার ও মিডিয়া ক্যু-এর কাছে তিনি মার খেয়ে যান।

আর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে চলে আসে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভেদ ও নৈরাজ্য। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে, জাতীয় রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ না ভাঙার আহবান জানায়।

কিন্তু জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃত্বাধীন সংগ্রামী ছাত্র জোট এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ঘোষণা করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নির্বাচনপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কয়েকদিন এ নিয়ে পাল্টাপাল্টি মৃদু সংঘর্ষ হলে অস্ত্রের মুখে নির্বাচনপন্থী ছাত্রলীগ (সুলতান-রহমান) ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।

বিতর্কিত এই জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ৭ মে। কিন্তু তার আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ মার্চ ঘটে যায় এক দুঃখজনক ঘটনা। নির্বাচনপন্থী ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ (সু-র) ও ছাত্র ইউনিয়ন ঠিক করে জোর করে হলেও তারা ক্যাম্পাসে আবার প্রবেশ করবে।

অস্ত্রবাজীর এই ডামাডোলে ছাত্র ইউনিয়ন নিরস্ত্র ও নিরীহ ছাত্রদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বলে পরিচিত হলেও সেদিন মূলতঃ আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ (সু-র)-এর সহায়তায় তারা এই হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে পরবর্তী সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের দলিলে বলা হয়ঃ

'বিশেষতঃ ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক তৎপরতা পরিচালনা করতে পারলে বিরোধী পক্ষের এক তরফা প্রচারণার ফলে সৃষ্ট বিভ্রান্তি কিছুটা দূর করা যাবে এ চিন্তা থেকে এবং নির্বাচনের কাজে নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সভা করে বক্তব্য তুলে ধরা প্রয়োজন এ বিবেচনা থেকে ৩০ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ ও মিছিলের কর্মসূচী নেওয়া হয়।[২৩]

এই ব্যাপারে যে যুক্তিই তুলে ধরা হোক না কেন, একটি ভুল সিদ্ধান্তে একটি অমূল্য প্রাণ সেদিন শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মতাদর্শ বিরোধী বলে সেদিন ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে হামলা ও গুলী চালিয়ে সবচেয়ে বড় অরাজনৈতিক ও সন্ত্রাসী কার্য সম্পন্ন করে। ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের দিক থেকে ছাত্র ইউনিয়ন মিছিল নিয়ে কলাভবনের পশ্চিম পার্শ্বে মহসিন হল ও সূর্যসেন হল থেকে আগত অস্ত্রধারীদের সামনে পড়ে যায়। মাত্র ১০/১২ হাত দূর থেকে ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে হামলা চালানো হয় এবং ঢাকা মহানগরী মীরপুরের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী মাজহারুল হক আসলাম ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশেই এভাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে যায়। ২১ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হেলালউদ্দিন, ছাত্রমৈত্রীর কর্মীর কুড়ালের আঘাতে মাথায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন।

জাতীয় ছাত্রলীগ এই সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নির্বাচনপন্থী বা নির্বাচন বিরোধী কোনো উপদলেই অবস্থান করে নি। কারণ তাদের মিত্র রাজনৈতিক দল বাকশালের সাথে আওয়ামী লীগের আসন বন্টন সুরাহা না হওয়ায় বাকশাল পরে নির্বাচনের পক্ষে থেকেও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। তবে এই সময় থেকে জাতীয় ছাত্রলীগ নির্বাচন বিরোধী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে সম্পর্ক রেখে বিভিন্ন কর্মসূচীতে পৃথকভাবে অংশ নিত এবং বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতো।

৩০ নভেম্বর (১৯৮৬) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি ছাত্র সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে শহীদ মিনারে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের নেতা বেলাল চৌধুরী এতে সভাপতিত্ব করেন।

সভায় ধর্মব্যবসায়ী হিসেবে জামায়াত-শিবিরকে চিহ্নিত করা হয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের অব্যাহত সন্ত্রাসী কার্যকলাপের শাস্তি দাবী করা হয়। আলবদর ও জামায়াত নেতা গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিস্কার করার দাবীও এতে জানানো হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট পরিষদ এক বিবৃতিতে শিবিরের হামলাকে বর্বরোচিত বলে আখ্যায়িত করা হয়।
এই সময় জাতীয় ছাত্রলীগ নেতা রাউফুন বসুনিয়া হত্যা মামলা তুলে নিয়ে খুনীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ৩০ নবেম্বর (১৯৮৬) শহীদ রাউফুন বসুনিয়া হত্যা মামলা সরকারীভাবে প্রত্যাহারের প্রতিবাদে জাতীয় ছাত্রলীগের ডাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত ছাত্রসভায় বক্তৃতা করেন জাতীয় ছাত্রলীগের সভাপতি নুরুল ফজল বুলবুল ও সাধারণ সম্পাদক ইনায়েতুর রহিম। জাতীয় ছাত্রলীগের এই ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (৮ দল সমর্থক) , সংগ্রামী ছাত্রজোট, ছাত্রলীগ (শি-মু) ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধ

৩০ নভেম্বর (১৯৮৬) রাষ্ট্রপতি এরশাদ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক সভায় শিক্ষাঙ্গন থেকে রাজনীতি চিরতরে উচ্ছেদ করার আহবান জানান। এই সময় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ আলী রেজা প্রমুখ শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, এই সমস্ত শিক্ষকনামীরা এরশাদ শিক্ষক না হলেও শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি মনোনীত করে।
পয়লা ডিসেম্বর (১৯৮৬) সরকার সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সমাবেশ ও সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রাজনীতিমুখর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার কথাও ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (নির্বাচন বিরোধী) এক বিবৃতিতে অবিলম্বে ছাত্রদের সভা-সমাবেশের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানায়। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, কোনো স্বৈরাচারী কালাকানুন জারী করে ছাত্রসমাজকে শৃঙ্খলিত করা যাবে না। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (নির্বাচন পন্থী) অপর এক বিবৃতিতে বলে, এ

ঘোষণা ছাত্ররাজনীতি বন্ধের সরকারী চক্রান্তেরই অংশ। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সু-র)-এর সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান বলেন, এই কুখ্যাত ঘোষণা ছাত্র সমাজ মেনে নেবে না। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি মোস্তফা ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ কবির যে কোনো মূল্যে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার চক্রান্ত প্রতিহত করার আহবান জানায়।

৪ ডিসেম্বর (১৯৮৬) জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ সংক্রান্ত আমার ঘোষণা মানুষের মনে তোলপাড় করেছে। তিনি বলেন, ছাত্ররা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করুক তা আমি চাইনা। কিন্তু নিজের দলের ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজ সম্পর্কে বলেন, এটি কোনোদিনই জাতীয় পার্টির লেজুড় অঙ্গসংগঠন নয়, সহযোগী সংগঠন। বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্পর্কে এরশাদ বলেন, কোনো শক্তিশালী বিরোধী দল দেশে নেই। খবরের কাগজে শুধু তাদের বিবৃতি রয়েছে।

ডাকসুর নেতা আকতারুজ্জামান এই সময় সংবাদপত্রে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ছাত্ররা লেজুড় নয়, মাথা। তিনি অভিযোগ করেন, ক্ষমতায় থাকার জন্যে বর্তমান সরকার সাড়ে চার বছরে ১৬মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রেখেছে, ছাত্ররা তাহলে রাজনীতি করবে না কেন?

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আনোয়ারুল হক একই সংবাদপত্রে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সরকার চায় শিক্ষা ও ছাত্রমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আর ছাত্ররা চায় অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি অভিযোগ করেন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বইয়ের বদলে অস্ত্র পাঠাচ্ছেন এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুইভাবেই মদত দিচ্ছে। তিনি বলেন, ছাত্ররা লেজুড়বৃত্তি করে না, শিক্ষার দাবীর পাশাপাশি জাতির আশা-আকাঙক্ষার প্রশ্নে ছাত্ররা যে ভূমিকা রাখে তা অনেক সময় দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় মাত্র।

সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সামাজ (নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ-এর নাম পাল্টিয়ে নতুন করে জাতীয় ছাত্র সমাজ রাখা হয়)-এর আহবায়ক রফিকুল হক হাফিজ, জেনারেল এরশাদের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, জেনারেল এরশাদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলেননি। ছাত্ররা অবশ্যই রাজনীতি করবে। তবে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করবে না। এক প্রশ্নের উত্তরে খবর প্রতিনিধিকে হাফিজ বলেন, সন্ত্রাসের পথ আমি বেছে নিলে বিরোধী সংগঠনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচরণ করতে পারতো না।[২৪]

৬ জানুয়ারী (১৯৮৭) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সমাবেশ নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (নির্বাচন বিরোধী) অংশ ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে এবং শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (নির্বাচন পন্থী) সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন চত্বরে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র জমায়েত এবং জমায়েতের পর শিক্ষাভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি প্রদান করে। সংগ্রামী ছাত্র জোটও অনুরূপ কর্মসূচী হিসেবে কলাভবনে জমায়েত ও বিক্ষোভ শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে। প্রতিটি জোট ও সংগ্রাম পরিষদ জেলা এবং উপজেলাতে ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

১০ জানুয়ারী (১৯৮৭) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সাথে এক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী মাহাবুবুর রহমান এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী গোলাম সারোয়ার মিলন এক মত প্রকাশ করেন যে, আইন করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা আত্মঘাতী হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, গত কয়েক বছর ধরে শহর থেকে ছাত্রদের মফস্বলে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে। আগে ছিল মফস্বল থেকে ছাত্ররা শহরে পরীক্ষা দিতে আসছে। পরীক্ষায় নকলের অবাধ সুযোগ পাওয়ার আশাতেই শহর থেকে গ্রামে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

ছাত্ররা এই সময় রাষ্টপতি এরশাদের কাছে অত্যন্ত মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ২৪ জানুয়ারী তিনি জাতীয় সংসদে ভাষণ দিতে যান। সেখানে তিনি অস্থির চিত্তে বলতে থাকেন, ছাত্র সমাজকে আমরা কোন রাজনীতিতে দীক্ষা নিতে বলবো? এরশাদ নিজে বরাবর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রাখছিলেন, আবার তিনিই সেদিন বলেন, দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরে ১৫০ দিনের মধ্যে ১২০ দিনই ক্লাশ হয় নি। একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রম ৮ বছর পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। এরশাদ আরো বলেন, দেশের রাজনীতিবিদরা চান ছাত্ররা রাজনীতি করুক কিন্তু ছাত্রদের লেখাপড়া করা উচিৎ একথা তাঁদের মুখে শুনি না।

১৫ ফেব্রুয়ারী একটি নাটক সাজিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতে সাহায্য করেন এক সময়ের বামপন্থী বলে কথিত ছাত্রনেতা এবং মন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ। তিনি নিজ এলাকা কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম কলেজের কয়েকজন ছাত্র পাঠিয়ে দেন রাষ্টপতি এরশাদের কাছে। এই গুটি কয়েক ছাত্র গত ১৭ নভেম্বর (১৯৮৬) চৌদ্দগ্রাম কলেজ জাতীয়করণ করার দাবীতে সেখানে যে হরতাল হয় তার জন্যে ক্ষমা চায় এবং

ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না বলে শপথ করে বলে সরকারী সংবাদ সংস্থা বাসসের খবরে বলা হয়। হরতাল ঘটনার পর সরকার কলেজটির মঞ্জুরী সাময়িকভাবে বাতিল করে এবং কলেজটিও বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

একটি আন্দোলন করার তথাকথিত অপরাধে স্বয়ং রাষ্টপতি গুটি কয়েক ছাত্রদের ডেকে ক্ষমা চাইতে বলা এবং এই সাজানো নাটক ফলাও করে বেতার-টেলিভিশনে প্রচার করায় রাজনৈতিক দল বিস্মিত হয়। একে ছেলেমী ও অপরিণামদর্শী বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেন।

একটি কলেজ জাতীয়করণ করার দাবীতে ছাত্ররা হরতাল করে থাকলে ছাত্ররা অন্যায় কিছু করেনি, বরং তাদের শিক্ষা ও ভবিষ্যতের কথাই দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছে মাত্র। কিন্তু জেনারেল এরশাদ এই ক্ষুদ্র বিষয়টিও সহ্য করতে রাজী ছিলেন না, ছাত্রদের ডেকে ক্ষমা চাওয়ায়ে বাহবা কুড়াতে চেয়েছিলেন।

ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনের মামলা পুনরুজ্জীবন

১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনে যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছিল তা আবার পুনরুজ্জীবিত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ১৯৮২ সালের ১৩ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল থেকে মিছিল বের করা, সরকার ও সামরিক শাসন বিরোধী, শ্লোগান দেয়া, সাধারণ ছাত্রদের ক্লাস থেকে বিরত রাখা, কলাভবন প্রাঙ্গনে সমাবেশ করে সরকার বিরোধী উস্কানী দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। এ ছাড়া, ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী এবং ২৮ নভেম্বর ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছিল তাও পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ সরকার থেকে নেওয়া হয়।

২৮ ডিসেম্বর (১৯৮৬) ঢাকার প্রধান মহানগর হাকিম ১৬ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া ও তাদের মালামাল ক্রোকের আদেশ প্রদান করেন। এই সব ছাত্রনেতা হচ্ছেন, ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি আখতারুজ্জামান, জাতীয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, সংসদ সদস্য ফজলুর রহমান, রাকসুর সাবেক সহসভাপতি ফজলে হোসেন বাদশা, ইউকসুর সাবেক সহসভাপতি খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক, ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক, ছাত্রলীগ নেতা বাহালুল মজনুন চুন্নু, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, খ.ম. জাহাঙ্গীর, মুকুল বোস, মনিরউদ্দিন আহমদ, আবুল হাসিব খান, আবুল কালাম আজাদ, রফিকুল আলম রানা, খলিলুর রহমান মোহন, নিরঞ্জন সরকার ও ইকবাল হোসেন।

রমনা থানার সাব ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আলফু মিয়া মজুমদার এবং সাব ইন্সপেক্টর আবদুল লতিফ সামরিক বিধির ১৪, ১৫, ১৭ ধারায় নিম্নোক্ত অভিযোগ দায়ের করেন:

'১৯৮২ সালের ২১ নভেম্বর উল্লিখিত ছাত্র নেতাদের নেতৃত্বে হাজার খানেক অজ্ঞাত পরিচয় ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গনে জামায়েত হয় এবং সামরিক আইন ও সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে শ্লোগানসহ ক্যাম্পাসে মিছিল করে। বেলা সাড়ে ১০টার দিকে মধুর কেন্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মজিদ খানের শিক্ষানীতির সমালোচনা করে ছাত্রনেতা খন্দকার ফারুক, ফজলে হোসেন বাদশা ও মনিরুদ্দিন আহমেদ বক্তৃতা করেন। ছাত্র নেতা ফজলুর রহমান সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছাত্রনেতাদের পরিচয় করিয়ে দেন। মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সাংবাদিক সম্মেলনে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান। ওই সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই ১৯৮২ সালের ২৯ নভেম্বর দেশব্যাপী সভা-সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'দাবী দিবস' পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে ছাপানো প্রচারপত্রও বিলি করা হয়।'

কিন্তু একই দিন সাবেক ছাত্রনেতা ও বর্তমান সরকারের উপমন্ত্রী জিয়াউদ্দীন আহমেদ বাবলুর বিরুদ্ধে সরকার দায়েরকৃত পূর্বের একটি মামলা প্রত্যাহার করে নেয়।[২৫]

এতে সরকারের উদ্দেশ্যময়তা ধরা পড়ে এবং ছাত্র আন্দোলনে নতুন চাঞ্চল্য নিয়ে আসে। কারণ সরকার ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে তখনই এই মামলাগুলি নতুন করে রজ্জু করেন, যখন ছাত্র সংগঠনগুলি পরস্পর শুধু কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়িতে ব্যস্ত নয়, সশস্ত্র সংঘর্ষেও জড়িত, দ্বিধা বিভক্ত এবং হতাশায় নিমজ্জিত। সরকার ছাত্র রাজনীতির এই হতাশার সুযোগ গ্রহণ করতে চায়।

১৯৮৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারীতে এমন আরেকটি মামলা রাজনৈতিক কারণে তুলে নেওয়া হয়। এতে জিয়াউদ্দীন বাবলু, গোলাম সরোয়ার মিলন, আবুল কাসেম চৌধুরী, জালাল আহমেদ, ফরিদুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম প্রমুখ আসামী ছিলেন। বাবলু ছাড়া অন্য সবাই ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য এবং এরা প্রায় সকলেই তখন সরকারী দলে যোগদান করলে সামরিক আদালতের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবীর নানক, বাহালুল মজনুন চুন্নু, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন, খ.ম জাহাঙ্গীর এবং জাসদপন্থী ছাত্রলীগ নেতা মনিরউদ্দিন আহমেদ প্রমুখও এই মামলার আসামী ছিলেন।

১৯৮৬: অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থমন্ত্রণলয়ের এই সময়ের এক জরীপে দেখা যায়, গত সাড়ে ষোল বছরে ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের নাগরিক জীবন যাত্রার ব্যয় গড়ে ১১.৩৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জরীপে ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত গত সাড়ে ষোল বছরে বৃদ্ধির নিম্নোক্ত চিত্র ভেসে ওঠেঃ[২৬]

খাদ্য সামগ্রীর দাম:	১১৮১.৬৮% বৃদ্ধি
বিদ্যুত ও জ্বালানীর দাম:	১২৬৫.৮০% বৃদ্ধি
আবাসিক ও গৃহস্থালী জিনিসের দাম:	১৪১৭.৪৫% বৃদ্ধি
পরিধেয় ও পাদুকার দাম:	১০২৩.৮০% বৃদ্ধি

মধ্য ও নিম্নমধ্য বিত্ত জীবন এই সময় চরম হতাশা ও সংকটাপন্ন অবস্থায় কাটাতে থাকে। এরশাদ সরকারে একটি 'মাফিয়া গোষ্ঠী'র আগমন ঘটে এবং অর্থনীতিতে লুটপাট চলতে থাকে। কোটি টাকার সরকারী সম্পত্তি পানি দরে বিক্রি অব্যহত থাকে।

জরীপে এক বছর আগের ও পরের নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান চিত্র তুলে ধরা হয়ঃ

দ্রব্যের নাম	মূল্য	
	১৯৮৫ (ডিসেম্বর)	১৯৮৬ (ডিসেম্বর)
মোটা চাউল	৭.৯৮ টাকা	৮.৭৫ টাকা
গম	৬.৮০ টাকা	৭.৩৪ টাকা
মসুর ডাল	৮.৮৭ টাকা	২০.৮৩ টাকা
গরুর মাংস	৩৯.১৫ টাকা	৪১.৭০ টাকা
খাসির মাংস	৫৮.২৫ টাকা	৬২.৫২ টাকা
মুরগীর ডিম (হালি)	৭.৯০ টাকা	৮.৫৫ টাকা
সরিষার তৈল (সের)	৩৫.৭৫ টাকা	৪২.৮৭ টাকা
মরিচ (সের)	১৭.২১ টাকা	৩১.৮০ টাকা
রসুন (সের)	২৬.১১ টাকা	৫০.৫৫ টাকা
গজারি কাঠ (মন)	৭১.২৩ টাকা	৭৬.২০ টাকা
কাঁচা সাবান (সের)	১৭.৭৭ টাকা	১৯. ১০টাকা

১৯৮৭ সালের শুরুর লগ্নে দেখা যায়, জনজীবনে হতাশা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে, জীবন যাত্রার মান আরো নিম্নমুখী পর্যায়ে অবস্থান করছে।

কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরে দ্রব্যমূল্য বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছেঃ

দ্রব্যের নাম	মূল্য বৃদ্ধির শতাংশ
চাউল	১০%থেকে ৩৭.৫%
রসুন	১২৬.৬৭%
কাঁচা তরকারী	৩৫%থেকে ৭৫%
বাড়ী ভাড়া	১০%থেকে ১৫%
ওয়াসার পানির মূল্য	২৫.৩%
গ্যাস	১০%

কবির লড়াই

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ জমে ওঠে 'কবির লড়াই'। সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে এতবড় রাজনৈতিক কবির লড়াই সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটে নি। ঢাকায় অনুষ্ঠেয় প্রথম এশীয় কবিতা উৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কবিরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ কবিতা কেন্দ্র ৩১ জানুয়ারী থেকে ২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী এশীয় কবিতা উৎসবের আয়োজন করে। এর মূল নেতা সৈয়দ আলী আহসান এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক কবি-জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। সরকার সমর্থক কবি এবং বিভিন্ন সরকারী অফিসে কর্মরত কবিরা এশীয় কবিতা উৎসবে যোগদান করেন। এশীয় কবিতা উৎসবের শ্লোগান করা হয়, 'শান্তি ও সমঝোতার বাহন কবিতা'। ১১টি দেশের কবি এতে যোগদান করেন।

'শৃঙ্খল মুক্তির জন্যে কবিতা' এই বাণীকে সামনে রেখে পাল্টা জাতীয় কবিতা উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশের সরকার বিরোধী কবিকূল। কবি শামসুর রাহমান তাদের মূল শিরোমণি হিসেবে স্থান পান। পয়লা ফেব্রুয়ারী কবি সুফিয়া কামাল দুইদিন ব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তরুণ ও প্রবীণ কবিরা এই উৎসবে যোগদান করেন।

পাস কোর্স ছাত্র আন্দোলন

১০ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) পাস কোর্স ছাত্র আন্দোলন তাদের ৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে সংগ্রামকে আরো জোরদার করে। এদিন পাসকোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ ও বঙ্গভবনে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচী নেয়।

১৯ জানুয়ারী ডাকসু ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে পাসকোর্স ছাত্র আন্দোলনের নেতা আবেদ রাজা ও মনজ্জিল মোরশেদ বক্তব্য রাখেন।

ছাত্ররা তাদের স্মারকলিপিতে বলে, 'অনার্স ও পাসকোর্স পদ্ধতি চালু থাকার কারণে উচ্চশিক্ষার প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে পাসকোর্স পড়তে হচ্ছে। কিন্তু সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির কারণে আসন স্বল্পতার অজুহাতে ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী প্রিলিমিনারীতে ভর্তি হতে পারছে না এবং অন্যদিকে চাকুরীর সকল ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।'

১৯৮৬-৮৭: *শিক্ষাচিত্র*

ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) জাতীয় সংসদের নথিপত্রে জানানো হয়, ১৯৮০-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ৬ বছরের মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র বৃদ্ধির হার শতকরা ২৪ ভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রবৃদ্ধির হার শতকরা ২৩.২৫ ভাগ।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার ৬ শত ৬৬টি। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৩৭ হাজার ২শত ২৬টি। এই সময় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৮শত ৮১টি, বলে জাতীয় সংসদের দলিলে উল্লেখ করা হয়।

১৭ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর নথিতে জানানো হয়,বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ৬১ লাখ ৮০ হাজার। এর মধ্যে শিক্ষিত বেকার হচ্ছে ৩ লাখ ৩০ হাজার। ১৯৮৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই তথ্য সরবরাহ করা হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর বুলেটিনে জানানো হয়, ক্যাডেট কলেজে একজন ছাত্রের পেছনে সরকারী তাহবিল থেকে প্রতিমাসে ব্যয় হয় ১,৭৯২ টাকা। ১৯৮১ থেকে ৮৬ পর্যন্ত ছয় বছরে দেশের দশটি ক্যাডেট কলেজের জন্যে উন্নয়ন খাতে ৭ কোটি ৮৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা এবং রাজস্ব খাতে ২১ কোটি ৫৩ লাখ ৫২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

২৫ জুন জাতীয় সংসদের একই দলিলে বলা হয়, ১৯৮৭ সালের বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে বলে জানানো হয়ঃ

বিদ্যালয়	ছাত্র সংখ্যা
প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ	৯১ , ১৫৫৫৪ জন
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ	৩, ১৪৫৩৩ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ	২৩, ৪৫১৬৬ জন
মোট	১ , ১৭৭৫২৫৩ জন

এর মধ্যে ছাত্র ৭২ লাখ ৬৯ হাজার ২৭৩ জন এবং ছাত্রী ৪৫ লাখ ৫ হাজার ৯৮০ জন।

এতে শিক্ষক পরিসংখ্যানও উল্লেখ করা হয়ঃ

বিদ্যালয়	শিক্ষক সংখ্যা
প্রাথমিকঃ	১ , ৯০, ৫৫৭ জন
নিম্ন মাধ্যমিকঃ	১৬, ৮১৬ জন
মাধ্যমিকঃ	৮৫, ৪৯৫ জন
মোটঃ	২, ৯২, ৮৬৮ জন

এর মধ্যে ২ লাখ ৬৭ হাজার ৩৩ জন শিক্ষক এবং ২৫ হাজার ৫৩০ জন শিক্ষিকা রয়েছেন।

সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিদ্যালয়ের যে সংখ্যাচিত্র তুলে ধরা হয় নিম্নরূপঃ

বিদ্যালয়	সরকারী	বেসরকারী
প্রাথমিক	৩৭, ৪২১ টি	৬, ৮০৩ টি
নিম্ন মাধ্যমিক	×	২, ৫৮৮ টি
মাধ্যমিক	২২৩ টি	৭, ০৪৬ টি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ৪৪ হাজার ২২৪টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২, ৫৮৮টি এবং ৭, ১৬৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বর্তমানে দেশে রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।[২৭]

তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ: পত্রিকা নিষিদ্ধ করার কৃতিত্ব

এরশাদ সরকারের তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ যিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন, তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) জাতীয় সংসদে বলেন, সাপ্তাহিক 'যায় যায় দিন' সাপ্তাহিক 'একতা' সহ মোট আঠারটি পত্রিকাকে তিনি এই পর্যন্ত নিষিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন।

তিনি বলেন, 'যায় যায় দিন' পত্রিকাটি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎসা ও বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদী আরবের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং জাতীয় সংসদের মহিলা সদস্যদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের অপপ্রয়াস চালায়।

তিনি বলেন, সাপ্তাহিক একতা ও ইত্তেহাদ নিষিদ্ধ করা হয় আপত্তিকর কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ায়।[২৮]

সিলেট মাদ্রাসার ছাত্রদের স্কুল বলিকাদের উপর হামলা

৯ ফেব্রুয়ারী সিলেটে ঘটে যায় এক অপ্রীতিকর ঘটনা, স্থানীয় সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে সদর উপজেলা পরিষদ আয়োজিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট ছোট বালিকারাও এতে অংশ নেয়। কিন্তু মাদ্রাসার একদল অপরিপক্ক ছাত্র বালিকাদের দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা কান্ডজ্ঞানহীনভাবে বালিকাদের আক্রমণ করে বসে।

মেয়েরা ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে চারদিকে ছুটে পালায়। মাদ্রাসার ছাত্ররা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে উত্তোলিত জাতীয় পতাকা নামিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এই খবর শহরে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে এবং ইসলামের তথাকথিত ধ্বজাধারীদের অনৈসলামিক কার্যকলাপে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দু'দলে তিনঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয় এবং ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

সিলেট জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মাদ্রাসার ছাত্রদের ধর্মের নামে অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় পতাকা পোড়ানোর প্রতিবাদে ১০ ফেব্রুয়ারী সিলেট জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দেয়।

শহীদ মিনারে জাতীয় নেতাদের ছবি: ১৭ ছাত্র সংগঠনের বিবৃতি

১৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এক অসাধারণ বিবৃতি ছাপা হয়। ১৭টি ছাত্র সংগঠন একুশে উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পবিত্রতা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার স্বার্থে মিনারের স্তম্ভগুলোতে কোনো নেতার ছবি বা দলের ব্যানার না টানানোর আহবান জানিয়ে এ বিবৃতি দেয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত কয়েক বছর ধরে শহীদ মিনারে প্রয়াত শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি টানানোকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা ও ব্যাপক গোলাযোগের সৃষ্টি হচ্ছে। গত বছর একটি অমূল্য প্রাণ ঝড়ে গেছে। ব্যাপক বোমাবাজিতে শহীদ মিনার কলঙ্কিত হয়েছে। প্রয়াত নেতৃবৃন্দের ছবিগুলোর প্রতি চরম অবমাননা দেখানো হয়েছে। এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহবান জানিয়ে বিবৃতিতে শহীদ মিনারের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষার্থে শিক্ষকবৃন্দের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করে, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সুলতান রহমান), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মুশতাক-নাজমুল), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় ছাত্র ঐক্য, জাতীয় ছাত্রলীগ, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রলীগ (শা-সা), বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, ছাত্রলীগ (জালাল-লুৎফর), সমাজবাদী ছাত্র জোট, ছাত্রলীগ (আজিজ-মীরাজ), জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ।

বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ

সরকার এই সময় বাস মালিকদের সাথে যোগসাজস করে একতরফাভবে বিভিন্ন সড়কে বাসভাড়া বৃদ্ধি করে দেয়। জনজীবনে এমনিতেই সংকট চলছিল। বাসভাড়া বৃদ্ধিকে ছাত্র-জনতা 'গোদের উপর বিষফোড়া' বলে চিহ্নিত করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দুই অংশ এবং সংগ্রামী ছাত্র জোট ২ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) সারাদেশে বাসভাড়া বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ-সমাবেশের ডাক দেয়।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (নির্বাচনপন্থী) অংশ সমাবেশের আয়োজন করে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর

রহমান বাবুল সেখানে বক্তব্য রাখেন। পরে একটি মিছিল ফুলবাড়িয়া, গুলিস্তান হয়ে প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ছাত্রলীগ (সুলতান–রহমান)এর সহসভাপতি সগীর আনোয়ার বক্তৃতা করেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (নির্বাচন বিরোধী) অংশ কলাভবন প্রাঙ্গনে সমাবেশ করে। বাসদছাত্রলীগের নেতা আখতারুজ্জামান ও জাসদছাত্রলীগ নেতা নাজমুল হক প্রধান এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন। পরে প্রেসক্লাব–পল্টন– মতিঝিল হয়ে মিছিল এলিফ্যান্ট রোডে ফেরৎ আসে। এই সময় বিভিন্ন যায়গায় ছাত্রনেতারা থেমে থেমে পথসভা করেন।

সংগ্রামী ছাত্রজোট শাহবাগ–কাটাবন এলাকায় একটি মিছিল বের করে বাসভাড়ার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। পরে মধুর কেন্টিনে এক সমাবেশে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি জালাল আহমেদ বক্তৃতা করেন। জাতীয় ছাত্রলীগও এদিন মিছিল ও সমাবেশ করে। নূরুল ফজল বুলবুল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকায় ছাত্ররা পথে পথে সমাবেশ মিছিল করার সময় বিভিন্ন যায়গায় গাড়ী থামিয়ে যাত্রীদের বর্ধিত ভাড়া না দেওয়ার জন্যে উদ্দীপ্ত করে।

কোনো কোনো যায়গায় এই নিয়ে বড় ধরণের সংঘর্ষ বেধে যায়। মীরপুর, আসাদ গেট, জয়কালী মন্দির, শাহবাগ মোড় প্রভৃতি স্থানে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ ঘটে। মহানগরীর রুটে মোট ৩টি মিনিবাস ও বাসে অগ্নিসংযোগ করে এবং ২০টি মিনিবাস ও বাসের ক্ষতি সাধন করে।

মীরপুরে বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা আবু হোসেন তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনায় স্থানীয় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সমাবেশ অনুষ্ঠান করে।

নারায়ণগঞ্জেও এদিন, আদমজী–ঢাকা রুটে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তোলারাম কলেজের ছাত্ররা পথে পথে গাড়ী থামিয়ে যাত্রীদের বর্ধিত বাসভাড়া না দেওয়ার জন্যে আহবান জানায়।

টাঙ্গাইলে পরিবহন শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ৮ ফেব্রুয়ারী এখানে বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে গণঐক্য পরিষদ হরতালের ডাক দেয়। হরতাল চলাকালে ছাত্রদের সমাবেশের উপর পুলিশ হামলা চালায়। এতে সংঘর্ষ বেধে গেলে পুলিশ খুব কাছে থেকেই গুলী করে। এতে কালিহাতি উপজেলার শামসুল হক কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র আবু রায়হান জগলুল ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে প্রকাশ, নিহত জগলুল গুলী খেয়ে পড়ে গেলে একজন ছাত্রনেতা তাকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকেও গুলী করে। পরে পুলিশ টেনে হিচঁড়ে মৃতদেহ গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায়।

গুলীবর্ষণের পর উত্তেজিত জনতা স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গিয়ে হামলা চালায় এবং ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ছাত্ররা বাসষ্ট্যান্ডের ট্রাফিক আইল্যান্ডও জ্বালিয়ে দেয়।

শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয় এবং ১৫ জন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে গ্রেফতারকৃত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা আমিনুল ইসলাম ঝুনুসহ সকলকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) থেকে ঢাকায় ৩ দিনের অবিরাম সড়ক অবরোধ কর্মসূচী পালন শুরু হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও জোট বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশ ছাত্রনেতা নাজমুল হক প্রধান, সাইফুল ইসলাম, মমতাজউদ্দীনকে গ্রেফতার করে।

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের অবরোধ কর্মসূচী চলাকালে পুলিশ ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসেও হামলা চালায় এবং ছাত্রলীগ নেতা মোহাম্মদ আলীসহ ৭ জন ঢাকা কলেজ ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে।

১০ ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইলে স্থানীয় বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল মাঠে জগলুল হত্যার প্রতিবাদে শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সানাউল হক, এডিএম আবুল হাশেম এবং ম্যাজিষ্ট্রেট মজিবুর রহমানের বরখাস্ত দাবী করা হয়। টাঙ্গাইলে ছাত্র হত্যা এবং বাসভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে ১৬ ফেব্রুয়ারী দুই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, সংগ্রামী ছাত্র জোট, ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগ দেশ ব্যাপী হরতাল পালন করে।

ছাত্ররা যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ঘেরাও ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বায়তুল মোকাররমে টাঙ্গাইলের ছাত্রনেতা জগলুলের গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসবাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাতে গেলে সরকার সমর্থক ছাত্ররা মিছিলে হামলা চালায়। বাংলাদেশে ছাত্র ফেডারেশনের নেতা ম. হ. শ নবী সহ বেশ কয়েকজন এতে আহত হন।

৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) পুলিশ হটাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলে গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে অস্ত্রের খোঁজে তল্লাশি চালায়। পুলিশ অভিযোগ করে, এই সময় ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্পার্শ্ব এলাকায় ছিনতাই, চাঁদা আদায়সহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

তল্লাশি অভিযানকালে পুলিশ কয়েকটি কক্ষ থেকে গুলী ভর্তি পিস্তল, ৪টি রামদা, হাতবোমা উদ্ধার করে।

এই সময় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা মাহাবুবুল হক বাবলু, সানাউল হক নীরু, ফেরদৌস আহমেদ খোকন, আবদুল মালেক, মাহবুব এলাহী, ইবাদুল হক, আবুল ফজল, সহিদুল আলম শিমুল, সৈয়দ মেহেদী হাসান, মোহাম্মদ মেহেদী, মোশারফ হোসেন ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল করে এবং উপাচার্য আবদুল মান্নানের বাসভবনে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। ছাত্রদল কর্মীরা এতোই উত্তেজিত ছিল যে, তারা পরদিন অনুষ্ঠিতব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে নির্মীয়মান প্যান্ডেলেও আগুন লাগিয়ে দেয়। ছাত্রদল কর্মীরা কয়েকজন শিক্ষককেও নাজেহাল করে।
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ছাত্রদল কর্তৃক এভাবে শিক্ষক নাজেহালের ঘটনা ও স্বায়ত্ত্বশাসন লঙ্গন করে পুলিশী অভিযানের নিন্দা করে।

১২ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) জাতীয় সংসদে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের হানাহানি বন্ধ করার একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এডভোকেট আসাদুজ্জামান এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো বেসরকারী সদস্যের প্রস্তাব সরকারী ও বেসরকারী উভয় সদস্যরা মিলে পাস করেন।

প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের হাতে সরকারই নিয়মিত অস্ত্র সরবরাহ করে থাকেন। তিনি একজন সরকার দলীয় সংসদ সদস্যের প্রতি নির্দেশ করে বলেন, দু'খুনের আসামী হয়েও এ সংসদে বসে আছেন, তাঁর বিচার হয় না কেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবাঞ্ছিত বন্ধ থাকার খতিয়ান

এই সময় ঘন ঘন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ছাত্র অভিভাবক মহলে তাদের ভবিষ্যত চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এক বীভৎস অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাবে, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবাঞ্ছিত কারণে মোট ৩৪৮ দিন বন্ধ ছিল

শিক্ষাবর্ষ সময়কাল	বন্ধ থাকার মোট দিন	বন্ধ থাকার কারণ
১৯৮২–৮৩	৯৪ দিন	সরকারী হস্তক্ষেপ
১৯৮৩–৮৪	৩৩ দিন	সরকারী হস্তক্ষেপ
১৯৮৪–৮৫	১১ দিন	ছাত্র ও রাজনৈতিক দলের ধর্মঘট–হরতাল
	১২২ দিন	সরকারী হস্তক্ষেপ
	১১ দিন	হরতাল
১৯৮৫–৮৬	২২ দিন	বসুনিয়া হত্যাকান্ডের পর সরকারী হস্তক্ষেপ
	১৫ দিন	জগন্নাথ হল দুর্ঘটনা
১৯৮৬–৮৭	৫৫ দিন	শিক্ষক ধর্মঘট

৩৬৮ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অবাঞ্ছিত বন্ধ চলে তার ২৭১ দিনই সরকারী হস্তক্ষেপের কারণে–অকারণে নিজেদের খেয়াল–খুশী মতো ক্লাশ বন্ধ করে রাখা হয়। ছাত্র ধর্মঘট ও রাজনৈতিক দলের হরতালের জন্যে বন্ধের দিন সংখ্যা সর্বমোট ৬২।

১৯৮৪–৮৫ সালে সবচেয়ে বেশী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রাখা হয়। দিন সংখ্যা ১৩৩ এবং এর ১২২ দিনই সরকার জোর করে বন্ধ করে রাখে।

ছাত্রদলে আরেক দফা ভাঙন

২১ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আরেকদফা ভাঙন ও সংকটে নিবদ্ধ হয়। এদিন সংগঠনের সভাপতি জালাল আহমেদ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে পদত্যাগ করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন,

'বি. এন. পি–র রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ছাত্রদল গড়ার প্রচেষ্টা মরহুম জিয়ার আমলে কিছুটা সফল হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বিএনপি নেতৃবৃন্দ ছাত্রদলকে পরিপূর্ণভাবে তাদের 'অক্টোপাস বন্ধনে' বন্দী করে ফেলে। সাধারণ জনগণের ধিক্কার কুড়িয়ে ও সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীদের কাছে ভয়ের প াত্র হয়ে আমি একগুচ্ছ

পরগাছার নেতা হতে রাজী নই। লেজুড়বৃত্তির কারণে ছাত্রদের সকল আন্দোলন ও সংগ্রামের রাজনীতির ব্যর্থ হয়েছে এবং শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানার্জনের বদলে সন্ত্রাসের অবাধ চর্চা চলছে।'

ছাত্রদলের সভাপতি জালাল আহমদের এই বিবৃতির প্রতিবাদ করে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু একটি পাল্টা বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেকে আত্মগোপন করার প্রয়াস যদি পরগাছার চরিত্র না হয়, তাহলে পরগাছার সূত্র কি আমরা বুঝি নয়া'।

জালাল আহমেদের বিপ্লবী বিবৃতির আসল রহস্য এর দু'একদিন পরই বের হয়। তিনি আসলে সরকারের চাকুরী নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসে তৃতীয় সচিবের একটি সামান্য চাকুরী নিয়ে দেশত্যাগ করেন।

আসাদুজ্জামান রিপন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন।

২ মার্চ (১৯৮৭) জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সংকট উত্তরণে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বর্ধিত সভা ডাকা হয়। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন এতে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এদিন জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া বলেন, জালাল চলে গেছে, তার আগে আরো কয়েকজন ছাত্রদল ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু ছাত্রদলের কোনো ক্ষতি হয়নি। কিছু কিছু দালাল ও বেঈমান দলে থাকে কিন্তু তাদের দিয়ে দলকে বিচার করা যায় না।

বি.এ.পি-র ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিএনপি-র ভবিষ্য নেতৃত্ব তৈরীর কারখানা।

ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শামসুজ্জামান দুদু সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, ছাত্রদলের গত সম্মেলনের সময় আমি নতুন কমিটির সভাপতি প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু আমাকে একটি কক্ষে আটক রেখে অস্ত্রের ভয় দেখানো হয়েছিল।

বর্ধিত সভায় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল হক বাবলু তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেন। অন্যান্যর মধ্যে বি. এন. পি-র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মজিবুর রহমান ও ছাত্রদল নেতা অভি আহমেদ বক্তৃতা করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য বিরোধী আন্দোলন

৪ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং বর্তমান উপাচার্য মোহাম্মদ আলীর পদত্যাগের দাবীতে সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের ডাকে সমগ্র বন্দর নগরীতে সারাদিন হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালীন সময় বেলা ১১টায় নিউমার্কেট চত্বরে ফখরুদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভায় বক্তারা ৪ দফা দাবী উথাপন করে।

গত ২ মার্চ স্থানীয় শহীদ মিনারে ছাত্রনেতা রেদোয়ান হোসেনের সভাপাতিত্বে প্রথমে পূর্ণ দিবস, পরে অর্ধ দিবস হরতালের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু জনসাধারণ দ্বিতীয় ঘোষণা অবগত না হওয়ায় পুরো দিনই চট্টগ্রামে হরতাল পালিত হয়।

সংগ্রামী ছাত্র জোট, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (নির্বাচন বিরোধী), জাতীয় ছাত্রলীগ, ইসলামী ছাত্র শিবির ৪ মার্চ বর্ধিত বাসভাড়া বাতিল, তত্ত্বাবাধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে সারাদেশে হরতালের ডাক দেয়। বি. এন.পি, পাচঁদল এই হরতালের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দেয়।

ছাত্রদল নেতা বাবলু নিহত

৯ মার্চ (১৯৮৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসিন হলের ৪২৬ নম্বর কক্ষে এক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বোমা বিস্ফোরিত হয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু নিহত হয়। আরো ৩জন আহত হয়।

সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, পরদিন হরতালে ব্যবহারের জন্যে বাবলু বোমা বানাতে গিয়ে মারা যায়। বিস্ফোরণে কক্ষের উভয় প্রাচীর ধ্বসে যায়। কক্ষটির মেঝের কিছু অংশ ভেঙে নীচে পড়ে যায়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল অভিযোগ করে, সরকারই ষড়যন্ত্র করে বোমা মেরে বাবলুকে হত্যা করেছে। কিন্তু যে কক্ষে বোমা বিস্ফোরিত হয়, সে কক্ষটি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। তাহলে বোমা মারা হবে কিভাবে। অন্যদিকে, চারতলায় বাইরে থেকেও এত বড় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বোমা মারা সম্ভব নয়। ফলে বিষয়টি রহস্যময় হয়ে ওঠে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উভয় উপদল ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দেয়।

বাবলুর সাথে আহত আরো দু'জন মাঈনউদ্দিন ও নূর মোহাম্মদ হাসপাতালে মারা যায়।

পরদিন ১০ মার্চ (১৯৮৭) মাহবুবুল হক বাবলুর লাশ দাফন নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে বাবলুকে দাফন করার জন্যে কবর খুঁড়ে রাখে কিন্তু জানাযার পর পুলিশ সেখানে বাধা দেয়।

ফলে ছাত্র–পুলিশ সংঘর্ষ বেধে যায়। গুলী ও টিয়ার গ্যাসে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। স্বয়ং উপাচার্য আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন।
পরে বাবলুর মরদেহ বাবলুর গ্রামের বাড়ীতে পৌছে দেওয়া হয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমাগত অশান্ত পরিস্থিতি চলতেই থাকে। পুলিশের লাগাতার উস্কানী ছাত্রদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিতে থাকে। ১১ মার্চ পুলিশ বিভিন্ন ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে শতাধিক কক্ষ তছনছ করে এবং ৩৫ জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।
পুলিশ সকাল ১১টায় শহীদুল্লাহ হলে প্রবেশ করে এবং ছাত্রদের ধরে এনে পেটাতে পেটাতে হলের মাঝে জড়ো করে। রক্তাক্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্যাতন চালাতে থাকে এবং প্রখর রৌদ্রে চিৎ করে শুইয়ে রাখে।

শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষক এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রতিবাদ করে ছাত্রদের পাশে দাঁড়ালে তাঁকেও পুলিশ লাঞ্ছিত করে।

দেখা যায়, অনার্স–এম. এ ক্লাশে পাঠরত একজন ছাত্র, যে আগামী দিনে এই দেশেরই সিভিল সার্জেন্ট হবে, প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের দায়িত্ব নেবে, তাঁকে মাঠে ফেলে বুট জুতা দিয়ে লাথি মারছে প্রাইমারী পাশ অথবা একেবারেই নিরক্ষর একজন পুলিশ।

এই করুণ অসহায় অবস্থায় ছাত্রদের মারমুখী বিদ্রোহী করে তোলা ছাড়া আর কোন পথে নিয়ে যেতে পারে এই প্রশ্ন সেদিন নিরীহ সাধারণ ছাত্র সমাজ নিজের বিবেকের কাছে করতে থাকে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশী হস্তক্ষেপের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দেয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণলায় বলেছিল, চানখারপুলে দুটি বাসে আগুন দিলে পুলিশ শহীদল্লাহ হলে এবং কাঁটাবন এলাকায় একটি জীপে আগুন দিলে সূর্যসেন হলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে।

১২ মার্চ (১৯৮৭) এই কর্মসূচীর সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান শিক্ষামন্ত্রী মাহাবুবুর রহমানের সাথে দেখা করেন। এই সময়

উপাচার্যকে শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দেন, প্রয়োজন অনুভূত না হলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুলিশ সরিয়ে আনা হবে এবং আইনের প্রচলিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি নিশ্চিত করা হবে।

ছাত্ররা ১৪ মার্চ রাজধানীতে এবং ১৬ মার্চ সারাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ অভিযানের প্রতিবাদে আটক ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে। ১২ মার্চ অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভক্ত ছাত্র সংগঠনগুলি যৌথভাবে মিছিল ও সমাবেশ করেন। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রনেতা আখতারুজ্জামান বক্তৃতা করে। ছাত্রলীগ (সু-র), জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (মু-না), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ (শা-সা), ছাত্রলীগ (আ-মী)। ছাত্রলীগ (জ-লু), জাতীয় ছাত্রদল প্রমুখ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধি এই সময় উপস্থিত ছিলনা। কারণ তারা তখনো ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে ফেরে নি। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সকল সংগঠনই, এমনকি চরম বিরোধী জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকান্ড পরিচালনার প্রযোজনীয়তা অনুভব করে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে আগ্রহও প্রকাশ করে। ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে তখন এটা ছিল সময়ের দাবী।

এরই মধ্যে সকল সরকারী কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্যে সরকার ২৮ এপ্রিল (১৯৮৭) পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করে।

ডাকসুসহ ২১টি ছাত্র সংগঠন এই নির্দেশের প্রতিবাদ করে বলে, সরকারী নির্দেশ নয়, বরং কলেজ, কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হবে।

মনে করা হয়, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে ছাত্র সংগঠনগুলো মেতে উঠলে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং সরকার বিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসবে, ছাত্রসংগঠনের দৃষ্টিও অন্যত্র নিবন্ধ হবে, এই ধারণা ও আগাম পরিকল্পনা থেকে সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এই সময় ডাকসু নির্বাচনেও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালে। এই বছরই ২৪ মার্চ সামরিক আইন জারী হলে কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্র সংসদ বাতিল ঘোষণা করে। ক্রমাগত ছাত্র আন্দোলনে মানসিকভাবে

বিপর্যস্ত সরকার কয়েকবার ডাকসু নির্বাচন দিতে চান কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে অন্তর্ভুক্ত ছাত্রসংগঠনগুলি তাদের আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে ডাকসু নির্বাচন এড়িয়ে চলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র ইউনিয়নের প্রত্যাবর্তন

১৯ এপ্রিল (১৯৮৭) বাংলাদেশ অবজারভার একটি সংবাদ পরিবেশন করে যে, ১৯৮৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় ছাত্রদের অভিযানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত জাতীয় ছাত্র সমাজ এবং ১৯৮৬ ৩০ মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে বাইরে অবস্থানকারী বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের জন্যে বর্তমানে ডাকসু নির্বাচন অনিশ্চয়তার শিকার হয়েছে।

সকল ছাত্র সংগঠনের প্রতিরোধের কারণেই জাতীয় ছাত্র সমাজের আর ক্যাম্পাসে ফিরে আসার সম্ভবনা নেই। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (নির্বাচন বিরোধী অংশ) এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নকে পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে স্বাগত জানাতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। কারণ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের (নির্বাচনপন্থী) সকল ছাত্র সংগঠন (একমাত্র বাংলাদেশ ইউনিয়ন বাদে) ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছিল এবং মিলিতভাবে ২১ ছাত্র সংগঠনের সাথে কাজ করছিল। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সুলতান–রহমান) এবং বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি ও বাংলাদেশে ছাত্রঐক্য, ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ২১ সংগঠনে ঘন ঘন চাপ দিচ্ছিলো।

নির্বাচন বিরোধী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে অন্তর্ভুক্ত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী ক্যাম্পাসে অবিলম্বে ছাত্র ইউনিয়নের প্রকাশ্য কর্মকান্ডের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ক্যাম্পাসে ছাত্র ইউনিয়নের প্রবেশের পূর্বে আসলাম হত্যাকান্ডের মামলা তুলে নেওয়ার দাবী জানাতে থাকে। এ ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়ন জানায়, আসলাম হত্যার মামলার বাদী হয়েছে স্বয়ং আসলামের বাবা, ছাত্র ইউনিয়ন নয়। পিতা হয়ে পুত্রের হত্যার বিচার দাবী করার ক্ষেত্রে তাঁর অধিকার রয়েছে। আসলামের বাবাকে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা বলার কোনো অধিকার ছাত্র ইউনিয়নের নেই।

কুড়িগ্রামে কিশোর ছাত্র নতুনকে হত্যা

সুতরাং এই ক্ষেত্রে অচলাবস্থা আরো কিছুদিন চলতে থাকে। ১৯৮৭ সালের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ১৯ মার্চ কুড়িগ্রামে ইসলামী ঐক্য জোটের

মিছিলকারীদের হাতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের স্কুল কর্মী রেজাউল করিম নতুন নিহত হয়। নির্বাচনপন্থী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নতুন হত্যার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করে। ছাত্র নেতা তাহের উল্লাহ, আবদুর রহমান, অনিল চন্দ্র মরণ, মহিউদ্দিন মহিন, হিমাংশু সিংহ প্রমুখ এতে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানান।

স্বাধীনতা দিবসের প্রক্কালে এই প্রেক্ষাপটে ২১টি ছাত্র সংগঠন এক যৌথ বিবৃতিতে স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। ২৫ মার্চ প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির সাম্প্রতিক তৎপরতায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এতে আরো বলা হয়, স্বাধীনতার ১৫ বছর পরেও শিক্ষা, গণতন্ত্র ও বাঁচার দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ডাকসু, ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ঐক্য, ছাত্রসমিতি, ছাত্র সংসদ, ছাত্র ফোরাম, ছাত্র জোট, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি সংগঠন এতে স্বাক্ষর করে।

'রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত এবং সামরিক ব্যক্তিকে রাজনীতিমুক্ত কর'

২৯ মার্চ (১৯৮৭) সংবাদপত্রে বাংলাদেশের ৩১ জন বুদ্ধিজীবী দেশের সার্বিক অবস্থাকে হতাশাব্যঞ্জক বলে বর্ণনা করে মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় মতৈক্যের আহবান জানিয়ে এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেন।

তাঁরা বলেন, বাংলাদেশ এখন এক গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছে। এই সংকট জনজীবনের সকল ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছে।

বুদ্ধিজীবীগণ রাষ্ট্রপতির আসনে মর্যাদা নষ্ট ও জাতীয় সংসদের মতো প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হওয়াতে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তাঁরা বলেন, সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার করার প্রচেষ্টা জাতির জন্যে কল্যাণকর হবে না।

অবিমিশ্র গণতন্ত্রই এই সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বলে বিবৃতিদাতাগণ বলেন, একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এরা 'রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করবেন এবং সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিমুক্ত' করবেন। এই সরকারের কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

৩১ বুদ্ধিজীবীর এই বিবৃতিতে সই করেন, জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, কবি সুফিয়া কামাল, খান সরওয়ার মুরশিদ, সরদার ফজলুল করিম, ড. আনিসুজ্জামান, কামরুল হাসান, শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমদ, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ। ৩১ জন বুদ্ধিজীবীর এই বিবৃতি সমকালীন রাজনৈতিক মহলে প্রবল আলোড়ন তোলে এবং এর পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা, বিতর্ক ও বিবৃতি চলতে থাকে। দেশের গণতান্ত্রিক মহলে তা সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে এবং '৩১ বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি' শিরোনামে পরিচিতি লাভ করে।

জাতীয় পার্টির নেতা শাহ মোয়াজ্জেম এই সময় বুদ্ধিজীবীদের 'বিবৃতিজীবী' বলে উল্লেখ করেন।

২৩ মার্চ জাতীয় সংসদে সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় বিল কণ্ঠভোটে পাশ হয়। এতে রাষ্টপতিকে সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং বলা হয়, রাষ্টপতিই সরাসরি উপাচার্য নিয়োগ করবেন। ছাত্র সংসদ রাখা হয় নি, নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থা থাকবেনা। সিনেটেও ছাত্র প্রতিনিধি থাকবেনা। বিলটিতেও প্রচুর ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করে সংসদে আনা হয়।

বিল পাশ করানোর সময় শিক্ষামন্ত্রী মাহাবুবুর রহমানের কণ্ঠ থেকবে, কাব্য বেরিয়ে আসে, তিনি গদগদ কণ্ঠে বলেন, যতোদিন চাঁদ উঠবে, আকাশ থাকবে ততোদিন সিলেটের মাটিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের কোনো কোর্স থাকবেনা, বোমাবাজির কোনো ফ্যাকাল্টি থাকবেনা। এই জন্যেই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যতিক্রম ও পৃথক আইন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে করা হয়েছে।

বিরোধী দলের সদস্য ফজলুর রহমান খান বলেন, এই বিলে আচার্যকে (রাষ্টপতি আচার্য হবেন বলে বিলে বলা হয়) যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাতে মনে হয় আল্লাহর পরই তাঁর স্থান। ইমানউদ্দিন আহমদ অপর সদস্য মন্তব্য করেন, এই সরকার কথায় কথায় 'ইসলাম, ইসলাম, বলে, অথচ হযরত শাহজালালের নামে বিশ্ববিদ্যালয় করা হচ্ছে, সেখানে 'হযরত' শব্দই নেই।

জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলঃ বন্দুক লড়াই

মে-জুন (১৯৮৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও ছাত্রবাস লেবানন নগরীতে পরিণত হয়। ১৯৮৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী সরকার সমর্থক জাতীয় ছাত্র সমাজের অস্ত্রাধারীদের সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রবাস ও ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করলে সেখানে

শান্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু মে-জুন মাসে জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে এবার সংঘর্ষ বেধে যায়।

১২ জুন মহসিন হল ও সূর্যসেন হল জাসদপন্থী ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীরা এবং জসিমউদ্দীন হল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অস্ত্রধারীরা দখল করে রাখে। সাধারণ ছাত্রদের অধিকাংশই লাগাতার গুলী-বোমার যুদ্ধে ভীত হয়ে ছাত্রবাস ত্যাগ করে। কার্যতঃ হাতে গোনা কয়েকজনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় আবার জিম্মি হয়ে পড়ে।

বি.এন.পি নেতা খালেদা জিয়া ও কে. এম. ওবায়দুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, মহসিন হল ও সূর্যসেন হল সরকার সমর্থকরা দখল করে রেখেছে। কিন্তু তারা জসিমউদ্দীন হলের অস্ত্রধারীদের সম্পর্কে নীরব থাকে।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের হল পরিত্যাগের সময় সীমা বেধে দিলেও অস্ত্রধারীরা হল ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে।

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে ২২টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠিত হয়েছিল। পরিষদে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, অস্ত্রধারী কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে কোনো সংগঠন আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেবে না। কিন্তু সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করে জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এইসব সন্ত্রাসী ব্যক্তিদের শুধু আশ্রয় দেয় না, এদের পক্ষে সাফাই গাইতে থাকে।

২৫ জুন (১৯৮৭) এই দু'দলের সংঘর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রায় দু'ঘন্টা যুদ্ধের পর জাসদপন্থী ছাত্রলীগ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কাছে হেরে যায় এবং মহসিন হল ও সূর্যসেন পরিত্যাগ করে। এরপর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীরা নীরুর নেতৃত্বে কলাভবন এলাকায় বিজয় মিছিল বের করে। সংঘর্ষে দু'দলই অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করে। বিজয় মিছিলের পর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা গোলাম ফারুক অভি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলে,ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারী ছাত্র সংগঠন, তাদের দালাল ও বহিরাগতদের উচ্ছেদ অভিযান চলছে এবং চলবে।

পরাজিত জাসদপন্থী গিয়ে আশ্রয় নেয় জাতীয় প্রেসক্লাবে। সেখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অস্ত্রধারীদের সামরিকতন্ত্রের মদতপুষ্ট কায়েমী স্বার্থবাদী মহল হিসেবে উল্লেখ করে।

ছাত্রলীগ নেতারা, ছাত্রদলের নেতা নীরু, অভি, মালেক, শফিক, বজলুর রহমান শহীদ, মাহবুব প্রমুখকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবী জানায়।

২ জুলাই ২২টি ছাত্র সংগঠন এক বিবৃতিতে বলে অস্ত্রধারীদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিরাগত উচ্ছেদে আবার নোটিশ দেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ উপউপাচার্য, প্রক্টর, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, বিবদমান ৩টি হলের প্রাধ্যক্ষ, ছাত্রনেতা আখতারুজ্জামান, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, মোঃ তাহের উল্লাহ, জহীর উদ্দিন স্বপন ও নূরুল ফজল বুলবুলকে নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করে। এতে বিবদমান জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলেরও দু'জন প্রতিনিধি রাখা হয়।

৩ জুলাই (১৯৮৭) ২২টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া ও ৫ দলের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করতে যান। তবে খালেদা জিয়া অসুস্থ বলে ছাত্র নেতাদের সাক্ষাৎ দেন নি। ছাত্র নেতারা অস্ত্রহীন বিশ্ববিদ্যালয় কামনায় রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন কামনা করেন।

৬ জুলাই ২২ ছাত্র সংগঠনের নেতারা খালেদা জিয়ার সাথে বৈঠক করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে ছাত্র নেতাদের মধ্যে আখতারুজ্জামান, আসাদুজ্জামান রিপন, আমানুল্লাহ আমান, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, তাহের উল্লাহ, আবদুর রহমান, অমিতেশ রায়, আখতার সোবহান মাশরুর, মুশতাক হোসেন, নাজমুল হক প্রধান, মোস্তফা ফারুক, ইনায়েতুর রহীম, অনিল চন্দ্র মরণ, জহিরউদ্দীন স্বপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

১৪ জুলাই এই সন্ত্রাসী ঘটনা চরম আকার ধারণ করে। এদিন রাত বারটায় সূর্যসেন হলে গুলিবদ্ধ হয়ে ছাত্রদল কর্মী আবদুল হাকিম মারা যায়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই জন্যে জাসদপন্থী ছাত্রলীগ (মু–না)-কে দায়ী করে। ফলে পরদিন তারা সলিমুল্লাহ হল আক্রমণ করে এবং সেখানে ছাত্রলীগ (মু–না) কর্মী আসাদ আহমেদ মুন্নাকে হত্যা করে। এই সময় একজন নিরীহ রিক্সাচালক আবদুর রহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব ঘাতকদের হাতে নিহত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ২২টি ছাত্র সংগঠনের জোট ভেঙে দেওয়া হয় এবং ১৭টি ছাত্র সংগঠনের নতুন জোট, ঘটনার জন্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দায়ী করে। ১৭ ছাত্র সংগঠনের পক্ষে ছাত্র নেতা আখতারুজ্জামান এক লিখিত বক্তব্য সাংবাদিক সম্মেলনে পড়ে শোনান। তিনি বলেন, সূর্যসেন হলে হালিম নিহত হয়েছে, ছাত্রদলের নিজস্ব অন্তর্কলহের জন্যে। জোর করে তা ছাত্রলীগ (মু–না)-র উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

লিখিত বক্তৃতায় উপাচার্যের ভূমিকাকে ছাত্রনেতারা রহস্যময় বলে উল্লেখ করেন।

এই অবস্থায় পরিস্থিতির সুযোগ নেয় সরকার। এবং কাল বিলম্ব না করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরের মতো অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়।

জাতীয়বাদী ছাত্রদল নেতৃত্বাধীন সংগ্রামী ছাত্র জোট এক বিবৃতিতে ২১টি সংগঠনের ঐক্য জোট ভেঙে না দেওয়ার আহবান জানায়।

২৮ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সন্ত্রাস ও দু'জনের প্রাণহানির অভিযোগে ১৪ জন ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে রমনা পুলিশ এক মামলা দায়ের করে। এই ছাত্রনেতাদের মধ্যে রয়েছে সানাউল হক নীরু, শহীদুল ইসলাম বজলু, অভি আহমেদ, মালেক রতন, মাহবুব, ইলিয়াস আলী, মানিক, প্রমুখ।

এরশাদের ভাষণঃ জাতীয় ছাত্র সমাজ বিলুপ্ত

১৯ আগষ্ট (১৯৮৭) রাষ্টপতি এরশাদ বেতার ও টেলিভিশনে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি ৪০ বছরের ইতিহাসে ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলার কথা ভাষণে বলেন বটে, কিন্তু তাঁর মূল ভাষণ জুড়ে ছিল ছাত্র রাজনীতি।

তিনি তাঁর নিজ দল জাতীয় পার্টির অঙ্গসংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজ এদিন থেকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন, জাতীয় ছাত্র পরিষদও বাতিল করেন। একই সাথে তিনি সকল রাজনৈতিক দলকেও তাঁদের ছাত্র সংগঠন তাঁর মতো বাতিল ও বিলুপ্ত করার আহবান জানান।

রাষ্টপতি এরশাদ এই প্রসঙ্গে ছাত্র রাজনীতির কতকগুলি নেতিবাচক দিক পরিসংখ্যান সহকারে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ৩১৮টি সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে ১১৬জন ছাত্র এবং ৬জন নিরীহ পথচারী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে, ৩,৫৮১ জন ছাত্র।

এই একই সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে বিরোধের ফলে ১১টি ছাত্রাবাস ভস্মীভূত হয়েছে। ছাত্রাবাসের ২১টি কক্ষ পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে। ১৪২টি বাস, মিনিবাস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরের শেষার্ধে ১৫০ দিনের মধ্যে ১২০ দিন ক্লাশ হয় নি।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রদল প্রমুখ সংগঠন রাষ্টপতির ভাষণকে মিথ্যা অভিভাষণ বলে আখ্যায়িত করে বলেন, ছাত্র আন্দোলনকে দেশবাসীর কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন প্রয়াস চালিয়েছেন এরশাদ তাঁর ভাষণে। তারা বলেন, সরকার সাধারণ ছাত্রদের সামনে তাঁর নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েই জাতীয় ছাত্র সমাজ ভেঙে দিয়েছে।

ছাত্র সংগঠনগুলো বলে, সেদিন আর দেরী নয়, যেদিন একে একে জাতীয় পার্টিও বিলুপ্ত করতে হবে।

ছাত্রসংগঠনগুলি পরদিন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এরশাদের মিথ্যা ভাষণ ও ছাত্র আন্দোলনকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে এক সমাবেশের আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসী ছাত্রদের বহিষ্কার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্ত করার জন্যে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল পয়লা সেপ্টেম্বর তার প্রতিবেদন উপাচার্যের কাছে পেশ করা হয়। ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী তৎপরতা, শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থী কার্যকলাপের সাথে জড়িত ছাত্রদের চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তা সুপারিশ করার লক্ষ্য ওই কমিটি গঠিত হয়েছিল

প্রতিবেদন পেশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

অবৈধ অস্ত্র বহন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অমান্য করার অভিযোগে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিষদ ৪টি সংগঠনের ২০জন ছাত্রকে ১০ সেপ্টেম্বর (১৯৮৭) কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়।

অভিযুক্ত ২০ জন ছাত্রের ১২ জন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের, ৪জন জাসদপন্থী ছাত্রলীগের, ২জন বিলুপ্ত জাতীয় ছাত্র সমাজের এবং ২ জন আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ (সুলতান-রহমান)-এর নেতা ও কর্মী।

ছাত্রদলের ১২ জন হচ্ছেন, সানাউল হক নীরু (সাংগঠনিক সম্পাদক), কে. বি খবির (দপ্তর সম্পাদক), নাজিমুদ্দিন আলম (তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক), তকদির মোহাম্মদ জসিম (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), গোলাম ফারুক অভি, মালেক, মাহবুব, রতন, শহীদ, শফিক, আলী এবং ইলিয়াস আলী।

জাসদপন্থী ছাত্রলীগ (মুশতাক-নাজমুল)-এর ৪জন হলেন, শিপন, আকরাম, মুরাদ ও মুকুর।

জাতীয় ছাত্র সমাজের ইকবাল হোসেন রাজু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি) এবং গোলাম মোর্তুজা।

ছাত্রলীগ (সু-র)-এর কাওসার ও মোর্তুজা।

১২ সেপ্টেম্বর (১৯৮৭) ছাত্রদল নেতা নীরু ও রবিনকে আসাদ গেট থেকে সাদা পোশাকধারীরা অপহরণ করেছে বলে ছাত্রদল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান রিপন ও আমানুল্লাহ আমান অভিযোগ করেন।

এই সময় উপাচার্য আবদুল মান্নান ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা উপলক্ষে ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছে একটি চিঠি পাঠান। তাতে ছাত্রদের অভিভাবকদের প্রভাব খাটানোর আহবান জানানো হয়, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব হয়।

১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কারণ দর্শাও নোটিশকৃত ২০ জন ছাত্রের মধ্যে ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার ও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এবং ৫ জনকে সর্তক করে, এর বেশীরভাগই ছিল ছাত্রদল কর্মী। সানাউল হক নীরু ছিল তার অন্যতম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটা ছিল স্মরণাতীত কালের সাহসী ঘটনার একটি।

২০ সেপ্টেম্বর (১৯৮৭) জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের নেতা ও সাংগঠনিক সম্পাদক সানাউল হক নীরুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিষ্কার ও অবাঞ্ছিত ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে। বি.এন.পি একে একটি চক্রান্ত বলে অভিহিত করে। খালেদা জিয়া নীরুর বহিষ্কারকে নিন্দা করে বিবৃতি দেন।

পাল্টা ১৫টি ছাত্র সংগঠন ১১ জনের বহিস্কারকে অভিনন্দিত করে। ছাত্রলীগ (সু-র), (মু-না), (শা-সা), জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রী এর অন্যতম।

২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫টি ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাস বিরোধী এক মৌন মিছিল বের করে। মিছিল শেষ হওয়ার আগেই ছাত্রদল কর্মীরা মৌন মিছিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ও উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করে বলে ১৫টি সংগঠন থেকে অভিযোগ

করা হয়। উপাচার্য পরে ১৫টি সংগঠনের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

২৬ সেপ্টেম্বর মোট ৭৩ দিন একটানা বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার খোলে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর উপাচার্য এম. এ রকিবের সভাপতিত্বে সন্ত্রাস বিরোধী ছাত্র, শিক্ষক ও রাজনৈতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

২২ এপ্রিল (১৯৮৭) এরশাদ সরকার তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মফিজউদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে সরকার ২৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। বলা হয় যে, ১৯৮৭ সালের ২২ জুলাই-এর মধ্যে কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করবে।

ঐদিন সংবাদপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি কে. এ. এম. সাদউদ্দীনের এক সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, মাত্র ৩০-৪০ জন সন্ত্রাসবাদীর কাছে গোটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ হাজার ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী জিম্মি হয়ে পড়ে আছে।

তিনি আরো জানান, রাষ্টবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. হারুন-অর রশীদের উপর হামলা হয়েছে এবং তিনতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করেন।

এসব অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্যে তিনি রাষ্টবিজ্ঞানের শিক্ষক আতাউর রহমানকে দায়ী করেন এবং তাঁর অপসারণ চান।

ড. হারুনের উপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পূর্বদিন এক মৌন মিছিল বের করে এবং জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সমাবেশ করে।

২৭ এপ্রিল (১৯৮৭) স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারে জানান, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আর ছাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। কারণ তিনি বলেন, তাহলে আমরা ভাল চিকিৎসা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হব।

৩০ এপ্রিল ইডেন সরকারী কলেজের ছাত্রীরা তাদের উপাধ্যক্ষের কক্ষ তছনছ করে দেয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (সু-র), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ইসলামী ছাত্রী সংস্থা সহ ৭টি ছাত্র সংগঠন কারচুপির মাধ্যমে সরকার সমর্থিত পরিষদ জিতিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলে।

২৮ এপ্রিল সারাদেশে বিভিন্ন কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও গুলীর মাঝেও এই সব নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলো বিজয় অব্যাহত রাখে।

দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ' ১৯ মে একটি খবর পরিবেশন করে বলে যে, বিশ্ব ব্যাংক উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশের ছাত্রদের বেতন বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে কমিয়ে ফেলেছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাঃ ***১৯৮৭***

এই সময় ভারতের মীরাট ও দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে যায়। ভারতের এই নিন্দনীয় ঘটনাকে পুঁজি করে বাংলাদেশেও একদল উগ্র ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করে।

২ জুন ১৯৮৭ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন এতে সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যর মধ্যে আবদুস সামাদ আজাদ, পীর হাবিবুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ তোয়াহা, কবি সুফিয়া কামাল, বজলুর রহমান, হাবিবুর রহমান, শেখ মহিউদ্দিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে একটি ঘোষণা পাঠ করা হয় এবং এতে বলা হয়, বাংলাদেশে মন্দির ও দোকানপাট এবং বাড়ীঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ ঘটনার সাথে সরকার সরাসরি জড়িত। ভারতীয় দাঙ্গার প্রতিবাদের নামে এসব ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। এতে রাজাকার-আলবদরদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘোষণায় পবিত্র মসজিদ থেকে মিছিল বের করার সকল অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে মুসল্লী ভাইদের প্রতি আহবান জানানো হয়।

২১ টি ছাত্র সংগঠন ঐদিন এক বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির নিন্দা করে। পরদিন ৪ জুন প্রেসক্লাবে ২২ ছাত্র সংগঠন সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তারা মীরাট ও দিল্লীতে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী চক্রান্ত করে, যে নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে, বাংলাদেশে তাকে পুঁজি করে নারকীয় রাজনীতি খেলতে দেওয়া হবে না।

ছাত্র বেতন ও বাজেটে বিরোধী ছাত্র আন্দোলনঃ ১৯৮৭

২৩ জুন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উভয় অংশ, সংগ্রামী ছাত্র জোট ও জাতীয় ছাত্রলীগ দেশব্যাপী ছাত্র বেতন বৃদ্ধি ও সংসদে পেশকৃত বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালন করে।

সংগ্রামী ছাত্রজোট জাতীয় বাজেটের কপি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদিতে আগুন দেয়।

সুলতান মোহাম্মদ মনসুরের সভাপতিত্বে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নির্বাচনপন্থীদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মোঃ তাহেরউল্লাহ, জ্যোতির্ময় দত্ত বাসু ও অনিল চন্দ্র মরণ এতে বক্তৃতা দেয় এবং পরে শিক্ষাভবনে স্মারকলিপি পেশ করে।

আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্বাচন বিরোধী অংশ বটতলায় সমাবেশ করে। মুশতাক হোসেন ও মোস্তফা ফারুক এতে বক্তব্য রাখেন। মহাপরিচালক না থাকায় তারা শিক্ষাভবনে স্মারকলিপি পেশ না করে চলে আসে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

জাতীয় ছাত্রলীগের সমাবেশে নূরুল ফজল বুলবুল, ইনায়েতুর রহীম ও ওহিদুজ্জামান চান বক্তব্য রাখেন এবং শিক্ষাভবনে সমাবেশ করে।

সকল জোট ও সংগঠন ৩০ জুন সারাদেশে ছাত্র বিক্ষোভের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ২৫ জুন ডাকসু কার্যালয়ে ২২ টি ছাত্র সংগঠন সভা করে এবং পয়লা জুলাই সারাদেশে ছাত্রধর্মঘট পালনের ডাক দেয়। এক বিবৃতিতে তারা স্কুল-কলেজে বর্ধিত বেতন না দেওয়ার জন্যে ছাত্রদের অনুরোধ করে।

১৩ জুলাই শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, শ্রমিকদের ৫ দফা দাবী এবং প্রশাসন সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে ২৪ ঘন্টা ধর্মঘটের ডাক দেয়। কিন্তু রাজধানী ঢাকা সহ দেশের সর্বত্র গতকাল সর্বাত্মক স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ৮ দল শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সমর্থনে মিছিল নিয়ে সংসদ অভিমুখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যেতে চাইলে পুলিশ মিছিলে হামলা করে। রাজনৈতিক নেতা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান ও বাকশাল নেতা আবদুর রাজ্জাক এতে আহত হন।

এই সময় ডঃ কামাল হোসেন বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে বলেন, আমরা ডাকাত ধরতে যাচ্ছি, পুলিশ ভাই, আমাদের সাহায্য করুন। তিনি বলেন, এরশাদ গরীবের সম্পদ লুট করছে, তাঁকে ধরতে হবে। ১৯৭১ সালে পুলিশ বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ

করেছে, এই কথা স্মরণ করে কামাল হোসেন আরো বলেন, এই আন্দোলনেও পুলিশকে পুনরায় সাথে আসতেই হবে।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান আহত অবস্থায় পুলিশ বাহিনীকে মিছিলে অংশ গ্রহণের আহবান জানান। এই খবর সংসদ ভবনে পৌঁছলে বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা, মোহাম্মদ ফরহাদ প্রমুখ বাংলা মটরে আসেন। এখানে জননেত্রী শেখ হাসিনা, মওদুদ, কাজী জাফর ও শাহ মোয়াজ্জেমকে সামরিক জেনারেলদের 'কেনা দাস' বলে উল্লেখ করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন

এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও এই সময় ছাত্রআন্দোলন গড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহীদ মিনার নির্মাণের সাথে জড়িত থাকার 'অপরাধে' উপাচার্য ২০ জন ছাত্রকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য ডাকসু ভবনে এসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলে, বাংলাদেশের ভেতরে এখানে মিনি-পাকিস্তান বানানো হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাততালি দেওয়া যায় না, স্বাগতম-শুভেচ্ছাও বলা যায় না। এর পরিবর্তে বলতে হয়, মারহাবা ও আহ্‌লান-সাহ্‌লান। শহীদ দিবস, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসও পালন করা নিষিদ্ধ বলে ছাত্ররা জানায়। বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করতে দেওয়া হয়নি বলেও তারা অভিযোগ করে।

ছাত্রদের আবার শিক্ষা আন্দোলনে প্রত্যাবর্তন

পয়লা অক্টোবর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উভয় উপদল, সংগ্রামী ছাত্র-জোট ছাত্র বেতন বৃদ্ধি প্রতিরোধ পক্ষ এবং ১৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এই সময় দেশব্যাপী পাইকারী হারে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতার করা হতে থাকে। এর প্রতিবাদে চট্টগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, গফরগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট, ঈশ্বরদী, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, যশোর প্রভৃতি স্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ, কোথাও কোথাও হরতাল পালিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ছাত্ররা দীর্ঘদিন পর আবার তাদের শিক্ষা আন্দোলনে ফিরে এসেছিল। রাজনৈতিক দমননীতি ছাত্রদের আবার রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে ফেলার সুস্পষ্ট উস্কানী বলে পর্যবেক্ষক মহল ভাবতে থাকেন।

২৮ অক্টোবর ১৭ টি কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমিতির ডাকে সারাদেশে ১০ দফা জরুরী দাবীতে বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত অবরোধ পালিত হয়। এই সময় নড়াইল, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী, জামালপুরের মাদারগঞ্জ, চট্টগ্রামের পটিয়া এবং মাদারীপুরের মোস্তে পুলিশ ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের উপর গুলী চালায়। এতে একজন কৃষক নিহত এবং বহু সংখ্যক আহত ও গ্রেফতার হয়।

২৮ অক্টোবর ১৪ টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় বর্ধিত ছাত্র বেতন প্রতিরোধ কমিটি। কমিটি এক সমাবেশে ২ নভেম্বর সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয়। সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, আসাদুজ্জামান রিপন, মুশতাক হোসেন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। ইনায়েতুর রহীম ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র বিপ্লবী মঞ্চ এবং জাতীয় ছাত্র দল এদিন মধুর ক্যান্টিনে পৃথক সমাবেশ করে। ছাত্র নেতা হিমু খন্দকার, আবদুর রহিম, শেখ সালাউদ্দিন, মুনসুরুল হাই মোহন এখানে বক্তব্য রাখেন। তারা সরকারের দমননীতিকে চ্যালেঞ্জ করার আহবান জানান।

৩০ অক্টোবর ১৩ টি ছাত্র সংগঠন শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া ২৮ অক্টোবর যে যৌথ বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি যুক্ত ঘোষণা দিয়েছেন তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতিতে দেয়। বিবৃতি স্বাক্ষর করে, ছাত্রলীগ (সু-র), ছাত্রলীগ (মু-না), ছাত্রলীগ (শা-সা), ছাত্রলীগ (আ-মী), জাতীয় ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ঐক্য সমিতি, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী।

নভেম্বর আন্দোলনঃ ১৯৮৭

নভেম্বরে (১৯৮৭) 'এরশাদ হঠাও' আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। ৫ দফার সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে এক চরম পর্যায়ে পড়ে। ১৯৮৬ সালের ৭মে'র নির্বাচনে সরকার ভালভাবেই ৮দলীয় জোটের কাছে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল। মিডিয়া ক্যু করে কোনো ভাবে রক্ষা পায়।

৮৭ সালের অক্টোবরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন এরশাদ। ৮, ৭ কিংবা ৫ দলের কেউ এতে অংশ নেয়নি। ৮৭ সালে সংসদের ভেতরে ও বাইরে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠলো। ফলে সরকার জেলা পরিষদ বিল নিয়ে হতচকিত হয় এবং স্থগিত করে।

২৪ সেপ্টেম্বর উপজেলায়, ২৬ সেপ্টেম্বর জেলায় এবং ৭ অক্টোবর 'চল চল ঢাকা চল' কর্মসূচী ছিল। ৭ অক্টোবর কর্মসূচী পরে ১০ নভেম্বরে নিয়ে যাওয়া হয়। ১২ সেপ্টেম্বর উপজেলাগুলীতে ব্যাপক হাঙ্গামা, সংঘর্ষ, গুলী (৩ জন নিহত) ইত্যাদি মিলিয়ে আন্দোলন গ্রাম পর্যায়ে চলে যায়।

২৮ অক্টোবর এই অবস্থাকে পরিপক্ক করে ১৭টি কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠনের মিলিত সংগ্রাম। রেলপথ, রাজপথ অবরোধের মাধ্যমে আন্দোলন নতুন গতিপায়। এদিন আরেক ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম দেন শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া। দুই নেত্রী এই প্রথমবারের মতো একত্রে বৈঠক করেন এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের যৌথ ঘোষণা দেন। পয়লা নভেম্বর জেলা কেন্দ্রীক কর্মসূচী, হরতাল, বিক্ষোভ চলে। এভাবে সারাদেশে বিরোধীদল ১০ নভেম্বরের একটা ভালরকম 'ঢাকা চল' প্রস্তুতি সম্পন্ন করে।

গণআক্রোশের ভয়ে ভীত সরকার রাজধানীতে অবস্থিত সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে দেয় এবং ছাত্রাবাস থেকে ছাত্রদের বিতাড়িত করার নির্দেশ দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট, ছাত্র সমাজ, শিক্ষক ও কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও হল খালি করার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে।

৫ নভেম্বর ঢাকার সাংবাদিকরা বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এক প্রতীকী প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলামের উপরের চার ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা সংবাদপত্রের কন্ঠরোধের বিরুদ্ধে খালি রাখে।

ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। ১৮ হাজার পুলিশ, বি.ডি.আর ঢাকার বিভিন্ন প্রবেশ পথে মোতায়েন করা হয়। ঢাকাগামী সকল ট্রেন, বাস ও লঞ্চ বন্ধ করে দেওয়া, যাতে কেউ ঢাকায় না আসতে পারে। এভাবে রাজাধানী শহর ঢাকা কার্যতঃ সমগ্র বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এতো কিছুর পরেও ১০ নভেম্বর ঢাকায় হরতাল পালিত হয়, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গুলী করে সরকার ৬ টি তাজা প্রাণ নিয়ে নেয়। আহত হয় শতাধিক, ৩০০জন গ্রেফতার বরণ করে।

বাকশাল ও কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে জাতীয় পার্টির সমর্থকরা পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়।

পুলিশ ৩টি লাশ সনাক্ত করে। এর মধ্যে বরিশাল পলেটেকনিকের ছাত্র সাইদুর রহমান নিহত হয়।

বস্তুত এভাবে সরকার ১০ নভেম্বর ঢাকা আগমনকারী লাখ লাখ জনতার রুদ্ররোষ থেকে নিজেকে সামাল দেয়।

ঘটনার প্রতিবাদে ৮, ৭ ও ৫ দল এবং ছাত্ররা পরদিন সারাদেশে হরতালের ডাক দেয়।

১০ নভেম্বরে নূর হোসেন নামে এক যুবক শহীদের খাতায় নতুন তাৎপর্যে নাম লেখায়। সে তার বুক ও পিঠে রং দিয়ে লিখে এনেছিল, 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'। এই অবস্থায়ই নূর হোসেন পুলিশ–বি ডি আরের গুলীতে নিহত হয়। জিরো পয়েন্টের কাছে নূর হোসেন নিহত হওয়ায় পরবর্তী কালে এই স্থানের নাম রাখা হয় 'নূর হোসেন চত্ত্বর'।

১১ নভেম্বর (১৯৮৭) ফরিদপুরের চর ভদ্রাসনে এক জনসভায় জেনারেল এরশাদ, তাঁর পরিবর্তে বিরোধী দলের নেতাদের পদত্যাগ করতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ১০ নভেম্বর বিরোধী দল ৫০ লাখ লোকের ঢাকা সমাবেশ করবে বলে পরিকল্পনা করছিল, কিন্তু তারা ৫০ হাজার লোকও আনতে পারেনি।

জেনারেল এরশাদ বাস, ট্রেন, লঞ্চ বন্ধ করে দিয়েছিলেন সেকথা আর উল্লেখ করেন নি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে বিরোধীদের 'দেখামাত্র গুলী' করার কথা বলে। ৫ জন সাবেক বিচারপতি ও ১২ জন আইনজীবী এই নির্দেশের প্রতিবাদ করে বলে, দেখা মাত্র গুলী করে মারলে 'হত্যা' বলে গণ্য করা হবে।

১১ নভেম্বর গ্রেফতার এড়ানোর জন্যে বেগম খালেদা জিয়া হোটেল পূর্বাণীতে উঠেন। কিন্তু পুলিশ হোটেল স্যুটের দরজা ভেঙে তাকে গ্রেফতার করে তাঁর বাড়ীতে অন্তরীন করে রাখে।

একই দিন জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে ধানমন্ডীর ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু ভবনে গৃহবন্দী করে। এই সব ঘটনার পর ১২ নভেম্বরও দেশে হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় এদিন একজন পুলিশসহ ২ জন নিহত হয়।

গৃহে অন্তরীণ রাখাকে চ্যালেঞ্জ করে ১৪ নভেম্বর শেখ হাসিনার পক্ষে মীর্জা হাফিজ এবং বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে ড. কামাল হোসেন সুপ্রীম কোর্টে রীট আবেদনের সিদ্ধান্ত নেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ১৫ নভেম্বর এক বিবৃতিতে জাতিকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয়ায় সরকারের নিন্দা করে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌন মিছিল ও গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয় ১৪ নভেম্বর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চলমান গণআন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ জননেত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবী করে।

১৪ নভেম্বর মহানগনরীর পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় গাড়ীতে মাইক লাগিয়ে বক্তৃতা করে বলে, 'আমাদের দিকে বোমা মারলে, কুকুর বেড়ালের মতো গুলী করে হত্যা করবো।'

এদিন ২৩ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, দেশ ক্রমশঃ গৃহযুদ্ধের দিকে চলে যাচ্ছে।

৮, ৭ ও ৫ দল ২১ ও ২২ নভেম্বর ৪৮ ঘন্টা হরতালের ডাক দেয়। ১৬ টি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে পাড়ায় মহল্লায় সংগ্রাম কমিটি গঠনের নির্দেশ পাঠায় এবং ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘট সফল করতে বলে।

আতাউস সামাদ গ্রেফাতার এবং বি.বি.সি নিষিদ্ধ

২৩ নভেম্বর বি. বি. সি–র ঢাকা সাংবাদদাতা আতাউস সামাদকে গ্রেফতার করা হয়। বি.বি.সি.র পক্ষে ঢাকায় আগত ফিলিপ জোন্স তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদের সাথে দেখা করে এর প্রতিবাদ জানান।

২৩ নভেম্বর জেনারেল এরশাদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় বলেন, তিনি দেশকে বামপন্থীদের হাতে তুলে দিতে পারেন না।

জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদপত্রসেবীদের এক সমাবেশে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাংবাদিক আতাউস সামাদের মুক্তি এবং বাংলার বাণীর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

২৪ নভেম্বর ৮, ৭, ও ৫ দলে লিয়াজোঁ কমিটির সভায় ২৯ নভেম্বর থেকে লাগাতার ৭২ ঘন্টার একটানা হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লিয়াজো কমিটির এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আবদুল জলিল, মোহাম্মদ নাসিম, মাজেদুল হক, শামসুদ্দোহা, সৈয়দ আহমেদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, আবদুল মোনায়েম সরকার, কামাল হায়দার প্রমুখ।

২৬ নভেম্বর জাতীয় পার্টির একটি মিছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে পুনরায় হামলা চালায় এবং ভাঙচুর করে।

২৭ নভেম্বর দেশের ৩৫ জন কবি এক যুক্ত বিবৃতিতে দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করে বলেন, এই গণআন্দোলনে স্বৈরাচারী বর্তমান সরকার পরাস্ত হবে।

৩০ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপপ্রধানমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ এম. এ মতিন ও তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ বলেন, দেশে এখন জরুরী অবস্থা বলবৎ আছে। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ। বি.বি.সি ও আকাশবাণী বিরোধী দলের সূত্রে পাওয়া খবর প্রচার করে আইন অমান্য করছে।

তাঁরা নভেম্বরে নিহতের সংখ্যা ৮ বলে জানান। বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে ৪,৮৩২ জনকে জরুরী আইন অমান্য করায় দু'জনকে গুলি করে মারা হয়েছে। স্বীকার করতে বাধ্য হন।

৫ ডিসেম্বর থেকে সরকার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া স্কুলগুলি খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে।

১২ ডিসেম্বর থেকে ঘরোয়া রাজনীতি চলবে বলে ঘোষণার উল্লেখ করা হয়। তবে জরুরী আইনের আওতায় মিছিল, সমাবেশ ও জনসভার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

কেন্দ্রীয় ২২ ছাত্র সংগঠন ২৯ ও ৩১ ডিসেম্বর সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় দুটি খুলে দেওয়ার দাবীতে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

৭ ডিসেম্বর (১৯৮৭) দিশেহারা জাতীয় পার্টি সরকার ১৯৮৬ সালের ৭ মে গঠিত জাতীয় সংসদও বাতিল করে। এই সংসদে নির্বাচনে ৮ দলীয় জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মুখে সরকার মিডিয়া ক্যু করে জাতীয় পার্টির জন্যে ২১৭টি আসন দখল করে। ৮ দলীয় জোটের প্রায় শতেক এবং জামাতে ইসলামীর ১০ জন সংসদ সদস্য ছিল এতে। কিন্তু এতেও সরকার ভয় পায় এবং সংসদটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে।

৭ দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ৫ দল ক্রমাগত সংসদ বাতিলের দাবী তুলছিলেন।

১২ ডিসেম্বর থেকে সরকার বাংলাদেশে বি.বি.সি-র সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বি.বি.সি-র ঢাকা অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়। বি.বি.সির তৎপরতা নাশকতা ও বিদ্রোহের সামিল বলে উল্লেখ্য করা হয়।

সম্প্রতি বি.বি.সি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল আতিকুর রহমানকে নির্জীব সামরিক কর্তা বলার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়।

২৫ ডিসেম্বর ১৭টি কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন দেশ ও জাতি আজ ধ্বংসের সম্মুখীন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে বিবৃতি দেয়।

২৪ ডিসেম্বর (১৯৮৭) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ২২ টি ছাত্র সংগঠন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজ ও পত্রিকা হকার আবদুল আজিজের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে ছাত্র শ্রমিক সংহতি দিবস পালন করে।

ছাত্রনেতা মুশতাক হোসেনের সভাপতিত্বে এই সমাবেশে ঘোষণা পাঠ করেন আবদুর রহমান। বক্তব্য রাখেন ফয়েজ আহমেদ এবং শ্রমিক নেতা মনজুরুল্ল আহসান খান ও নূরুল্ল আনোয়ার।

ঘোষণায় দালালদের উচ্ছেদ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত্বশাসন সমুন্নত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। গণআন্দোলন সম্পর্কে সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের নিন্দা জানানো হয় এবং মার্কিন দূতের বহিষ্কার দাবী করা হয়।

দেশীয় প্রকৌশলীদের আবিষ্কৃত হরিপুর তেল ক্ষেত্র বিদেশীদের কাছে লীজ দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হয় এবং ১৭টি কৃষক ও ক্ষেত মুজুর সংগঠনের আহূত কর্মসূচীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করা হয়।

ছাত্রনেতা মোস্তফা ফারুক, আবেদ রাজা সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে দিয়ে সরকার ১১ জন শিল্পীকে কালো তালিকাভুক্ত করে। তাদের টেলিভিশনে নিষিদ্ধ করা হয়।

'হরতাল ও ধর্মঘট' শব্দ উধাও

১৯৮৮ সালের শুরুতে ২২ ছাত্র সংগঠন তার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত রাখে। এই সময় এরশাদ সর কার ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনী তফসীল প্রত্যাখ্যান করে

সংগঠনগুলি এক বিবৃতি দেয়। ৩ জানুয়ারী প্রদত্ত বিবৃতিতে ২২ ছাত্র সংগঠন বলে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ছাত্র–জনতা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করবে।

৩ জানুয়ারী ৮, ৭ ও ৫ দলের ডাকে 'ঢাকা কর্মসূচী' পালিত হয়। আন্দোলনের এই পর্যায়ে সরকার 'হরতাল', 'ধর্মঘট' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। ফলে ৪ জানুয়ারী ঢাকার সংবাদপত্রগুলি বিরোধী দলের আন্দোলনের পরবর্তী খবর ছাপাতে গিয়ে শিরোনাম করে 'বিভিন্ন জোট ও দলের অভিন্ন ঘোষণায় আগামী ২০ ও ২১ জানুয়ারী সর্বাত্মক কর্মসূচী পালিত হবে'। অর্থাৎ বিরোধী দল ২০ ও ২১ জানুয়ারী সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেয়। এই সময় 'হরতাল' 'ধর্মঘট' শব্দ দু'টি সংবাদপত্র থেকে একেবারেই লোপ পায় এবং এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'কর্মসূচী' শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে।

৩ জানুয়ারী (১৯৮৮) ৩ জোটের ঢাকা সমাবেশের ঘোষণায় বলা হয়, এরশাদ সরকার যে কোনো চক্রান্তই করুক, তার পদত্যাগের প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগ ও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল) অনুরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশও একই সাথে পৃথক কর্মসূচী ঘোষণা করে।

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী: ১৯৮৮

৪ জানুয়ারী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ছাত্রলীগের বিভিন্ন গোষ্ঠী ৪০তম পূর্তিসভার আয়োজন করে। ছাত্রলীগ (মু–না) আয়োজিত সভায় মুশতাক হোসেনের সভাপতিত্বে প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা মুনীরউদ্দিন আহমেদ, আবুল হাসিব খান, আখতারুজ্জামান, শিরিন আখতার, নাজমুল হক প্রধান ও শফী আহমেদ বক্তব্য রাখেন। এতে ছাত্রনেতা মুনীর বর্তমান বিরোধী রাজনীতির বর্তমান নেতৃত্বকে দোদুল্যমান আখ্যা দিয়ে বলেন, তাদের সাথে ছাত্র আন্দোলনের মূল ধারার কোনো সম্পর্ক নেই। ছাত্রনেতা আখতারুজ্জামান বলেন, যেহেতু ছাত্ররাই বর্তমান সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেছিল, সুতরাং এই আন্দোলনকে সফল করার নেতৃত্বও ছাত্রদেরই দিতে হবে।

ছাত্রলীগ (সু–র) আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন সুলতান মোহাম্মদ মনসুর ও আবদুর রহমান। জাতীয় ছাত্রলীগের অনুষ্ঠানে ছাত্রনেতা নূরুল ফজল বুলবুল কর্মীদের শপথ বাক্য পাঠ করান এবং ইনায়েতুর রহীম বক্তব্য রাখেন। ছাত্রলীগ

(শা–ই) আয়োজিত সভায় শাজাহান সিরাজ, রাবেয়া সিরাজ, ইমদাদুল হক, সেলিম চৌধুরী, মেজবাহ এবং খুররম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ছাত্রলীগ (জ–লু) আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন শফিউল আলম প্রধান, রেহানা বেগম, লুৎফর রহমান ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা আসাদুজ্জামান রিপন। ছাত্রলীগ (মা–জো) আয়োজিত পুনর্মিলনীতে কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন, এডভোকেট জহিরুল ইসলাম ও গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগের সাইফুদ্দিন মনি বক্তব্য রাখেন। ছাত্রলীগ (শা–সা) আয়োজিত পুনর্মিলনীতে সাবেক ছাত্রনেতা মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, অবিশ্বাসী এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার অর্থ হবে ন্যাড়ার দ্বিতীয়বার বেলতলায় যাওয়া। সাবেক ছাত্রনেতা আ. ফ. ম. মাহাবুবুল হক, আখতারুজ্জামান এবং ইসমাইল হোসেন, মোস্তফা ব্যানার্জী, সাইদুল ইসলাম ও শাহাবুদ্দিন এতে বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ

জানুয়ারী (১৯৮৮) প্রথম সপ্তাহে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এক তরফা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি খুলে দেওয়ার জোর দাবী জানাতে থাকলে শিক্ষামন্ত্রী মাহাবুবুর রহমান ১৪ জানুয়ারী থেকে ঢাকা, রাজশাহী, কৃষি ও প্রকৌশলসহ ৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেরা পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা দিয়ে ফেলেছিলো।

৭ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে ২২ ছাত্র সংগঠন ছাত্রনেতা জহিরুদ্দিন স্বপনের সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভায় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে দুরভিসন্ধিমূলক বলে অভিহিত করে। ছাত্রনেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ভুমিকাকে 'নতজানু আচরণ' বলে উল্লেখ করেন। ছাত্ররা এদিন সিদ্ধান্ত নেয়, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ শুরুর দিন বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ১৮ জানুয়ারী ছাত্রদের বিভিন্ন দাবী বাস্তবায়ন ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের পদত্যাগের দাবীতে দেশব্যাপী সমাবেশ করবে। ছাত্রনেতা নূরুল ফজল বুলবুল কলাভবনের সভায় বক্তব্য রাখেন এবং সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি ঘোষণা পাঠ করেন।

৭ জানুয়ারী অব্যাহত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী খোলার আগেই আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। সারারাত বহিরাগত সশস্ত্রীরা ক্যাম্পাসে টহল দিতে থাকে এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করে নেয়।

১৬ জানুয়ারী দীর্ঘ একটানা ৫০ দিন সরকারী নির্দেশে বন্ধ থাকার পর খোলার প্রথম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অপরাজেয় বাংলার' পাদদেশে এক উন্মুক্ত ছাত্র,শিক্ষক,

কর্মচারীদের সভায় একক বক্তা উপাচার্য আবদুল মান্নান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বিরোধী কোনো নির্দেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় আর বন্ধ করা চলবে না। শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে তা প্রতিহত করা হবে।

তিনি বলেন, অতীত ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, কোনো জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে প্রথমে শিক্ষাঙ্গন, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করা হয়েছে। উপাচার্য দুঃখ করে বলেন, গত সাড়ে ৭ বছরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাড়ে ৪ বছরই বন্ধ ছিল। দেশের মেধাবী তরুণদের মাত্র দশ ভাগকে ভর্তি করেও সময়মতো তাদের বের করে দেয়া যাচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন (১৫ জানুয়ারী) ২২ ছাত্র সংগঠন এক সভায় শিক্ষক-কর্মচারীদের এরশাদ ঘোষিত নির্বাচনের কার্যক্রমে অংশ না নেওয়ার আহবান জানায়। তারা সংসদ নির্বাচনের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করতে না দেওয়ার জন্যেও আহবান জানায়।

শিল্পীদের টেলিভিশন বর্জন

১০৫ জন উপস্থাপক, কবি, আবৃত্তিকার, নৃত্যশিল্পী, নাট্যশিল্পী ও সঙ্গীতশিল্পী এক যুক্ত বিবৃতি দিয়ে জনগণের বিরোধিতা করায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের সকল অনুষ্ঠান বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিবৃতিতে শিল্পীরা বলেন, ২৬ ডিসেম্বর থেকে কয়েকজন অভিনেতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে এবং দুটি সিরিজ নাটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে স্বাক্ষর করেন, ড. আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কলিম শরাফী, সানজিদা খাতুন, গোলাম মুস্তফা, রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, আলী যাকের, ফেরদৌসী মজুমদার, পীযুশ বন্দ্যোপাধ্যায়, আসাদুজ্জামান নূর, হুমায়ুন ফরিদী ও সুবর্ণা মুস্তফা প্রমুখ।

২৪ জানুয়ারী (১৯৮৮)ঃ চট্টগ্রাম ঘটনা

২৪ জানুয়ারী (১৯৮৮) চট্টগ্রামে ঘটে এক মর্মান্তিক ঘটনা। এদিন চট্টগ্রামে ৮ দলীয় জোটের জনসভায় যোগদানের জন্যে ঢাকা থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, সাইফউদ্দিন মানিক, আবদুর রাজ্জাক, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, দিলীপ বড়ুয়া প্রমুখ বিমানযোগে পতেঙ্গা বিমানবন্দরে নামলে লাখো জনতা তাঁদের প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানায়। বিমানবন্দর থেকে বিপনীবিতান পর্যন্ত ৮ দলের নেতাদের শোভাযাত্রা পৌছতে সাড়ে ৪ ঘন্টা সময় লেগে যায়।

বিকেলে নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামে নির্ধারিত সভায় যোগদান করতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয় এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ মধ্যযুগীয় তান্ডবলীলা চালাতে শুরু করে এবং গুলী চালায়। এতে শত শত লোক আহত হয় এবং সরকারী হিসেব মতেই ৫ জন মারা যায়। নিহতের সংখ্যা এতো বেশী ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, সাক্ষ্য প্রমাণ না রাখার জন্যে চট্টগ্রামে মৃতের সৎকার্যে নিয়োজিত অভয় মিত্র মহাশ্মশানের ডোম কালু মিয়াকে পর্যন্ত সরকার আত্মগোপন করে রাখে। শেখ হাসিনা দাবী করেন, পুলিশ তাঁকে লক্ষ্য করেই গুলী ছুঁড়েছিল। একজন তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আত্মাহুতি দেয়।

দৈনিক খবর মন্তব্য করে, ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চের পর বন্দরনগরী চট্টগ্রামে রাজনৈতিক কারণে এতো ব্যাপক প্রাণহানি ও রক্তক্ষয় ইতিপূর্বে আর ঘটেনি।২৯

২৬ জানুয়ারী সারাদেশে চট্টগ্রামের এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ৩০ জানুয়ারী ঢাকায় তিন জোট জাতীয় শোক দিবস পালন করে। চট্টগ্রাম হত্যাকান্ডের শোককে শক্তিতে পরিণত করার আহবান জানিয়ে মৌন মিছিলেও শ্লোগান উচ্চারিত হয় 'এ মিছিল কারো নয়, জনতার জনতার'।

বি.এন.পি. নেত্রী খালেদা জিয়াও এই মৌন মিছিলে অংশ নেন। অন্যান্যর মধ্যে ড. কামাল হোসেন, আবদুল মান্নান, মহিউদ্দীন আহমেদ, সাইফউদ্দীন আহমেদ মানিক, পংকজ ভট্টাচার্য, রাশেদ খান মেনন প্রমুখও এতে অংশ নেন। কিন্তু শেখ হাসিনা রহস্যময় কারণে এতে যোগদানে বিরত থাকেন।

২০ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও গ্রুপ থিয়েটার সমন্বয় পরিষদ যৌথ উদ্যেগে বাংলাদেশ ব্যাংক সংলগ্ন শহীদ উদ্যানে ২৪ জানুয়ারীর চট্টগ্রাম হত্যাকান্ডে শহীদদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে। ২২ ফেব্রুয়ারী সরকারী অনুচররা স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙ্গে ফেলে।

২৯ জানুয়ারী জাতীয় পার্টির মহাসচিব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এক বিবৃতিতে চট্টগ্রামের ঘটনার সাথে বিদেশী এজেন্ট ছিল বলে দাবী করেন।

এই সময় জেনারেল এরশাদ ইটালীর রোমে এক সরকারী সফরে ছিলেন। বিদেশী সাংবাদিকরা তাঁকে এই হত্যাকান্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে এরশাদ বলেন, এই ধরণের রাজনৈতিক হত্যাকান্ড তৃতীয় বিশ্বের একটি সাধারণ ঘটনা।

ড. কামাল হোসেন এক বিবৃতিতে স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি এরশাদের এই উক্তিকে নির্লজ্জ এবং অমানবিক বলে নিন্দা করেন। ৩০ জানুয়ারী তিন জোটের ন লিয়াঁজো

কমিটি চট্টগ্রামের ঘটনা সম্পর্কে শাহ মোয়াজ্জেমের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলে, আন্দোলনে বিদেশী এজেন্ট খোঁজার নজির এই দেশে নতুন কিছু নয়।

ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ২৯ জানুয়ারী ২২ ছাত্র সংগঠন চট্টগ্রামের ঘটনার স্মরণে এক শোক সভার আয়োজন করে। এতে ঘটনায় ১৯ জন শহীদের নাম পড়ে শোনানো হয়।

শোকসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে কবি মোহাম্মদ রফিক বলেন, এরশাদের কার্যকলাপে ইতিহাসের কিছু জঘণ্য শাসকের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই এরশাদের পরিণতিও তাদের মতোই হবে। সভাপতির ভাষণে ছাত্রনেতা সুলতান মোহাম্মদ মনসুর বলেন, 'যারা আমাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, আমরাও তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নেব'।

এরশাদকে 'বিশ্ব বেহায়া' খেতাব প্রদান

দ্বিতীয় জাতীয় কবিতা উৎসব (১৯৮৮) ঢাকায় শুরু হয় পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে। ০২ ফেব্রুয়ারী প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান অনুষ্ঠানস্থলে কবি রবীন্দ্র গোপের ডায়রীতে একটি স্বৈরাচারী মুখ আঁকেন। এরপর শিল্পী কবি মোহাম্মদ সাদিকের অনুরোধে একটি আত্মপ্রতিকৃতি আঁকেন এবং নিজ হস্তে লেখেন, 'বাংলাদেশ এখন বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে আছে'। এরপরই শিল্পী কামরুল হাসান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সেই থেকে জেনারেল এরশাদ 'বিশ্ববেহায়া' খেতাবে ভূষিত হন।

পয়লা ফেব্রুয়ারী কবি সুফিয়া কামাল দ্বিতীয় কবিতা উৎসব উদ্বোধন করে বলেন, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আত্মা যখন প্রতিবাদী হয় তখনই শৃঙ্খল মুক্ত হওয়া যায়। সভাপতির ভাষণে কবি শামসুর রাহমান বলেন, যে সরকারের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য অস্বীকৃত, সে সরকারকে এ দেশের কবি গোষ্ঠী স্বীকার করে না।

বাংলাদেশ ইনসটিটিউট অব টেকনোলজী, ঢাকা-র ১১৭ জন ছাত্র ২ ফেব্রুয়ারী দৈনিক সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে শপথ গ্রহণ করে যে, বাংলাদেশ টেলিভিশন নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন না করা পর্যন্ত তারা আর টেলিভিশন দেখবে না।

ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু করে সারাদেশে শুরু হয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে ঢালাওভাবে অস্ত্র, বোমা, ছিনতাই, অপহরণ, গুলীবর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি নাশকতামূলক ঘটনা ঘটে। শতাধিক নিহত সহ পাঁচ হাজারের বেশী আহত হয় বলে সংবাদপত্রের খবরে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের

নির্বাচনের ইতিহাসে এর আগে কখনো এতো ব্যাপক কারচুপি ও ভোটডাকাতি ঘটেনি। গণতন্ত্রের পরম পদ্ধতি ভোট প্রদান পদ্ধতিকেও এমনিভাবে এরশাদ সরকার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধ্বংস করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারী তিন জোট তাদের ঢাকা সমাবেশে ২২ ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ দিনের অভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে একটানা ৩৬ ঘন্টা সর্বাত্মক কর্মসূচী (হরতালের) ডাক দেওয়া হয়।

হাসিনা–খালেদা যুক্ত ঘোষণা

২৬ ফেব্রুয়ারী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া এক ঐতিহাসিক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী তা জাতীয় দৈনিক সমূহে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ এতে মধ্যস্থতা করেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে দুই নেত্রীর এটাই প্রথম যুক্ত কার্যক্রম।

বিবৃতিতে দুই নেত্রী বলেন, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির চির অবসান ঘটিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের আহবানে সাড়া দিয়ে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাদের নাগরিক দায়িত্ব।

২৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৮) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পেশাজীবী সমাবেশে ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের সামান্যতম দেশপ্রেম থাকলে জাতিকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দেবেন না, পদত্যাগ করুন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, যত তাড়াতাড়ি এই সরকারের পতন ঘটবে, দেশ ও জাতির ততো মঙ্গল হবে। দেশ এখন ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌছে গেছে।

ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পেশাজীবীদের আন্দোলনের সমর্থনে ধ্বনি দিয়ে মিছিল করে।

ডাক্তাররা তাদের ২১ দফা দাবীর সমর্থনে সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত সারাদেশে কর্মবিরতি পালন করে।

২৮ ফেব্রুয়ারী জেনারেল এরশাদ ফরিদপুরের আটরশিতে বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের হযরত মাওলানা খাজা বাবা শাহ সূফী এনায়েতপুরী নকশবন্দীর ওরস শরীফে অংশ নিয়ে এক সমাবেশে বলেন, বাংলাদেশ দশ কোটি মুসলমানের দেশ, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্মের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

তিনি বলেন, জনগণের সহযোগিতায় ইসলাম একদিন রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এরশাদ আক্ষেপ করে বলেন, বর্তমান কালের ইসলামের শ্রেষ্ঠ সাধক

পুরুষের দোয়া চাওয়ার জন্যে তিনি এখানে এসেছেন। অথচ এখানে আসার জন্যে আমাকে সমালোচনা শুনতে হয়েছে।

২২ ছাত্র সংগঠনে ভাঙন

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহ ও মার্চের প্রথম সপ্তাহে (১৯৮৮) ২২ ছাত্র সংগঠনে তীব্র অন্তবিরোধ দেখা দেয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্র জোটের সংগঠগুলি মিলে ২২টি ছাত্র সংগঠনের জোট গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় ও দলীয় প্রশ্নে এই সময় ছাত্রদের বৃহত্তম জোট ২২ সংগঠনে বিরোধ দেখা দেয় এবং ভেস্তে যায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী নিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অস্বীকৃতি জানায়। ফলে কর্মীদের অব্যাহত চাপের মুখেও ২২টি ছাত্র সংগঠন শিবিরের বিরুদ্ধে কোন কর্মসূচী ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে বাদ দিয়ে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রী প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃত্বে নতুন করে ১৬ সংগঠনের জন্ম হয় এবং ৫ মে সারাদেশে আলাদাভাবে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশ আহবান করে।

ছাত্রদলের সাথে ১৬ সংগঠনের আরো কতকগুলি বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এর আগে ৯ মার্চ ছাত্রদল নেতা মাহাবুবুল হক বাবলুর মৃত্যুবার্ষিকী ২২ দলের যৌথভাবে পালনের প্রস্তাব ১৬ সংগঠন নাকচ করে দেয়। তাদের মতে, বাবলু নিজেই বোমা বানাতে গিয়ে মারা গেছে। সুতরাং তার মৃত্যুবার্ষিকী যৌথভাবে পালনের প্রশ্ন ওঠে না।

ছাত্রদল ২২ সংগঠনের নামে বাবলুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে পোস্টার ছাপালে ২২ দল প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে তার নিন্দা করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পোস্টারটি প্রত্যাহার করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সানাউল হক নীরুসহ ৯ জন ছাত্রদল নেতাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের প্রশ্নেও ২২ ছাত্র সংগঠনে মতভেদ দেখা দেয়। ১৬ ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক নীরুদের বহিষ্কার সমর্থন করে। কিন্তু ছাত্রদল তাদের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে আন্দোলন করতে চায়।

এই সকল মতবিরোধকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলনে আবার বিভক্তি আসে এবং বিরোধ কোথাও কোথাও সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়।

আ.স.ম. রবকে 'ক্লাউন' খেতাব প্রদান

৩ মার্চ (১৯৮৮) দেশে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী আন্দোলনের মুখে দেশে ২৭ নভেম্বর (১৯৮৭) জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এরশাদ সরকার আরেকবার টিকে যায় এবং ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সালের ৭ মে নির্বাচিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয় এবং নতুন নির্বাচন ঘোষণা করে।

এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই প্রথম বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলি যোগ দেয়নি এবং এই প্রথম সংসদ নির্বাচনের দিন হরতাল পালিত হয়। নির্বাচন বয়কটকারী সকল প্রধান বিরোধী দলগুলি এই হরতালের ডাক দেয়। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর বিরোধীদল বর্জিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ও হরতাল পালিত হয়েছিল।

১৯৮৮ সালের এই সংসদ নির্বাচন ছিল একেবারেই পাতানো। অধিকাংশ আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সরকারী দল ও তাদের সমর্থক জাসদ (রব), জাসদ (সিরাজ), ফ্রিডম পার্টির সদস্যরা কোটা বেধে পাশ করে।
এই সময়ে (১৯৭৩ সালে), আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনীতির 'বিপ্লবী কণ্ঠ' বলে কথিত আ. স.ম আবদুর রব এক মজার ঘটনার জন্ম দেন নির্বাচন উপলক্ষে। তিনি নাম সর্বস্ব ৭২টি রাজনৈতিক দলের জন্ম দেন এবং সম্মিলিত বিরোধী দল নামে একটি মোর্চা গঠন করেন। জেনারেল এরশাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তিনি সংসদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ৭৩ সালে এক জনসভায় আ. স. ম. রব জাতীয় সংসদকে অবমাননা করে একে 'শুয়োরের খোয়ার' বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে তিনিই 'শুয়োরদের' নেতা হয়ে সংসদে বসেন।

আ. স. ম. আবদুর রব, বিরোধী দলগুলো থেকে সরকারের 'গৃহপালিত বিরোধী দলের নেতা' আখ্যা পান। এমনকি জাতীয় পার্টি ও সরকারের উর্দ্ধতন নেতাদের কাছ থেকেও তিনি অপমানজনক খেতাব পেতে থাকেন। উপপ্রধানমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ এম. এ. মতিন ২৫ মে জাতীয় সংসদে আ.স.ম. রবকে 'ক্লাউন' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন,

Mr. Rab had played the Role of a clown in the third Jatiya Sangsad and being an opposition leader loyal to the goverment he is how triying to play to the gallery. People Know him too Well"

প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদও আ. স. ম. রবকে কার্যকরী বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের আহবান জানান। সংসদে এই সময় সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরাও

তাদের পক্ষে দালালী ছাড়ার জন্যে রবকে টেবিল চাপড়িয়ে পরামর্শ দেন। বস্তুত বিরোধী দলের আসনে বসেও জাসদ নেতা আ. স. রব সরকার দলীয়দের চেয়েও এতো বেশী সরকার সমর্থক হয়ে পড়েছিলেন যে, জাতীয় পার্টির সরকারের কাছেও এই নিলর্জ্জতা ধরা পড়ছিল।

আওয়ামী লীগের সভায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ণ

২৪ মার্চ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়। এতে বলা হয়ঃ

১. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা এবং তারপরে কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে যে প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা শুরু হয়েছিল, বিগত একযুগ তা লাগাতারভাবে অব্যাহত আছে।

২. ১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে বি. এন. পি ও ৫ দলের শেষ মুহূর্তের বিরোধিতার মুখেও জাতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোটকে দৃঢ় চিত্তে রায় দিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু ভোট ডাকাতি এবং তাতেও পূর্ণ সফলতা না পেয়ে মিডিয়া ক্যু করে সরকার সেই বিজয় ছিনিয়ে নেয়।

৩. কিন্তু গণতন্ত্রের মুখোশধারী দলগুলো নির্বাচন বয়কটের নামে গোপনে সামরিক স্বৈরাচার এরশাদকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

৪. ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যু করে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার পরও যেটুকু শক্তি জাতীয় সংসদে ৮ দলের অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে জুলাই মাসে জেলা পরিষদ বিলকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। বাজেটে আরোপিত কিছু কিছু কর প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য করা হয়।

৫. কিন্তু বিরোধীদলে অবস্থানকারী একটি মতলবী গোষ্ঠী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নামে সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ, এক মঞ্চের আন্দোলন ইত্যাদি মুখরোচক শ্লোগান তুলে বিভ্রান্তী সৃষ্টি করতে প্রয়াস পায়।

৬. স্বৈরশাসক এরশাদও এই ক্ষুদ্র ক্ষমতার সংসদকে সহ্য করতে পারছিল না। কুচক্রীদের সাথে তাল মিলিয়ে সেও ৮৬ সালে নির্বাচিত সংসদ বাতিল করে।

৭. ৮৬ সালের সংসদ বাতিল করে এরশাদ ৩ মার্চ (১৯৮৮) আরেকটি পুতুল সংসদ গঠন করে (যদিও শতকরা একভাগ ভোটারও ভোট দিতে যায় নি)।

এই পুতুল সংসদ দ্বারা এরশাদ রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিল উথাপন করছে এবং দেশকে প্রতিক্রিয়ার শেষ সীমায় পৌছে দিচ্ছে।

বস্তুত আওয়ামী লীগ কর্তৃক চলমান আন্দোলনের এই মূল্যায়ন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৮৬ সালের সংসদ ভেঙে দেওয়ার পর এরশাদ ৮৮ সালে আ. স. ম. রবকে পুতুল বিরোধী দলের নেতা বানিয়ে ৮ম সংশোধনী পাশ করে দেশকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানে নিয়ে পৌছায়, যা থেকে ফিরে আসা প্রগতিকামী মানুষের জন্যে এক অসহনীয় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

২৫ মার্চ কেন্দ্রীয় ১৬ ছাত্র সংগঠন এক যুক্ত বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনের নিয়োগ আদেশ বাতিল করে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপাচার্য নিয়োগের দাবী জানায়। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের মতামতকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান সংকটকে জিইয়ে রেখে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে নিয়ম নীতি লঙ্গন করে পূর্বে অভিযুক্ত বিতর্কিত ব্যক্তি মোহাম্মদ আলীকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

৪ মে ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এক ছাত্র সমাবেশে অভিযোগ করে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসে মদদ দান করছে। এসব শিক্ষক যদি অবিলম্বে তা বন্ধ না করে তাহলে তারা কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের টাকা খেয়ে রাজনীতি করছে সে সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে। এমনকি, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে কোন প্রচেষ্টায় শিবির কর্মীরা বাধা দেবে এবং এ জন্যে প্রস্তুতি রয়েছে ৭১ সালের মতোই।

রাষ্ট্রধর্ম বিল ও ছাত্র বিক্ষোভ

৩১ মে (১৯৮৮) চতুর্থ জাতীয় সংসদে জেলা পরিষদ বিল গৃহীত হয়। এর আগে তৃতীয় জাতীয় সংসদেও এই বিল উথাপিত হয়েছিল। কিন্তু ৮ দলের সদস্যদের বিরোধিতার মুখে সরকার তা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ৮ দল জেলা পরিষদে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি রাখার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। জাতীয় পার্টি অবশ্য এবার সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি থাকার বিষয়টি বাদ দিয়েই সংসদে নতুন করে বিলটি উথাপন করে। কিন্তু আ. স. ম আবদুর রব সংসদে এর বিরোধিতা করে বলেন, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জেলা পরিষদে রাখতেই হবে। এরপর রব অধিবেশন 'ওয়াক আউট করেন।

ইসলামধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করে, সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে ১১ মার্চ জাতীয় সংসদে একটি বিল উথাপিত হয়। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা মহানগরী বিক্ষুদ্ধ হয় ওঠে এবং তাৎক্ষণিক খন্ড খন্ড মিছিল বের হতে থাকে।

কেন্দ্রীয় ১৬ ছাত্র সংগঠন, স্বৈরাচার ও জামায়াত-শিবির সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিল করে। তারা রাষ্ট্রীয় ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক বিল প্রতিহত করার শপথ নেয়। চট্টগ্রামেও ১৬ ছাত্র সংগঠন অনুরূপ কর্মসূচী নেয়।

প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্যোগে সারাদেশেই তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। তবে বি.এন.পি, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির এ প্রশ্নে নীরব থাকে, বরং পরোক্ষ সমর্থন ব্যক্ত করে।

পয়লা জুন ১৬ ছাত্র সংগঠন, ২ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিক্ষোভ ও সমাবেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। তারা দেশের ধর্মভিরু মুসলমানদের অনুভূতিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের নিন্দা করে।

পয়লা জুন ১৬ ছাত্র সংগঠন ১৯৭১ সালের নরঘাতক ও জামায়াত নেতা গোলাম আজমকে দেশ থেকে বহিষ্কারের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দেয়। তারা গোলাম আজমের বিচার ও দাবী করে।

পয়লা জুন ১৬ সংগঠনের সভায় ছাত্র নেতারা বলেন, আসুন ভন্ড ইসলাম ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধ করি, স্বাধীনতার শত্রু জামায়াত-শিবির চক্র ও তাদের সহযোগী সরকারের হাত থেকে দেশকে বাঁচাই।

ছাত্রনেতা জহিরুদ্দিন স্বপনের সভাপতিত্বে এই ছাত্র সভায় বক্তব্য রাখেন মুশতাক হোসেন, তাহের উল্লাহ, ইনায়েতুর রহিম, আশরাফুল হক মুকুল, সগীর আনোয়ার, মাসুদুর রহমান মাসুদ, মোশারেফা মিশু, আখতার সোবহান মাশরু, আবেদ রাজা, ফয়জুল হাকিম, আমিরুল্ল হক আমিন, আহসানুল আলম।

বাংলাদেশে ছাত্র মৈত্রীর রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সভাপতি জামিল আখতার রতনকে ৩১ মে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা রামদা ও চাপাতি দিয়ে হত্যা করে।

এর প্রতিবাদে ও রাষ্ট্রধর্ম বিল প্রতিহত করার শপথ নিয়ে ছাত্ররা ৬ জুন সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট পালন করে রাজশাহীতে পয়লা জুন ৮ দল, ৫ দল ও ইউনাইটেড

কমিউনিষ্ট লীগের উদ্যোগে রতনের হত্যার প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। পরে ফেরদৌস কামাল মাসুমের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২২ ছাত্র সংগঠন আবার ভেঙে যাওয়ায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃত্বে সংগ্রামী ছাত্র জোট আবার গঠিত হয়। তারা ৮ম সংশোধনী বিল বাতিল ও নীরুর মুক্তির দাবীতে ৫ জুন সারাদেশে ধর্মঘট পালন করে।

৪ জুন রাজশাহীতে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রকাশ্যে রাজপথে মিছিল করে। দৈনিক খবর ৫ জুন রিপোর্ট করে যে, শিবিরের মিছিলের পরে মসজিদ থেকে পুলিশ অস্ত্র উদ্ধার করে।

৮ দল নেত্রী শেখ হাসিনা ১৬ জুন রাজশাহীতে শিবিরের হাতে নিহত ছাত্রমৈত্রী নেতা জামিল আখতার রতনের কবর জেয়ারত করেন এবং সেখানে এক সমাবেশে বলেন, জামায়াত-শিবির সরকারের সাথে আতাঁত করে মাঠে নেমেছে। বিরোধী রাজনীতির নামে বি.এন.পি জামায়াত-শিবিরকে সমর্থন দিচ্ছে। এরা সবাই সরকারকে সহায়তা করছে। শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী এনে বি.এন.পি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুযোগ করে দেয়।

ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের নেতা ও সাবেক ছাত্রনেতা, রাকসুর সহসভাপতি ফজলে হোসেন বাদশা এই সময় শেখ হাসিনার সাথে উপস্থিত ছিলেন।

জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা উপপ্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ ৬ জুন জাতীয় সংসদে রাষ্টধর্ম বিলের উপর সাফাই গাইতে গিয়ে বলেন, এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই এ বিল আনা হয়েছে। তিনি বলেন, ইসলামকে রাষ্টীয় ধর্ম বিল করা প্রস্তাব উথাপন করে আমরা নতুন কিছু করিনি। এ দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের ধ্যান-ধারণাকে তার যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাবার জন্যে এ বিল আনা হয়েছে। কাজী জাফর আরো বলেন, ইসলামকে রাষ্টীয় ধর্ম করার দুইটি মূল উদ্দেশ্য আছে। ধর্মকে জাতীয় স্বীকৃতিতে আমরা ভূষিত করতে চাই এবং পাশাপাশি এ বিলের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের সাথে ধর্মকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছি। আমরা বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি না। আমরা বাংলাদেশী।

এক সময়ের বামপন্থী বলে কথিত কমিউনিস্ট আর্দশের তথাকথিত সাবেক কমরেড কাজী জাফর এই প্রতিক্রিয়াশীল বিলের পক্ষে বলতে নিয়ে মার্ক্স-লেনিন-মাও সে তুং-য়ের কথা উচ্চারণ করতেও ভুল করেন না। তিনি বলেন, লেনিন কমিউনিস্ট পার্টিতে মুসলমানদের পার্টির সদস্য পদ লাভের বিধান করে প্রকারান্তরে ইসলামের

প্রগতিশীল ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, আর মাও সে তুং, লং মার্চের এক পর্যায়ে ইয়ে সম্প্রদায়, যারা ছিল মুসলমান, তাদের এলাকার সন্নিকটে আসার পর রেড আর্মির প্রতি যে দশটি নির্দেশ জারী করেছিলেন তার অন্যতম প্রধান নির্দেশ ছিল, এই মুসলিম অঞ্চলে থাকাকালীন সময়ে শূকর জবাই করা ও শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ থাকবে।

ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম ও হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন সংক্রান্ত শাসনতন্ত্রের অষ্টম সংশোধনী ৭ জুন (১৯৮৮) পুতুল সংসদে নাম মাত্র বিরোধীতায় গৃহীত হয়ে যায়।

এভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের শেষ অবস্থানটিকেও ধূলিস্মাৎ করা হয়। এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বি.এন.পি আমলে স্বয়ং জেনারেল জিয়াউর রহমান।

সংবিধানের এর পূর্বের সাতটি সংশোধনী ছিল নিম্নরূপঃ

প্রথম সংশোধনী, ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে, জাতীয়করণ আইনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আপত্তি অধিকার বিষয়ে।

দ্বিতীয় সংশোধনী, ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বরে গৃহীত হয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও জরুরী অবস্থা জারীর বিধান স্থাপন করে।

তৃতীয় সংশোধনী, ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর আওয়ামী সরকারের আমলে বাংলাদেশের সীমানা চিহ্নিত সংক্রান্ত বিষয়ে যা বেরুবাড়ী ও তিনবিঘাকে নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

চতুর্থ সংশোধনী ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী, বাকশাল সরকার আমলে মাত্র ১১ মিনিটে পাশ করে নেওয়া হয়। এতে সংসদীয় পদ্ধতি সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের ব্যবস্থা করা হয়।

পঞ্চম সংশোধনী ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল সংসদে গ্রহণ করা হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আমলে। প্রকৃতপক্ষে, পঞ্চম সংশোধনী একটি মাত্র সংশোধনী হলেও এর মধ্যে ৭৫ সালের সামরিক হস্তক্ষেপের পর থেকে বিপুল পরিমাণ যেসব অধ্যাদেশ জারী করা হয় তার সবই বৈধ করা হয়। এর ফলে মূল সংবিধান একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

এর মধ্যে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যার বিচার করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতিও বদলানো হয় এতে, বাঙালী জাতীয়তাবাদের বদলে

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে, ধর্ম নিরপেক্ষতার বদলে 'বিসমিল্লাহির র াহমানির রাহিম' যুক্ত হয়, সমাজতন্ত্র শব্দ কেটে সামাজিক ন্যায় বিচার ইত্যাদি লেখা হয়।

বস্তুত জিয়াউর রহমানের পঞ্চম সংশোধনীর এই সর্বনাশা পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের অব্যাহত প্রতিক্রিয়ার দিকে যাত্রা শুরু হয়। যে দীর্ঘ সংগ্রাম, যুদ্ধ, আন্দোলন ও রক্তের মধ্য দিয়ে এই মহান আদর্শগুলি বাংলার মানুষ সঞ্চিত করে তুলেছিল সেই আদর্শের সাথে এই সব জেনারেলদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ৫২ সালে, ৬২ সালে, ৬৯ সালে যখন বাংলার মানুষ রক্ত দেয়, তখন এই জেনারেলরা পাকিস্তানে বসে 'লেফট-রাইট' করছিলেন, দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ত্যাগ-তিতিক্ষার বিষয় তাদের চেতনায় ছিল অনুপস্থিত। পরবর্তী শাসক জেনারেল এরশাদ ছিলেন এই ব্যাপারে প্রচন্ড কূটকৌশলী।

ষষ্ঠ সংশোধনী গৃহীত হয়েছিল বি.এন.পি আমলেই। বিচারপতি সাত্তারকে উপরাষ্টপতি হিসেবে যখন রাষ্টপতির দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন আসে।

সপ্তম সংশোধনীও জেনারেল জিয়ার আমলের পঞ্চম সংশোধনীর মতো, সামরিক আইনের বিভিন্ন অধ্যাদেশকে হালাল করার জন্যে গ্রহণ করা হয়েছিল, জেনারেল এরশাদের স্বেচ্ছাচারে যা ঘটানো হয়েছিল।

অষ্টম সংশোধনী বিল যখন সংসদে গৃহীত হচ্ছিল, তখন সমগ্র ঢাকা মহানগরী এর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অনেক গাড়ী ও দোকানে আগুন জ্বলতে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ এই বিলের পক্ষে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও তাদের পক্ষের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। স্বয়ং জেনারেল এরশাদ তাঁর এই ভাষণ শোনার জন্যে সংসদ ভবনের ৮ তলায় রক্ষিত রঙিন গ্লাস কক্ষে বসে অবস্থান করে।

'আল্লাহর বিরুদ্ধে হরতাল'

বিরোধী তিন জোট অষ্টম সংশোধনীর বিরুদ্ধে ১১ জুন (১৯৮৮) সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস ও হরতালেরও ডাক দেয়।

১০ জুন জেনারেল এরশাদ লালবাগ মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতে গিয়ে মুসল্লীদের মোনাজাতের সময় আটকে মসজিদে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন। তিঁনি বলেন, এই সংশোধনী বাতিল করে ইসলামকে নির্বাসনে পাঠাতে দেব না। আল্লাহ, বিরোধী নেত্রীদের হেদায়েত করবেন।

এরপর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে স্বয়ং আল্লাহকেও জড়িয়ে ফেলেন। তিনি বলেন, বিরোধী দল আল্লাহর বিরুদ্ধে হরতাল ডেকেছে।

আর এরশাদ নিজে আল্লাহর মদতেই ক্ষমতায় আছেন এই রকম ভাব থেকে উল্লেখ করেন, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ ক্ষমতায় থাকতে পারেনা।

১৬ ছাত্র সংগঠন রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিল পাশের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের অংশ হিসেবে ১১ জুন অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক সমাবেশে ঘোষণা করে, ধর্মের জিগির তুলে এ সরকার শেষ রক্ষা করতে পারবে না। ছাত্ররা বলে, রাষ্ট্রধর্ম বিল পাস করে সরকার ৫২-র ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে আঘাত করেছে। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ছাত্র সমাজ এ আঘাত বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেবে না।

একই দিন আটরশির পীর সাহেব ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে মোনাজাত করেন।

গোলাম আযম বিতর্কে আলেম সমাজ

জুন (১৯৮৮) মাসের মাঝামাঝি জামায়াত নেতা গোলাম আজম আবার রাজনীতিতে শিরোনাম হয়ে উঠেন। চট্টগ্রামের ২৫১ জন পীর মাশায়েখ এক বিবৃতিতে ১১ জুন বলেন, '১৯৭১ সালে গোলাম আজম বহু বুদ্ধিজীবী ও হাক্কানী ওলামা হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করেছিলেন। এর জন্যে তিনি কখনো অনুতপ্ত হন নি এবং বিদেশী পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে অবস্থান করে চলেছেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী ছাত্র শিবির গত ৮ বছরে চট্টগ্রামে ২০টি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড করেছে। এছাড়াও এরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের নামে নিত্য নতুন কারবালা ঘটিয়ে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।

'মূলতঃ গোলাম আজমের পৃষ্ঠপোষকতায়ই দেশে আজ নব্য রাজাকার ও আল বদর বাহিনী সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থায় দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত গোলাম আজমকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া প্রয়োজন।

২৫১ জন আলেম আরো বলেন, 'গোলাম আজমের অনুসারীরা তাঁকে আন্তর্জাতিক ইসলামিক চিন্তাবিদ বলে বেড়াচ্ছে। অথচ গোলাম আজম ইসলামী চিন্তাবিদদের শ্রেণীভুক্ত নন। কারণ তার না আছে কোনো মাদ্রাসার ডিগ্রী, না আছে ইসলামী গবেষণা। ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানহীন এই লোকটি নিজেকে সব জান্তা মনে করেন। আত্মপ্রচারের জন্যে তিনি ইসলামের নামে যে সব বই-পুস্তক লিখেছেন তাতে তিনি ইসলামকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছেন।

বিবৃতিতে যেসব পীর ও আলেম স্বাক্ষর করেন, তাঁরা হচ্ছেন, পীরে কামেল আল্লামা মুসা মোজাদ্দেদী, আল্লামা নূরুল ইসলাম হাসেমী, আল্লামা সৈয়দ শামসুল হুদা, আল্লামা আবদুল কুদ্দুস, আল্লামা নূরুল সাফা নঈমী, অধ্যক্ষ মাওলানা সামুসল হুদা, আল্লামা জালালুদ্দীন চৌধুরী, অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দিন, অধ্যক্ষ মাওলানা আজিজুল হক চৌধুরী, অধ্যক্ষ মাওলানা জাফর আহমদ সিদ্দিকী, অধ্যাক্ষ মাওলানা ইকবাল মোজাদ্দেদী, অধ্যক্ষ আবুল হাশেম, অধ্যক্ষ আবুল বশর, মুফতী ওবায়দুল হক প্রমুখ।[৩০]

জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আজম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন এবং পাকিস্তানকে রক্ষা ও মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার উদ্দেশ্যে তিনি আল বদর বাহিনী গঠন করেন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের ঠিক দু'দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর আল বদররা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের জবাই করে হত্যা করে। ১৯৭২ সালে এই অপরাধে পাকিস্তানে পলাতক গোলাম আজমের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। কিন্তু ১৯৭৮ সালের ১৬ জুলাই তৎকালীন বি.এন.পি সরকার প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান গোলাম আজমকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পর নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতে ইসলামীর (১৯৭৯ সালের মে মাসে এক কনভেনশনের মাধ্যমে) পুনরাবির্ভাব ঘটাতে তৎকালীন বি.এন.পি সরকার সহযোগিতা করে। গোলাম আজম গোপনে দলের আমীর নিযুক্ত হন, সেই থেকে আব্বাস আলী খানকে বলা হয় অস্থায়ী আমীর।

১৯৮০ সালের প্যালেস্টাইনের নিহত যোদ্ধাদের স্মরণে গায়েবানা জানাযায় গোলাম আজম অংশ নিতে আসলে মুসল্লীরা তাঁকে জুতাপেটা করে। তাঁকে জুতা দিয়ে পেটানোর ছবি পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয়।

হাসনা মওদুদের লাঞ্ছনা

২০ জুন (১৯৮৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এদিন ২৫ জন গ্রাজুয়েট সিনেট সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি সংশোধন সম্পর্কিত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের কথা ছিল। প্রত্যক্ষ ভোট না হয়ে তাকে এই ভোটদান পদ্ধতি থাকায় যে কোনো গোষ্ঠী দ্বারা এর অপব্যবহারের সুযোগ থাকে।

এই সংশোধনীটি যাতে পাশ না হতে পারে তার জন্যে সরকার থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়। সিনেটে জাতীয় সংসদ সদস্যদেরও প্রতিনিধিত্ব থাকে। সরকার প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদের স্ত্রী হাসনা মওদুদকে সিনেটে পাঠায়।

ছাত্ররা বলে, ১৯৮৮ সালের সংসদ ভোটার বিহীন নির্বাচনে গঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু হাসনা মওদুদ ঝুঁকি নিয়েই অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিনেট অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায় এবং ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ চলতে থাকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক তথ্য বিবরণীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ঘটনার সাথে জড়িত ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার আহবান জানান।

ভোটারবিহীন নির্বাচনে মনোনীত ১১১ জন সংসদ সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী অনুদান বন্ধের আহবান জানান।

১৬টি ছাত্র সংগঠন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যকে উদ্ধত্যপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করে।

মন্ত্রীর বাড়ীতে আবার খুনের আসামী

এরশাদ যখন ৮২ সালে বি. এন. পি সরকার উৎখাত করে ক্ষমতায় আসেন, তখন যুবমন্ত্রী আবুল কাশেমের বাড়ীতে খুনের আসামীকে গ্রেফতারের বিষয়টি অজুহাত করেছিলেন। সেই সময় স্বরাষ্টমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ মতিন। ২৫ জুন এরশাদ সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী কাজী ফিরোজ রশীদের বাড়ী থেকেও ৩ জন খুনের আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। সংসদে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ঘটনাক্রমে এবারও স্বরাষ্টমন্ত্রী ডাঃ মতিন এর সত্যতা স্বীকার করেন।

এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহল মনে করেছিল, সরকার বোধ হয় মন্ত্রিসভা থেকে কাজী ফিরোজ রশীদকে বহিষ্কার করবে কিন্তু কয়েকদিন পর উল্টো ফল ফলে। কাজী ফিরোজ রশীদ প্রতিমন্ত্রী থেকে পূর্ণ মন্ত্রীত্ব লাভ করেন।

শিল্পীদের উপর পুলিশের 'বীরত্ব'

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের শিল্পী, কলাকুশলী, প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক ও বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা ৩ জুলাই (১৯৮৮) সিনেমা হলে ক্যাপাসিটি ট্যাক্স পদ্ধতি বহাল রাখার দাবী সংবলিত একটি স্মারকলিপি জাতীয় সংসদের স্পীকারের কাছে দেয়ার জন্যে সংসদ ভবনের দিকে মিছিল নিয়ে যেতে চাইলে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী 'বীরত্বের সাথে' তাদের গতিরোধ করে এবং বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। এতে চলচ্চিত্র শিল্পী রাজ্জাক, সোহেল রানা, আলমগীর, হাসান ইমাম, সুমিতা দেবী, ইলিয়াস কাঞ্চন, চাষী নজরুল ইসলাম সহ বহু চলচ্চিত্র কর্মী আহত হন।

চলচ্চিত্র শিল্পী রাজ্জাক অভিযোগ করেন, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (উত্তর) সমবেত শিল্পীদের গালাগালি করতে থাকেন এবং নিজে লাঠি দিয়ে শিল্পীদের প্রহার ও করেন। থাকেন। তার নির্দেশে অন্যান্য পুলিশও লাঠিচার্জ করতে থাকে।

ঘটনা সম্পর্কে ঢাকা মহানগর পুলিশ দাবী করে, চলচ্চিত্র শিল্পীরা একজন উর্দ্ধতন অফিসারকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল।

পুলিশের কান্ডজ্ঞানহীন আচরণের নিন্দা করে ডাকসু, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, ক্রান্তি, গণছায়া, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, টেলিভিশন নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী সংসদ বিবৃতি দেয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ও জাসদ (ইনু) নেতা আমিরুল ইসলা জালালকে জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা ১০ জুলাই বাড়ী থেকে ধরে এনে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে হাত-পা কেটে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। পরদিন এই হত্যার প্রতিবাদ মিছিল চলাকালে পুলিশ মিছিলে ট্রাক ও ভ্যান তুলে দিয়ে ছাত্রদের পিষিয়ে মারতে চায়। সাবেক ছাত্রনেতা ফজলে হোসেন বাদশা, রাগিব আহসান মুন্না, সুশান্ত সরকার, মাশুক টিপু সহ কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়।

'মুক্তিযুদ্ধে আলেম সমাজ': সেমিনার

এদিন ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে 'মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের আলেম সমাজ' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন, ইসলাম হলো বিশ্ব ধর্ম। এটা রাষ্ট্রীয় ধর্ম করা মানে তাকে গন্ডীবদ্ধ করা। আর মিথ্যের উপর ভিত্তি করে যে সংসদ তৈরী করা হয়েছে, কি করে সেখানে পবিত্র ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করা হয়?

আলোচনা সভায় জাসদ (ইনু)-র অন্যতম সভাপতি কাজী আরেফ আহমেদ, মাওলানা মওদুদী, গোলাম আজম, শর্ষীনার পীর, আটরশির পীর প্রভৃতি পীরদের আস্তানা এখন রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধে মাওলানা আবু সফিয়ান বলেন, বাংলাদেশ আন্দোলন কখনো ইসলাম বিরোধী ছিল না। শোষক গোষ্ঠী ইসলাম প্রিয় সাধারণ মানুষকে ধোঁকা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে। ছাত্র নেতারা বলেন, ৭ জুলাই শিবির নামধারী সশস্ত্র দুষ্কৃত কারীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

অনুপ্রবেশ করে সাধারণ ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তারা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়। এই বিতাড়িতরা শহরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বাসের ওপর হামলা চালায় এবং অর্ধশতাধিক ছাত্রকে আহত করে। এমনকি বাস থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নামিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে লাঞ্ছিত করে। ছাত্রনেতারা বলেন, জামায়াত-শিবির চক্র এখন একটি ধর্ম উন্মাদ জল্লাদ বাহিনী হিসেবে জাতির কাছে পরিচিত।

ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল মতাদর্শগত লড়াই

জুলা(১৯৮৮) মাসের মাঝামঝি আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ (সু-র) এবং বি. এন. পিপন্থী ছাত্রদল নিজেদের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম তীব্রতর করে। এই সময় সারাদেশে উভয় সংগঠন পারস্পরিক সংঘর্ষ, হত্যা, খুন ইত্যাদি কঠিনতম বিষয়ে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে।

ছাত্রলীগ (সু-র)-এর সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান ১৬ জুলাই (১৯৮৮) এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির এরশাদ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে যোগ দিলেও এরা হামলা, নির্যাতন, সন্ত্রাসের মাধ্যমে আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করছে। সরকারী ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজ বিলুপ্ত হলেও এই দুই দল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারের স্বার্থে জাতীয় ছাত্র সমাজের ভুমিকাই পালন করছে।

ছাত্রলীগ আরো বলে, সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল জামায়াত-শিবির চক্র কখনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মিত্র হতে পারে না। সারাদেশে তারা বারবার মুক্তিযুদ্ধের শক্তির উপর বারবার আঘাত হানছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভাবে এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে কার্যত তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করছে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপন করে। এক বছর আগে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত মুন্না, হালিম ও রিক্সাচালক রহীমের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা জহিরুদ্দিন স্বপন, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, মোস্তফা ফারুক, নাজমুল হক প্রধান, শাহাবুদ্দিন, আবেদ রাজা, এনায়েতুর রহিম প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত করায় ছাত্রদলের সমালোচনা করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পরিবেশ পরিষদ গঠিত হওয়ায় সুবিধাবাদীরা এখন আর ডায়নিং হলে বিনা পয়সায় খেতে পারে না। প্রশাসনিক ভবনে টেন্ডার বাক্স ছিনতাই করতে পারে না। অবৈধভাবে হলে হলে সীট দখলে রেখে ছাত্রদের জোরপূর্বক দলে টানতে পারে না। ফলে তারা আজ পরিবেশ পরিষদকে চক্ষুশূল হিসেবে দেখছে।

ছাত্রনেতারা আরো বলেন, মুন্না-হালিম কে যারা হত্যা করেছে, তাদের নাম সরাসরি না বলে অনেকেই নানা ছলে, ইশারায় -ইঙ্গিতে, কবিদের মতো নানা উপমা দিয়ে তাদের কথা বলছেন। সরকারী সন্ত্রাসকারীদের নাম প্রকাশ্যে বলতে পারলেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভানকারী ও মুন্না-হালিমের আশ্রয়দাতা সংগঠনের নাম সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে। তাঁরা এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে হুশিয়ার করে দেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এর জবাব দেয়। ছাত্রদলের সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন ১৭ জুলাই বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সব সময় ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রাজনৈতিক কারণ ছাড়াই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন থেকে সরে গেছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দ্বৈতনীতির কারণেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্যাহত হয়েছে। তারা এ মুহূর্তে সরকারের বিরুদ্ধে মুখ্য আন্দোলন না করে হটাৎ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কথা বলে আন্দোলনের দৃষ্টি পাশ কাটানোর চেষ্টা করে।

ছাত্রনেতা রিপন বলেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ না করবেন, ততোদিন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদে ছাত্রদলের যোগাদান সম্ভব নয়। ছাত্রদল উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নানের পদত্যাগ দাবী করে এবং সানাউল হক নীরু সহ ৯ জন ছাত্রদল নেতাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদে ভাঙন

ছাত্র সংগঠনগুলির মতাদর্শগত বিরোধকে কেন্দ্র করে এভাবে শেষ পর্যন্ত ২২ ছাত্র সংগঠনে চরম বিরোধ দেখা দেয়। এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ যা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সন্ত্রাস এবং অস্ত্রধারীদের প্রতিরোধে গঠিত হয়েছিল তা মূলতঃ অকার্যকর হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, সন্ত্রাসকারীরাই তাদের সংগঠন সমূহে, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে প্রভাব বিস্তার করে অকার্যকর করে তোলে।

২০ জুলাই (১৯৮৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভায় সকল ছাত্র সংগঠন যোগ দিলেও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভায় যোগদানে বিরত থাকে এবং তাদের সভায় যোগদানের শর্ত হিসেবে ১২ দফা প্রস্তাব পেশ করে। ১২ দফায় ছাত্রদল বলে;

১. উপাচার্যকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে

২. সন্ত্রাসের অভিযোগে বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা নীরুসহ ৯ জন নেতার বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা।

৩. উপাচার্যের দূর্নীতির অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন করা

৪. সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ তদন্ত করা

৫. সিনেট অধিবেশন আহবান করা

৬. পরিবেশ পরিষদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া

৭. হাসনা মওদুদের উপর হামলার প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার, ইত্যাদি দাবী ছাত্রদল উথাপন করে।

বস্তুতঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল শিক্ষা পরিবেশ পরিষদে ফিরে আসার ব্যাপারে যে সব দাবী পেশ করে তা অনেক সংগঠনেরই দাবী ছিল এবং পরিবেশ পরিষদে ইতঃপূর্বে আলোচিতও হয়েছে।

কিন্তু সানাউল হক নীরু ও উপাচার্য সম্পর্কিত দাবী সম্পর্কে তাদের সাথে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিরোধ বাধে। এমনকি ছাত্রদল নেতৃত্বাধীন সংগ্রামী ছাত্রজোটেও এ নিয়ে ভাঙন দেখা দেয়। এই জোটের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ (জ-লু), গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন পরিবেশ পরিষদের বৈঠকে যোগদান করে। তবে তারা ১২ দফা নিষ্পত্তি করে ছাত্রদলকে পরিষদে ফিরিয়ে আনার দাবী জানায়।

এর জবাবে বৈঠকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বলেন, শর্তারোপ করে পরিবেশ পরিষদে আসবো না, এটা হতে পারে না। প্রতিটি সংগঠনের নিজস্ব দাবী ও কর্মসূচী রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ পরিষদ কোনো একক সংগঠনের দাবী আদায়ের ফোরাম নয়। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত ফোরাম। এখানে

অনেক দাবী উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু দাবী বা শর্ত দিয়ে না মানলে পরিষদে আসব না, এটা হতে পারে না।

এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল, তা পুনরায় অনিশ্চিত যাত্রায় ধাবিত হয়।

সরকার পয়লা আগষ্ট তথ্য অধিদপ্তরের এক তথ্য বিবরণীতে ঘোষণা করে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যই দীনিয়াত পাঠ দিতে হবে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সরকারের এই ঘোষণাকে ছাত্রদের প্রতি সরকারের চ্যালেঞ্জ বলে আখ্যায়িত করে। ছাত্ররা বলে, ছাত্র সমাজ একটা ধর্মনিরপেক্ষা শিক্ষার কথা ব্যক্ত করে আসছে, কিন্তু সরকার শুধু রাজনৈতিক স্বার্থেই বিভিন্ন ভাবে বারবার ধর্মশিক্ষা ও ধর্মকে নিয়ে আসছে।

৩ আগষ্ট (১৯৮৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভায় ছাত্রনেতারা বলেন, বাধ্যতামূলকভাবেই দীনিয়াত পড়ার কোনো যৌক্তিকতা তার দেখছেন না।

নারায়ণগঞ্জে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর প্রতিবাদে মিছিল করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং এর ফলে ৩৫ জন আহত হয়। বিকেলে সংগ্রাম পরিষদ আলী আহমদ পৌর মিলনায়তনের সামনে এক সমাবেশ করে। এতে ছাত্রনেতা মাইনুদ্দিন মানিক, আওলাদ হাসান, আবুল কালাম আজাদ, আনিসুর রহমান টিপু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বার্মার ছাত্র আন্দোলনে সংহতি

১৩ আগষ্ট (১৯৮৮) বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ বার্মার আন্দোলনরত ছাত্র সমাজের সাথে সংহতি দিবস পালন করে। ছাত্ররা বার্মার ছাত্র-জনতার উপর নিপীড়ন বন্ধ করার জন্যে সেই দেশের সরকারের প্রতি আহবান জানান।

এই উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাবেশ শেষে জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত এক সংহতি মিছিল করে। পরে একটি প্রতিনিধি দল বনানী বার্মা দূতাবাসে গিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে বলা হয়ঃ

১. বার্মার ছাত্রদের ইউনিয়ন গঠনের আইনগত অধিকার দিতে হবে
২. ছাত্র রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এবং নির্যাতন বন্ধ করতে হবে

৩. রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বন্দী অবস্থায় লাঞ্ছিত করার ঘটনা তদন্তের জন্যে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটি গঠন ও দোষীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে

৪. বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।

বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ প্রতিবেশী দেশ বার্মার ছাত্র জনতার ওপর যে নির্বিচার অত্যাচার হচ্ছে তাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এক বিবৃতিতে অসম সাহসিকাতার সাথে লড়াইয়ের জন্যে বার্মার ছাত্র জনতার প্রতি অভিনন্দন জানায়।

২ সেপ্টেম্বর বার্মার প্রেসিডেন্ট মংমং ২৬ বছর আগে নিষিদ্ধ ঘোষিত একটি ছাত্র ইউনিয়ন পুনর্গঠন অনুমোদন করেন। তবে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ সংক্রান্ত বিক্ষোভকারীদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।

নীরুর বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে ছাত্রদলের আন্দোলন

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রবাজী, খুন, সন্ত্রাস ছিনতাই ইত্যাদি ঘটনার অভিযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা সানাউল হক নীরুসহ ৯ জন ছাত্রের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে ছাত্রদল এই সময় এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে।

১৬ আগষ্ট ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধর্মঘট ডাকে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে পাল্টা সমাবেশ ও মিছিল করে।

ছাত্রদলের সভায় আসাদুজ্জামান রিপন ও খায়রুল কবীর খোকন বক্তৃতা করেন। তাঁরা বলেন, নীরুকে সরকারী চক্রান্তে বহিষ্কার করা হয়েছে।
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় মোঃ ইয়াসিন ও মনিরুজ্জামান বাদল বক্তৃতা করেন। তাঁরা বলেন, অস্ত্রমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের বহিষ্কার আদেশকে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীসহ গোটা দেশবাসী অভিনন্দিত করেছে। ছাত্ররা মিছিলে শ্লোগান দেয় 'অস্ত্র শিক্ষা–এক সাথে চলবে না'।

২০ আগষ্ট (১৯৮৮) থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নীরুসহ ৯ জন ছাত্রদল নেতার বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে আমরণ অনশন কর্মসূচী শুরু করে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ এই কর্মসূচী থেকে বিরত থাকার জন্যে ছাত্রদলের কাছে আবেদন জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিষ্টার এক বিবৃতিতে বলেন, ছাত্রদলের ৯ জন সহ মোট ১২ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা নিয়েছে তা রাজনৈতিক না, শিক্ষাগত, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। প্রবীণ শিক্ষকরা তদন্ত করেই প্রতিবেদন দিয়েছেন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রেজিষ্টার ছাত্রদল কর্তৃক সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেওয়ার নিন্দা করেন।

উল্লেখ্য, বহিষ্কৃত ১২ জনের মধ্যে ৯ জন ছিল ছাত্র দলের, ১ জন আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগের, ১ জন জাসদপন্থী ছাত্রলীগের, ১ জন সরকারপন্থী বিলুপ্ত জাতীয় ছাত্র সমাজের। ছাত্রদল বাদে অন্য সংগঠনগুলি বৃহত্তর স্বার্থে তাদের কর্মীদের বহিষ্কার আদেশ মেনে নেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রফেসর এম আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে ছাত্রদলের অনশন কর্মসূচীতে উদ্বেগ প্রকাশ করে যে কোনো মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিঘ্নিত করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করার সঙ্কল্প ব্যক্ত করে।

বি.এন.পি চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া ২৪ আগষ্ট অবিলম্বে সানাউল হক নীরু, ইলিয়াস প্রমুখ ছাত্রদল নেতার মুক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের আহবান জানান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সরকারের ক্রীড়ণক আখ্যা দেন এবং শিক্ষকদের শিক্ষক সুলভ আচরণের পরামর্শ দেন।

বেগম খালেদা জিয়া উপাচার্য অফিস কক্ষের সামনে অনশনরত ছাত্রদল কর্মীদের দেখতে যান। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার জন্যেই নীরুর বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি বলেন, অনশনরত একজন ছাত্রেরও যদি কিছু হয়, তাহলে সারাদেশে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং সরকারের অনুগত উপাচার্যকে উৎখাত করা হবে। খালেদা জিয়া ছাত্রদলকে বার্মার ষ্টাইলে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ খালেদা জিয়ার বিবৃতির নিন্দা করে বিবৃতি দেয় এবং বহিষ্কৃতদের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার সঙ্কল্প ব্যক্ত করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৭ আগষ্ট অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের এক সমাবেশ ডাকে। তারা বলে, অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনের স্বার্থে দলীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে আরো বলা হয়,

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ এই কর্মসূচী থেকে বিরত থাকার জন্যে ছাত্রদলের কাছে আবেদন জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিষ্টার এক বিবৃতিতে বলেন, ছাত্রদলের ৯ জন সহ মোট ১২ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা নিয়েছে তা রাজনৈতিক না, শিক্ষাগত, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। প্রবীণ শিক্ষকরা তদন্ত করেই প্রতিবেদন দিয়েছেন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রেজিষ্টার ছাত্রদল কর্তৃক সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেওয়ার নিন্দা করেন।

উল্লেখ্য, বহিষ্কৃত ১২ জনের মধ্যে ৯ জন ছিল ছাত্র দলের, ১ জন আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগের, ১ জন জাসদপন্থী ছাত্রলীগের, ১ জন সরকারপন্থী বিলুপ্ত জাতীয় ছাত্র সমাজের। ছাত্রদল বাদে অন্য সংগঠনগুলি বৃহত্তর স্বার্থে তাদের কর্মীদের বহিষ্কার আদেশ মেনে নেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রফেসর এম আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে ছাত্রদলের অনশন কর্মসূচীতে উদ্বেগ প্রকাশ করে যে কোনো মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিঘ্নিত করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করার সঙ্কল্প ব্যক্ত করে।

বি.এন.পি চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া ২৪ আগষ্ট অবিলম্বে সানাউল হক নীরু, ইলিয়াস প্রমুখ ছাত্রদল নেতার মুক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের আহবান জানান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সরকারের ক্রীড়ণক আখ্যা দেন এবং শিক্ষকদের শিক্ষক সুলভ আচরণের পরামর্শ দেন।

বেগম খালেদা জিয়া উপাচার্য অফিস কক্ষের সামনে অনশনরত ছাত্রদল কর্মীদের দেখতে যান। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার জন্যেই নীরুর বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি বলেন, অনশনরত একজন ছাত্রেরও যদি কিছু হয়, তাহলে সারাদেশে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং সরকারের অনুগত উপাচার্যকে উৎখাত করা হবে। খালেদা জিয়া ছাত্রদলকে বার্মার ষ্টাইলে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ খালেদা জিয়ার বিবৃতির নিন্দা করে বিবৃতি দেয় এবং বহিষ্কৃতদের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার সঙ্কল্প ব্যক্ত করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৭ আগষ্ট অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের এক সমাবেশ ডাকে। তারা বলে, অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনের স্বার্থে দলীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে আরো বলা হয়,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার আর কখনোই সন্ত্রাস, নৈরাজ্য এবং অন্ধকারময় দিনগুলোতে ফিরে যেতে চায় না। সন্ত্রাসের দায়ে ইতঃপূর্বে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের জন্যে কোনো হুমকির কাছেই ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা নতি স্বীকার করবে না।

২৭ আগষ্ট রাত পৌণে ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর এম. আমিনুল ইসলামের কাছে অবশেষে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীরা অনশন ভঙ্গ করে। ছাত্রদল অভিযোগ করে, তাদের দাবী আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের উস্কানীমূলক বক্তব্য দিয়ে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

বন্যায়আর্তের সেবায় ছাত্র সমাজ

আগষ্ট (১৯৮৮) মাসের শেষ দিক থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সারাদেশে ভয়াবহ বন্যায় এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে বন্যায় সমগ্র দেশ পানির তলে ডুবে যায়। ঢাকা শহরও হাটু থেকে কোমর পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে যায়।

ছাত্ররা এই অবস্থায় 'মানুষকে বাঁচান' শ্লোগান নিয়ে সমগ্র দেশে আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলে এবং স্যালাইন ও খাদ্য সরবরাহ করতে থাকে। বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে গেয়ে খাদ্য ও কাপড় ভিক্ষা করে এনে আর্তের সেবায় নিয়োজিত হয়। ডাকসু অফিস স্যালাইন বানানোর কারখানায় পরিণত হয়। শত শত ছাত্র-ছাত্রী সারাদিন পালাক্রমে লাখ লাখ প্যাকেট স্যালাইন তেরী করে সারাদেশে বিতরণ করে।

কিন্তু সরকার এই সময়ও ছাত্রদের নিস্তার দিতে অস্বীকার করে। তারা ছাত্রদের ভিক্ষা সংগ্রহে বাধা দেয়। প্রতিদিন সকালে রুটি সংগ্রহকারী কর্মীদের গ্রেফতার করতে থাকে।

বন্যার সময় ঔষধ ব্যবসায়ীরা স্যালাইন আমদানীর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার আহবান জানিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন একাই দশ লক্ষ প্যাকেট স্যালাইন তৈরী করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তারই অনুসরণ করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ লক্ষ লক্ষ স্যালাইন বানিয়ে দুর্গত অঞ্চলে ঝাপিয়ে পড়ে।

কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশন বা রেডিও এর কোনো সংবাদ একদিনও প্রচার করেনি। প্রতিদিন খবরের ২০ থেকে ২৫ মিনিট জেনারেল এরশাদের পানিতে হাটা, দুঃস্থদের গায়ে হাত বুলানো, সেনাবাহিনীর ত্রাণ কার্যে তথাকথিত ব্যস্ততার সচিত্র

প্রতিবেদন নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল যে, টেলিভিশন ক্যামেরা ছাড়া কোনো মন্ত্রীও ত্রাণ তৎপরতায় যেতেন না। যেদিন টেলিভিশন ক্যামেরা পাওয়া যেত না, সেদিন মন্ত্রীরা লোক দেখানো ত্রাণ কাজে অংশ নিতেন না। এভাবে দুর্গত মানুষকেও সরকারের প্রচারের ব্যবসায় পরিণত করা হয়।

সরকারের এত ঢাক-ঢোল বাজানোর পরও দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ' এক সমীক্ষা চালিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে দেশবাসী হতবাক হয়ে পড়ে। টেলিভিশনে যেখানে মানুষ দেখেছে দেশের স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি এবং তার বিবি রওশন ও গোলাম মন্ত্রীরা প্রতিদিন অঢেল ত্রাণ কার্য বিতরণ করেছেন, সেখানে সমীক্ষায় দেখা যায়, মহানগরীর বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে ঠাঁই নেয়া বন্যার্তরা ২০ দিনে মাথাপিছু দৈনিক মাত্র ১২১ গ্রাম চাল সরকারী সাহায্য হিসেবে পেয়েছে। শিশু-কিশোররা পেয়েছে মাথাপিছু গড়ে আধ টুকরো রুটি।[৩১]

সিলেট শহরে ২৪ সেপ্টেম্বর ছাত্র শিবির কর্মীরা এক হামলা চালিয়ে গোলাপগঞ্জ এম. সি. একাডেমী নবম শ্রেণীর ছাত্র জুয়েল আহমদ (১৫)-কে হত্যা করে। ২৫ সেপ্টেম্বর ৮ ও ৫ দল এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর প্রতিবাদে তিন দিনের শোক ও প্রতিবাদ কর্মসূচী ঘোষণা করে।

২৭ সেপ্টেম্বর (১৯৮৮) শিবিরের হামলায় আহত আরো দু'জন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা মৃত্যু বরণ করে। এরা হচ্ছে ছাত্রলীগ (মু-না) কর্মী ও মদনমোহন কলেজের ছাত্র তপন জ্যোতি দে ও সিলেটে সরকারী কলেজের ছাত্র মনীর-ই-কিবরিয়া চৌধুরী। সমগ্র সিলেটে এ নিয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

২৮ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জে জামায়াত নেতা শাহবাজ উদ্দিনকে একদল যুবক পিটিয়ে হত্যা করে।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ বাংলাদেশে এক সফরে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করলে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ৩০ অক্টোবর এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল ও নাসির-উদ-দুজা মিছিলে নেতৃত্ব দেন এবং মতিঝিলস্থ মার্কিন দূতাবাসে যাওয়ার সময় দৈনিক বাংলার মোড়ে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। এর প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে।

১৯৮৯ঃ শুরুতেই মাওলানা সাঈদী

১৯৮৯ সাল ছিল জেনারেল এরশাদের জন্যে অপেক্ষাকৃত শান্তির বছর। এই সময় বিরোধী আন্দোলন, এমনকি ছাত্র আন্দোলনও ছিল দিকনির্দেশহীন। সকল দল

মূলতঃ নিজেদের কেন্দ্র করেই তাদের সময়গুলো কাটিয়ে দেয়। তথাপি সব মিলিয়ে ১৯৮৯ সাল ছাত্র আন্দোলন বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে বিভিন্ন বিষয়ে।

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হয় জামায়াত-শিবির বিরোধী তীব্র গণআন্দোলন। এর সূত্র হিসেবে আগমন করেন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। তিনি ওয়াজ মাহফিল ও কোরআন তাফসীরের নামে সারাদেশে মূলতঃ রাজনৈতিক জনসভা করে বেড়াচ্ছিলেন। মাওলানা সাঈদী যে, ওয়াজের নামে রাজনৈতিক প্রচারই করেন তা তাঁর বক্তব্য থেকেও সমর্থিত হয়। এক বিবৃতিতে ধর্মীয় সভায় তাঁর রাজনৈতিক আলোচনার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে সাঈদী বলেন, 'এদেশে মরহুম মাওলানা আতাহার আলী, হাফেজ্জী হুজুর প্রমুখ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও ধর্মীয় মাহফিলে বক্তৃতা করেছেন এবং রাজনৈতিক আলোচনাও করেছেন। তখন তো তাদের ৮, ৭, ৫ দল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাধা প্রদান করেনি। শুধু আমার বিরুদ্ধে ঐ মহলটির আক্রোশের মূল কারণ কি-তাহা আমার কাছে অজ্ঞাত'।

মাওলানা দেলোয়ার সাঈদী যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ধর্মের নামে জামায়াতের দলীয় প্রচার, সাম্প্রদায়িক উস্কানী, নারী আন্দোলন ও দেশের সংস্কৃতিসেবীদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ এবং কোথাও কোথাও অত্যন্ত কুৎসিত মন্তব্য করে বেড়ান তা সচেতন মহলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। জনগণ ও আলেম সমাজ ইসলামের নামে মওদুদীবাদ প্রচার করাকে 'কুফুরী' বলে মন্তব্য করেন।

সাঈদীর ওয়াজের ক্যাসেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, তিনি এই সব তাফসীর মাহফিলে সরাসরি ইসলামী ছাত্র শিবিরের জন্যে দোআ করেন। এছাড়া, তিনি অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলি সম্পর্কে কটাক্ষ করেন। নারী আন্দোলন সম্পর্কে সাঈদী কুৎসিত মন্তব্য করেন এবং বলেন, লেনিন, মার্কস নারী সম্ভোগ করতেন।

নারী আন্দোলনকারী নেত্রীদের তিনি দেশের 'দুর্গতি' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রগতিশীল আন্দোলনের মিছিলের সামনে মেয়েদের না রাখলে তাদের শ্লোগানের জোশ ওঠে না। সাঈদী নাটক, সঙ্গীতের বিরুদ্ধেও কথা বলেন।

পীর-মাশায়েখদের ওরস সম্পর্কে তিনি বলেন, এরা হিন্দুদের চেয়েও খারাপ। মাজার জেয়ারতকে তিনি বলেন, হারাম কাজ। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং তাদের সাহাবীদেরও সাঈদী কটুক্তি করতে দ্বিধা করেন না।

৯ মার্চ (১৯৮৯) বরিশালের আউটার ষ্টেডিয়ামে এক জলসায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাওলানা সাঈদী বলেন, বাংলাদেশের বেশীর ভাগ আলেম রাজনীতি না করে কেবল

মুরগীর রানের দাওয়াত খেয়ে বেড়ায়। মাজারে যাওয়া হারাম-শিরক ঘোষণা করে সাঈদী বলেন, খাজা বাবাদের কাছে যেওনা।

তাফসীর ও ওয়াজ মাহফিলের নামে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি প্রচারের এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মাওলানা সাঈদীকে বাধা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্রনেতারা বলেন, সারাদেশেই জামায়াতে ইসলামী জনসভা করে বেড়াচ্ছে, ছাত্র-জনতা তাদের কিছু বলেনি। কিন্তু ধর্মসভার নাম করে রাজনৈতিক সভা করে ধর্মভিরু মানুষকে বিভ্রান্ত করার মতো অনৈসলামিক কার্যকলাপ ছাত্র সমাজ রুখবেই।

৪ জানুয়ারী ঢাকার কমলাপুরে মাওলানা সাঈদী কোরআন তাফসিরের নামে এমন একটি রাজনৈতিক সভার আয়োজন করলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ৮ ও ৫ দল প্রতিরোধ করে। সাঈদীর তাফসীর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

৯ জানুয়ারী চট্টগ্রামেও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সাঈদীর রাজনৈতিক তাফসীরে বাধা প্রদান করে এবং চট্টগ্রামে সেদিন হরতাল ও পালিত হয়। কিন্তু জামায়াতের প্রহরায় সাঈদীর সভা চলে। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের মাহফিল বন্ধের কথা শুনে সৌদী আরবের মুসলমানরা কান্নাকাটি শুরু করে এবং আবার মাহফিল হচ্ছে শুনে শোকরিয়া আদায় করেছে। তিনি বলেন, যারা এই মাহফিলের বিরোধিতা করেছে তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। মাহফিলের অপর বক্তা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, এ দেশের মুক্তিযোদ্ধারা জারজ সন্তান।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এই কটাক্ষের খবর ছড়িয়ে পড়লে পরদিনও চট্টগ্রামে হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে জামায়াত-শিবিরের কর্মীরাও রাস্তায় নেমে পড়ে এবং বোমা-গুলী চালাতে থাকে। এই বোমা হামলায় উত্তম বিশ্বাস নামে ১৪ বছরের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়।

এদিন সাঈদী নিজেই বলেন, বাংলাদেশ নামক একটা দেশকে মুক্তিযোদ্ধারা বিধর্মীদের সহযোগিতায় স্বাধীন করেছে। তিনি দৈনিক সংবাদ ও তাঁর বিরোধী সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিকে ইসলাম বিরোধী আখ্যা দেন।

চট্টগ্রামে উত্তেজনা অধিক মাত্রায় ছড়িয়ে পড়লে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সাঈদীকে তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রাম ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ১১ জানুয়ারীও পরপর তিনদিনের মতো চট্টগ্রামে হরতাল পালিত হয়।

যশোরের বেনাপোল ও শারশায় ১৯ ও ২০ জানুয়ারী সাঈদীর সভাকে কেন্দ্র করে যশোরে উত্তেজনা চলতে থাকে। সেখানে ১৯ ও ২০ তারিখ হরতালের ডাক দেওয়া হয়।

২২ জানুয়ারী (১৯৮৯) সাঈদীর খুলনার সভার বিরুদ্ধে স্থানীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মিছিল করে। কিন্তু এর মধ্যেও সাঈদী সভা করেন এবং কমিউনিস্টরা এদেশের এক নম্বর শত্রু, বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রীদের কোনো স্থান নেই, জীবন থাকতে আমি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাধ পূরণ করতে দেব না বলে সাঈদী ঘোষণা করেন।

এই সময় সারাদেশেই সাঈদীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং ৮ দল, ৫ দলের সংগ্রাম, বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বি.এন.পি, ৭ দল, সংগ্রামী ছাত্র জোট এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এব্যাপারে পূর্ণ নীরবতা পালন করে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল এক বিবৃতিতে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার শত্রু, নারী ধর্ষণকারী এবং কোরআনের অপব্যাখ্যাকারী তথা ইহুদীদের প্রবক্তা জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি বাংলার মাটিতে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী জানায়।[৩২]

সাঈদীর প্রতি আলেমদের চ্যালেঞ্জঃ কাফের ঘোষণা

চট্টগ্রামের ৫১ জন মোফাচ্ছির, মোহাদ্দিছ ও মুফতী ১০ জানুয়ারী এক যুক্ত বিবৃতিতে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যাকারী বলে অভিহিত করে অবিলম্বে পবিত্র ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করার আহবান জানান। তাঁরা বলেন, অন্যথায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সাঈদীর ইসলাম পরিপন্থী কার্যকলাপ বরদাশত করবে না।

আলেমগণ অভিযোগ করেন, মাওলানা সাঈদী নবী করিম (সঃ) ও অন্যান্য নবীগণের সম্পর্কেও কটুক্তি করে বেড়াচ্ছেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, মুফতী ওবায়দুল হক নঈমী, আইয়ুব আলী আজমী, মোফাচ্ছির আল্লামা আবদুল মালেক শাহ, আল্লামা নূরুল ইসলাম আনসারী, আল্লামা আবুল কাশেম মোহাদ্দিছ, আল্লামা আলাউদ্দিন শাহ প্রমুখ।

ঢাকার শহীদ পার্ক কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব ও পেশ ইমাম হাফিজ মাওলানা আ. ন. ম. জাকির হোসাইন ১৩ জানুয়ারী পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্যে দেশের সকল সুন্নী মুসলমান ও ওলামায়ে কেরামদের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, আমি সাঈদীর প্রতি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করছি যে, তাফসির তো দূরের কথা, বঙ্গানুবাদ করার মতো ন্যূনতম যোগ্যতাও মৌলভী সাঈদীর নেই। সাঈদীর তাফসীর পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাঈদী যে কিতাব পড়ে তাফসীর করেন, তা মৌলভী মওদুদীর অপব্যাখ্যা গ্রন্থ তাফহিমুল কোরান, যা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ওলামাগণ বাতিল করে দিয়েছেন।

মাওলানা জাকির আরো বলেন, মওদুদীপন্থী সাঈদী জামাত বিরোধীদের ঢালাওভাবে অমুসলিম, কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা দিচ্ছে। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ জন আলেমের ফতোয়া হল, মওদুদীর ইসলাম এবং দ্বীন ইসলাম এক নয়। পৃথিবীতে দুটি ইসলাম আছে। একটি হযরত মুহম্মদ (সঃ)–এর প্রবর্তিত ইসলাম বা গণতন্ত্রের ইসলাম, অন্যটি এজিদের প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের ইসলাম। মাওলানা মওদুদী, গোলাম আজম, মাওলানা সাঈদী, আব্বাস আলী খান প্রমুখ ইসলামের শত্রু, দুশমন ও কাফের এজিদ ও আঃ ওহাব নজদীর একনিষ্ঠ অনুসারী।

বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, মাওলানা সাঈদী ও জামায়াত–শিবিরকে ঢাকা শহরের যে কোনো ময়দানে প্রকাশ্যে বাহাস বা বিতর্কের আহবান জানায়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫০১ জন মাওলানা, মুফতি ও মুফাচ্ছির পবিত্র কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা তথা মওদুদীবাদ ভ্রান্ত ও বাতিল আকিদার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যে সাঈদীর প্রতি আহবান জানান।

পীরজাদা আলহাজ্জ মাওলানা খাজা আবু তাহের ৫০১ জন আলেমের পক্ষে এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশ জাকের সংগঠন সুপ্রীম কমান্ড কাউন্সিল সদস্য আলহাজ্জ পীরজাদা মাহফুজুল হকও ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি করার জন্যে সাঈদী ও জামায়াতের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, ওহাবীবাদী মওদুদীরা সত্য ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আদর্শ বিরোধী।

দেশের ১৪ জন প্রখ্যাত আলেম দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে কাফের ঘোষণা করেন। এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা বলেন, সাঈদী মাজার জেয়ারতকে হারাম ও শেরেক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মক্কা শরীফে অবস্থিত হযরত বিবি খাদিজা (রঃ)–এর মাজার ও মদিনা শরীফে অবস্থিত আমির হামজা ও অন্যান্য সাহাবীর মাজার স্বয়ং রাসুলে করিম (সঃ) জেয়ারাত করেছেন। এ কাজটি সুন্নত এবং নবী করিম স্বয়ং করেছেন। এ হেন সুন্নত কাজকে হারাম ও শেরেক বলা কুফুরি। সুতরাং

দেলোয়ার হোসেন সাঈদী উক্ত কুফরি কথা বলে শরিয়তের ফতোয়া অনুযায়ী কাফের হয়েছেন।

বিবৃতিদাতা এই ১৪ জন মাওলানার মধ্যে স্বাক্ষর করেন মাওলানা মুফতী আমিরুল ইসলাম জালালী, আবুল কালাম আজাদ, ইউনুছ আলী জেহেদী, ওহাব আলী জালালী, ছাঈদুল হক প্রমুখ।

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শেখ হাসিনা জামায়াত ও সাঈদীর এই ধর্মের নামে অপধর্মের বিরোধিতা করে কঠোর বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, পবিত্র কোরআনের তাফসীরের নামে দেশব্যাপী একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিহ্নিত শত্রুদের কোরআনের অপব্যাখ্যা প্রদান পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিরোধিতার সামিল। লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ নিরপরাধ মুসলমানের হত্যার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ঘাতক বাহিনীর এই দোসররা ধর্মীয় জলসার নামে আবার নতুন করে বাংলার ধর্মপ্রাণ কোটি কোটি মানুষকে বিভ্রান্ত করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। স্বাধীনতার চেতনা পরিপন্থী ও ধর্মের নামে ধর্ম ব্যবসায়ীদের সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডকে নিরাপত্তা বিধান করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, ১৯৭১ সালে ইসলামের নামে বাঙালী জাতিকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করা যায়নি, ভবিষ্যতেও শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর ইসলামের পরিবর্তে মওদুদীবাদ প্রচার করে বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। মওদুদীবাদী ধর্ম ব্যবসায়ী ও তাদের মুরুব্বীদের বাংলার মানুষ একাত্তরে পরাজিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও জনতার রুদ্ররোষ থেকে তারা নিস্তার পাবে না।[৩৩]

'অস্ত্র দ্বারা রাজনীতি নয়, রাজনীতি দ্বারা অস্ত্র নিয়ন্ত্রিত হোক'

পরদিন শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রলীগের ৪১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সন্ত্রাস দেখেছি। বাবা-মা সন্তানকে পাঠায় লেখাপড়া শেখাতে, আর সন্তান সন্ত্রাসের কবলে লাশ হয়ে ঘরে ফেরে। জনসমর্থন নেই বলে স্বৈরশাসকরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে নিতে চায়। জনগণের মধ্যে না থেকে ক্যান্টনমেন্টে বসে যারা রাজনীতি করে তারা জনগণের শাসন চায় না। সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা আসুক তা তারা চায় না।

শেখ হাসিনা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সংগ্রামের পাদপীঠ বলেই তারা ছাত্রদের রাজনীতি বন্ধ করতে চায়। একজন (এরশাদ) এখন বলছেন, ছাত্র

রাজনীতি বন্ধ করে দেব। এর আগে একজন (জেনারেল জিয়া) বলেছিলেন, 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'। জনসমর্থন নেই বলে বিশেষ জায়গার লোকেরা এরকম বলে।

তিনি বলেন, অস্ত্র দ্বারা রাজনীতি নয়, রাজনীতি দ্বারা অস্ত্র নিয়ন্ত্রিত হোক-এটা আমাদের কাম্য।

শেখ হাসিনা বলেন, ছাত্রলীগের ইতিহাস, বাঙালী জাতির ইতিহাস। ছাত্রলীগের একজন স্কুলকর্মী হিসেবে ৬২-র শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। ৬৪ সালে এই বটতলার সমাবেশে এসেছি। এরপর ইডেন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী সংসদের সহসভানেত্রী হই এবং ৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে প্রতিটি আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে।

১০ জানুয়ারী (১৯৮৯) বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ৮ দল আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা, জামায়াত ও সাঈদীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে অশালীন উক্তির প্রতিবাদ করে বলেন, মুখ সামলে কথা বলুন, জনগণ তা নাহলে জিহবা ছিঁড়ে ফেলবে।

মাওলানা সাঈদীর বিভিন্ন বক্তব্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট কলামিস্ট আলহাজ্ব শামস উল হুদা দৈনিক জনতার উপসম্পাদকীয়তে লেখেন, ''মাওলানা সাঈদীর তফসীরের একটি অংশ- 'সবাই মিলিয়া জোরে জোরে দরুদ ও মিলাদ শরীফ পড়া শরীয়তের কোন বিধান নেই। ইহা হিন্দুদের মনসা পূজার মত। উহাকে বস্তা করে গঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়া ভাল। বর্তমান যুগে পীর-মুর্শিদগণ খানকা বা আস্তানা করে মুরীদগণকে যে জিকির-আসকার, তসবীহ-তাহলীল ইত্যাদির তালিম দেয় তা কুরআন-হাদীসের একেবারেই পরিপন্থী, ইহা ভন্ডামী ছাড়া আর কিছুই নহে। ড্রাইভার ভাইয়েরা ওলী-দরবেশের মাজারের সামনে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে বিনয়ের সাথে সম্মান প্রদর্শন কর কেন? তাদের তোমরা ভয় কর না। কেননা, তারা তোমাদের মত সাধারণ মানুষ। তাদের হাতে কোন ক্ষমতা নেই।'

'সাঈদী সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্য যে কোন ধর্মপ্রাণ লোক মনে আঘাত পাবে সন্দেহ নেই। রসূলে পাক (সঃ)-এর ওপর দরুদ পাঠের নির্দেশ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারাও রসূলে করীম (সঃ)-এর ওপর দরুদ পাঠ করে থাকেন।.....

ওলি-আউলিয়াদের মাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সম্মান প্রদর্শন করা অন্যায় কিছু নয়। কেননা, কবরবাসীর প্রতি সালাম পেশ করার বিধান রয়েছে। 'আচ্ছালামু

আলায়কুম ইয়া আহলাল কুবরে'-কথাটি বলার সময় স্বাভাবিকভাবে গাড়ীর গতি স্তিমিত হওয়ার কথা।.....

'এদেশের এক শ্রেণীর আলেম সবসময় ইসলামকে জোর করে একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে প্রমাণ করতে চান। এই শ্রেণীর আলেম সমাজ ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি বুঝেন? আমি তা বুঝিনা। রসুলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্বে বলেছিলেন, 'তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না, অতীতে অনেক জাতি এই প্রশ্নে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে'। অথচ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ আলেম এসব পবিত্র বক্তব্য কোনদিন মুখে উচ্চারণ করেন না।.... কোন সাম্প্রদায়িক কারণে মিথ্যা ও মনগড়া বক্তব্য রাখলে তাতে কোনোদিনই সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

'যারা মুসলমান হয়ে আজ সাম্প্রদায়িক কথা বলেন, তারা আর যাই হোক রসুলে করীম (সঃ)-এর মিল্লাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না"।৩৪

এই সময় (২৩ জানুয়ারী ১৯৮৯) পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন এলাকায় সর্বহারা পার্টির জনৈক নেতা আবদুস সালামের কাছ থেকে অস্ত্র কেনার সময় সাতকানিয়া কলেজের ইসলামী ছাত্র শিবির নেতা আবদুল খালেক হাতে-নাতে ধরা পড়ে। পুলিশ তাদের বান্দরবন সদর থানায় গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

জামায়াত-শিবিরের এই অস্ত্র কেনার খবরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। সারাদেশে যেভাবে জামায়াত-শিবিরের হাতে প্রগতিশীল কর্মীরা প্রাণ দিচ্ছিল এই ঘটনায় তা আরো বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দেয়।

'ছাত্রদের শুধু বই পড়লে, চলবেনা।

ছাত্রদের রাজনীতি করা খুবই জরুরী এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বাংলাদেশের কবিদের নেতা শামসুর রাহমান বলেন, রাজনীতি জীবনের বাইরের কোন বিষয় নয়। শুধু দেশীয় নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে।

কবি শামসুর রাহমান ছাত্রলীগ (মু-না) আয়োজিত নবীনবরণ উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, যখন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রাণচাঞ্চল্য দেখি, তখন আমার মন থেকে হতাশা দূর হয়। রাজনৈতিক দলগুলো যখন নিশ্চুপ বসে থাকে, তখন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের রাজপথে সাহসী ভূমিকা আমার মনে আশা জাগায়।

অনুষ্ঠানে ছাত্রনেতা মুশতাক হোসেন বলেন, দেশে বাস্তব অবস্থা এমনই যে, ছাত্রদের শুধু বই পড়লে চলবে না। কারণ বইয়ের সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনঃ ১৯৮৯

দীর্ঘ ৭ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৯)। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত সংগঠনগুলো একটি মাত্র পরিষদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। প্রথমে এ ঐক্যবদ্ধ পরিষদ রচনায় সংকট দেখা দেয়। রাজনৈতিক জোট ৮ দল ও ৫ দলের মিত্র ছাত্র সংগঠনগুলি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনগত অবস্থা বিচারে আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ (সু-র) থেকে সহসভাপতি ও কমিউনিষ্ট পার্টি সমর্থিত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন থেকে সাধারণ সম্পাদকের প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু ৫ দল সমর্থক ছাত্র সংগঠনগুলি তাদের রাজনৈতিক ধারা থেকে সাধারণ সম্পাদক পদ দাবী করে।

এই ধারা থেকে জাসদপন্থী ছাত্রলীগের মুশতাক হোসেন এবং ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ সমির্থত বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর জহিরুদ্দিন স্বপন সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হন। বিক্ষুব্ধ বাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও জাতীয় ছাত্রলীগ আখতারুজ্জামান ও নূরুল ফজল বুলবুলকে নিয়ে একটি আলদা পরিষদ করারও চেষ্টা করে। আখতার-বুলবুল পরিষদ শ্লোগান দিয়ে মিছিলও অনুষ্ঠিত হয়।

তবে শেষ পর্যন্ত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত দলগুলো ঐক্যমতে পৌছতে সমর্থ হয়। ছাত্রলীগ (সু-র)-এর সুলতান মোহাম্মদ মনসুরকে সহসভাপতি, ছাত্রলীগ (মু-না)-এর মুশতাক হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নাসির-উদ-দুজাকে সহসাধারণ সম্পাদক করে সুলতান-মুশতাক-নাসির পরিষদ করা হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। তারা শামসুজ্জামান দুদুকে সহসভাপতি ও আসাদুজ্জামান রিপনকে সাধারণ সম্পাদক করে 'দুদু-রিপন' পরিষদ করে।

দীর্ঘ ৭ বছর পর শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভুক্ত পরিষদ বিপুল ভোটে ডাকসুতে জয়লাভ করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই নির্বাচনে হেরে গেলেও একক বৃহত্তম দল হিসেবে বেরিয়ে আসে।

ডাকসুতে ২০টি পদের মধ্যে সবগুলিতেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জয়লাভ করে। তবে ১৩টি ছাত্রবাসের ১০১টি পদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং ৫৫টি পদ ছাত্রদল লাভ করে।

ছাত্রীদের বিজয় মিছিলে হামলা

কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই রায় মেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলাফল ঘোষণার পরদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিজয় মিছিল বের করলে ছাত্রদল কর্মীরা তাতে সশস্ত্র আক্রমণ করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিজয় মিছিলে প্রথম হামলা চালানো হয় সকালে, জিয়া হলের সন্নিকটে। এতে নব নির্বাচিত সহসাধারণ সম্পাদক নাসির-উদ-দুজা আহত হন।

এরপর রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হল থেকে ছাত্রীরা একটি বিজয় মিছিল নিয়ে উপাচার্য ভবনের দিকে যাওয়ার পথে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ব্যানার নিয়ে 'নির্বাচনের রায় মানিনা' শ্লোগান মুখর একটি মিছিলের সামনে পড়ে যায়। ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রীদের উপর হামলা করে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার উপর ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করে। ভীত সন্ত্রস্ত ছাত্রীরা দ্রুত পালাতে গিয়ে অনেকেই আহত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট করে, শামসুন্নাহার নামে এক ছাত্রী কর্মীকে এলোপাতাড়ি ঘুষি মেরে রাস্তায় শুইয়ে ছাত্রদল কর্মীরা নির্যাতন করে।

নির্যাতনের ছবি তুলতে গেলে হামলাকারীরা নিউ নেশন পত্রিকার আলোকচিত্রী পাভেল রহমানকেও তারা লাঞ্চিত করে। দৈনিক পত্রিকার আলোকচিত্রী সলিমুল্লাহর ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

এই ঘটনা সমগ্র ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া চলতে থাকে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই সময় ছাত্রী মিছিলে ছাত্র দলের বর্বরতার নিন্দা করে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে মধুর কেন্টিনে শেষ করে। এই সময় পেছন থেকে আবার সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয় এবং গুলীর আওয়াজে সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা ছোটাছুটি করতে থাকে। কফিলউদ্দীন কনক নামে এক যুবক এখানে গুলী বিদ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে।

বিজয় মিছিলে হামলা, ছাত্রীদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন, কনক হত্যা ইত্যাদি মিলে সমগ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। কর্তৃপক্ষ দ্রুত ৭ দিনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।

বিজয় মিছিলে হামলা ও ছাত্রী নির্যাতনে হতবাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১১ ফেব্রুয়ারী এক মৌন শোক মিছিল করে। ১২ ফেব্রুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও ১২ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৯) সমাবেশ করে। ছাত্রদল সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন এখানে বলেন, 'দেখে নেব, ভিসি কিভাবে প্রশাসন চালায়'। ছাত্রদল নেতারা, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিজয়ের পেছনে উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের কারচুপি আছে বলে দাবী করে।

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে খালেদা জিয়ার অভিযোগ ও বাদানুবাদ

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি.এন.পি-র কেন্দ্রীয় কমিটি ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করে। ছাত্রীদের বিজয় মিছিলে ছাত্রদলের হামলাকেও তারা অস্বীকার করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল ছাত্রী সংসদের সহসভানেত্রী মনিরা রহমান ও সাধারণ সম্পাদিকা সাইদা ইয়াসমিন এবং রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের সহসভানেত্রী গুলশান মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদিকা নাজমা আখতার এক বিবৃতিতে একজন নারী হয়েও খালেদা জিয়া ছাত্রী মিছিলের হামলাকারী ছাত্রদল কর্মীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা না নেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ, নিন্দা ও দুঃখ প্রকাশ করে। তাঁরা বলেন, ছাত্র, শিক্ষক এবং সাংবাদিকরা প্রকাশ্য দিবালোকে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

ডাকসু নির্বাচন পরবর্তী ছাত্রী মিছিলের হামলার নিন্দা করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটও বিবৃতি দেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও ছাত্রীদের উপর হামলাকে নজিরবিহীন বলে উল্লেখ করে। ইউকসুর ছাত্র নেতারা বলেন, ছাত্রী মিছিলে হামলা ৭১ সালের পাকবাহিনীর নির্যাতনকেও হার মানায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ছাত্রদল কর্তৃক ডাকসু নির্বাচনের কারচুপির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এবং বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতাকালে নির্বাচনে কারচুপির জন্যে শিক্ষকদের অভিযুক্ত করায় বেগম খালেদা জিয়ার তীব্র সমালোচনা করে। শিক্ষকরা এই জন্যে বেগম খালেদা জিয়াকে তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহবান জানান।
সাংবাদিক সম্মেলন করে শিক্ষকরা বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল, শিক্ষকদের সম্পর্কে যে অভিযোগ আনছে তা অবমাননাকর, অচিন্তনীয়। তাদের সন্ত্রাসমূলক ও

বিবেকবর্জিত ঘৃন্য ঘটনা দেশবাসীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা হেট করে দিয়েছে। শিক্ষকরা বলেন, ভোট গ্রহণ থেকে শুরু করে গণনা শেষ হওয়া পর্যন্ত কেউই কোন অভিযোগ করে নি, অথচ ফলাফল প্রকাশের পর ছাত্রদল কল্পনাপ্রসূত অভিযোগ এনে সম্মানিত শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হচ্ছে।

তাঁরা আরো বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মতো সম্মানিত রাজনৈতিক নেত্রীর পক্ষে এহেন অশোভন ও শিক্ষকদের প্রতি মানহানিকর উক্তি কল্পনাও করা যায় না। তিনি কল্পনার রাজ্য থেকে আজগুবি খবর আহরণ করে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে শিক্ষক সমাজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতির কাছে হেয় করার অনভিপ্রেত প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁর এসব দায়িত্ব জ্ঞানহীন উক্তি সন্ত্রাসের ইন্ধন যোগাচ্ছে।

১৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৯) পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে জিয়াউর রহমান হলের ছাদ থেকে ৩০টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার করে। কিন্তু ছাত্রদল কর্মীরা এর প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে বলে, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

১৫ ফেব্রুয়ারী ডাকসু ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

একই দিন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃত্বাধীন সংগ্রামী ছাত্র জোট এক সমাবেশে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে শহীদ মিনারে যেতে বাধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান রিপন, সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি, খোন্দকার লুৎফর রহমান ও ফজলুল হক মিলনও সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

ডাকসুর অভিষেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

২০ মার্চ ডাকসুর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এখানেও গন্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হয়। প্রধান অতিথি কবি সুফিয়া কামাল এবং উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান অভিষেক মঞ্চে উঠতে গেলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্মীরা তাদের কালো পতাকা প্রদর্শন করে এবং শ্লোগান দিতে থাকে।

এই সময় উপস্থিত ছাত্ররা কালো পতাকার পাল্টা হাতের সাদা স্যান্ডেলের তুলে দেখাতে থাকে। ছাত্রদল কর্মীরা মঞ্চের সামনে ফাঁকা জায়গা দখল করে বসে থাকে এবং মাইকে বারবার অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও সরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতার মাঝেও বারবার তারা শ্লোগান দিয়ে অনুষ্ঠান পন্ড করার

চেষ্টা করতে থাকে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা উস্কানীর মুখেও এই সময় চরম ধৈর্য দেখায়, ফলে অনুষ্ঠানটি একটি পরিকল্পিত পন্ড হওয়ার চক্রান্ত থেকে রক্ষা পায়।

প্রধান অতিথির ভাষণে কবি সুফিয়া কামাল দুঃখ করে বলেন, আজ এই আনন্দের দিনে আমাকে কালো পতাকা দেখালেন! দীর্ঘ ৭ বছর পরে এই বিক্ষুব্ধ বাংলায় একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ডাকসুতে হয়। আমরা এ ঘটনায় খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু এমন নির্বাচনের পরেও বোনের মুখে কালি দিতে দ্বিধা করে নি। খবরের কাগজে দেখেছি, ৬০ গজ কালো কাপড় কেনা হয়েছে, কিন্তু কালো কাপড় না কিনে যদি সাদা কাপড় কিনে তা বিবস্ত্র খেটে যাওয়া মেয়েদের মাঝে বিতরণ করতেন, তাহলে সমাজের উপকার হতো।

পয়লা এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অনুষ্ঠানেও ছাত্রদলের কর্মীরা একই কায়দায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা মঞ্চের কাছে শ্লোগান দিতে থাকলে কয়েক হাজার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক অভিভাবক হতবাক হয়ে যায়। ছাত্রদল কর্মীরা মঞ্চে কালোকাপড় ও পচা ডিম ছুঁড়ে মারে। পাল্টা দর্শক শ্রোতারা হাতের সাদা স্যুভোনীর নেড়ে তার জবাব দেয়।

ইউকসু, রাকসু ও বাকসুতে নির্বাচন

৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৯) ইউকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এখানে বিভক্তভাবে নির্বাচন করে। ছাত্রলীগ (সু-র) ও ছাত্র ইউনিয়ন, ৫ দল সমর্থক ছাত্র সংগ্রঠনগুলি যৌথভাবে এবং জাতীয়বাদী ছাত্র দল নির্বাচনে এককভাবে অংশ নেয়। ছাত্রলীগ (সু-র) এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ইউকসুর আসনে ভাগাভাগি করে জয় লাভ করে।

রাকসুতে ২৭ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রলীগ (মু-না), ছাত্র সমিতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত জোট 'মুন্না-জিয়া-বাবু-লিঙ্কন পরিষদ জয় লাভ করে। এরা মোট ৪৩ শতাংশ ভোট লাভ করে।

ছাত্রলীগ (সু-র) এবং জাতীয় ছাত্রলীগ আলাদা শাহ আলম-রায়হান পরিষদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই জোট লাভ করে ১৬ শতাংশ, জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ১৫ শতাংশ এবং ইসলামী ছাত্র শিবির ১৫ শতাংশ ভোট লাভ করে।

বাকসুতে ছাত্রলীগ (সু-র) এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ পরিষদ জয়লাভ করে।

দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে সেখানে নির্বাচন ঘোষণা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

নকলের বিরুদ্ধে যুব আন্দোলন

এরশাদ আমলে অপরাপর বিভিন্ন রকম দূর্নীতি ও নৈরাজ্যের মতোই পরীক্ষায় নকল প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে। নতুন উপজেলা পদ্ধতি করার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নতুন নতুন কেন্দ্র হওয়ার কারণে বেসরকারী স্কুল-কলেজের এক শ্রেণীর দূর্নীতিবাজ শিক্ষক, ছাত্র সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে অবাধ নকলের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেন। পূর্বে এদেশে গ্রাম থেকে শহরে যেত পরীক্ষা দিতে, এরশাদ আমলে অন্যান্য অনেক কিছুর মতো এক্ষেত্রে বিপরীত হাওয়া বইতে শুরু করে। শহর থেকে ঢালাওভাবে উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার্থীরা ভিড় জমাতে শুরু করে।

বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন সমাজের এই অবক্ষয় রোধে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ কল্পে এক প্রচারাভিযান শুরু করে। ১২ মার্চ (১৯৮৯) যুব ইউনিয়ন ঢাকায় মিরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ১৩ মার্চ ঢাকা-ময়মনসিংহের সড়কপথের দু'পাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রচারকার্য চালিয়ে ছাত্র ও অভিভাবক মহলে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

যুব ইউনিয়নের এই মহতী প্রচেষ্টায় অংশ নেন অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর ও লাকী ইনাম, ফুটবলার ওয়াসিম, যুবনেতা মাহাবুবজামান ও হিলাল উদ্দীন।

শিবিরের টুপীর ভেতরে বোমা

২০ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা অস্ত্রসহ উপাচার্য আমানুল্লাহ আহমদের বাস ভবনে হামলা চালায়। শিবির কর্মীরা পুলিশকে এড়ানোর জন্যে টুপী ও ব্যাগে বোমা ও অস্ত্র নিয়ে যায়। তারা ক্রমাগত বোমাবাজি করতে থাকে এবং টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র সহ ৫০ জন শিবির কর্মীকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ জন শিক্ষক এই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, সম্প্রতি রাকসু নির্বাচনে নিদারুণভাবে পরাজিত হয়ে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে।

বি.সি.এস অফিসারদের ক্ষোভ

২১ এপ্রিল (১৯৮৯) বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন তোলেন বি.সি.এস (প্রশাসন) সমিতির মহাসচিব ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর। তিনি এদিন কারিগরী মিলনায়তনে বাংলাদেশ নাগরিক কমিটি আয়োজিত এক সেমিনারে বলেন, সরকারে অবস্থিত সিভিল সার্ভেন্টরা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, ব্যক্তি বিশেষের নয়। তিনি বলেন, ক্যাডার সার্ভিসের প্রত্যেকটি সদস্যকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার ও পদন্নোতির সুযোগ দিতে হবে। বি. সি. এস–এর ৩০টি ক্যাডারের বাইরে থেকে কাউকে নিয়োগ করা যাবে না এবং ৫৭ বছরে বেশী চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানো চলবে না।

উল্লেখ্য, এই সময় বিভিন্ন সরকারী শূন্যপদে সেনাবাহিনীর লোক এনে বসানো হচ্ছিল। সিভিল সার্ভিসের সচিব পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা সেনাবাহিনীর সাথে আপোষ রফা করে সিভিল সার্ভিসের চাকুরীতে তাদের ১০% কোটা বরাদ্দের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করছিল। এবং এই সব কর্মকর্তা তাদের অবসর গ্রহণের সময় চলে আসলেও বিভিন্নভাবে আইন করে তাদের জন্যে চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে।

বস্তুতঃ এইভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমলা, সেনাঅফিসার ও ব্যক্তিত্বহীন রাজনৈতিকদের ভাগাভাগির কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়। একই সাথে এরশাদের মন্ত্রিসভায় আমলা এ.বি. এম গোলাম মোস্তফা, সেনা অফিসার মেজর জেনারেল মুনএম, কর্ণেল জাফর ইমাম এবং রাজনীতিক কাজী জাফর, শাহ মোয়াজ্জেম শোভা পেতে থাকেন। রাজাকার মাওলানা মান্নান ও মুক্তিযোদ্ধা এ.কে খন্দকার একই মন্ত্রিসভায় দৃষ্টিকটুভাবে অবস্থান করেন।

অশোভন উক্তির প্রতিবাদে নারী সংহতি

২৩ মে (১৯৮৯) ফ্রিডম পার্টির স্বঘোষিত সংসদ সদস্য মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা জাতীয় সংসদে বলেন, শিল্পকলা একাডেমীতে যেসব মেয়েরা যায়, তাদের সাথে প্রমোদবালাদের মিল রয়েছে।

২৭ মে বাংলাদেশ নারী সংহতির সভানেত্রী অধ্যাপিকা খালেদা খানম ও সাধারণ সম্পাদিকা বেগম জোবাইদা রহমান এক বিবৃতিতে এর প্রতিবাদ করে বলেন, বজলুল হুদার মতো স্বঘোষিত জনপ্রতিনিধিকে ঝাঁড়ু পেটা করে দেশছাড়া করা হবে। স্বৈরাচারী এরশাদের কোলে বসে মা–বোনদের প্রতি এমনিতর অবমাননাকর উক্তির একমাত্র শাস্তি হতে পারে জিহবা টেনে ছিড়ে ফেলা।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত গণতন্ত্রের দাবীতে চীনে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের ১৬ মে (১৯৮৯) চীন সফরের সময় ছাত্ররা এই আন্দোলনকে এক চরম পর্যায়ে নিয়ে আসে। চীনে সামরিক আইন জারী করা হয়। তবু ছাত্ররা ভয় পায় না। তারা দিনের পর দিন তিয়েন আনমেন স্কোয়ার দখল করে রাখে।

৪ জুন চীনা সেনাবাহিনী ছাত্রদের ওপর ট্যাংক ও মেশিনগান তুলে দিলে গুলীতে হাজার হাজার ছাত্র জনতা নিহত হয়। বাংলাদেশে বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক জাকির মোস্তাফিজ মিলু এক বিবৃতিতে চীনে ছাত্র হত্যার নিন্দা করে বলেন, এতে চীনে ছাত্র আন্দোলন দমন করা যাবে না।

বিপ্লবী ছাত্রধারাও চীনে ছাত্র হত্যার নিন্দা করে অনুরূপ বিবৃতি দেয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কনভেনশন

৪ জুন অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় ছাত্র কনভেনশন। এদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সারাদেশের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা ঢাকা কনভেনশনে যোগদান করে। কনভেনশনে ছাত্রদের ১০ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। তবে সংগ্রাম পরিষদভুক্ত সংগঠনগুলির মধ্যকার আন্তঃমতাদর্শগত বিরোধকে কেন্দ্র করে জটিলতা থাকায় কনভেনশন নাম মাত্র অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৮৯ সালের ডাকসু নির্বাচনের পর থেকেই ছাত্র আন্দোলন মূলতঃ ক্যাম্পাস কেন্দ্রীক হয়ে পড়ে। ক্যাম্পাসের বাইরে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে যাওয়ার জন্যে সারাদেশের ছাত্রদের কাছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একটি কর্মসূচী দেয় বটে, কিন্তু তা সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপকভাবে–এ ব্যাপারে উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব ছিল। ডাকসুতে সংগ্রাম পরিষদের বিজয়ের পরে জনগণের মাঝে কোনো আশাবাদ বা তাপ সৃষ্টিতে সংগঠনগুলি সমর্থ হয় না। যদিও সারাদেশেরই ডাকসুসহ রাকসু, ইউকসু, জাকসু, বাকসু বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একক পরিষদে না হলেও সংগ্রাম পরিষদভুক্ত সংগঠনগুলিই জিতে আসে।

ছাত্র নেতারা এই পরিস্থিতি গভীরভাবে মূল্যায়ন করে। একটা হতাশার ভাব সর্বত্র চলছিল। ডাকসু নির্বাচনের পর ছাত্রী মিছিলে হামলার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক বা আইনগত কোনো ব্যবস্থাতেও সংগ্রাম পরিষদ সফল হয় না। বলতে গেলে কি, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে ছাত্র সংগ্রাম

পরিষদ ব্যর্থ হয়। একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছিল, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল একাই সারাদেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড়িয়ে গেছে এবং একক বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে।

এই প্রেক্ষাপটেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কতিপয় ছাত্র সংগঠন দেশে বৃহত্তম ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সহ ছাত্রদের বৃহত্তর মোর্চা গঠনের প্রয়াস চালায়। কিন্তু প্রধানভাবে ছাত্রলীগ (সু-র) এতে আগ্রহ কম দেখাতে থাকে। ফলে কনভেনশনে ছাত্রদলকে নিয়ে আসা সম্ভব হয় না।

কয়েক হাজার নেতা কর্মীর সমাবেশিত এই কনভেনশনে ১২ জুন থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক লম্বিত কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

বলা হয়, ১২ জুন (১৯৮৯) থেকে ৩০ জুন জেলা সফর ও কর্মীসভার আয়োজন করা হবে।

এই সময় ১১ জুন শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি ও সামরিক খাতে বাজেট কমানোর লক্ষ্যে সারাদেশে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে।

৫ জুলাই শিক্ষা বোর্ডের সামনে বিক্ষোভ,

২০ আগষ্ট উপজেলা পরিষদ কার্যলায় ঘেরাও

৪ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও

১৬ সেপ্টেম্বর সচিবালয় ঘেরাও এবং

১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন করা হবে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল দীর্ঘ বিরতির পর সংগ্রামী ছাত্র জোট আবার পুনরুজ্জীবিত করে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিরুদ্ধে তাদের মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু করে। ৩ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবে এক লিখিত ভাষণে ছাত্রদল সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, বর্ধিত ছাত্র বেতনের প্রতিবাদে আমরা পূবর্তন ২২ ছাত্র সংগঠন একত্রে দাঁড়াতে পারলেও ৮৭-র ১০ নভেম্বরের পর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভুক্ত দল এক দফা ভিত্তিক আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়ে, স্বৈরাচারী সরকারকে মুখ্য শত্রু চিহ্নিত না করে হটাৎ করে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জিগির শুরু করে। তারা স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা শব্দ দু'টিকে লেজে গোবরে করে ফেলেন এবং গত ১৫ মাস যাবৎ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও সমন্বিত আন্দোলনের কর্মসূচী না দিয়ে দেশের সকল

প্রতিষ্ঠানে 'শিবির হটাও', 'মৌলবাদীদের রুখো' নীতি অবলম্বন করে প্রতিক্রিয়াশীল এই গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষে-সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন।

সংগ্রামী ছাত্রজোট একই সাংবাদিক সম্মেলনে ৪ জুন থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আন্দোলনের এক দীর্ঘ কর্মসূচীও ঘোষণা করে। বলা হয়,

৪ জুন দাবী দিবস

৮ জুন থেকে ৭ জুলাই দেশব্যাপী গণসংযোগ

২৫ জুন নতজানু পররাষ্ট্রনীতির প্রতিবাদে স্মারকলিপি পেশ

৩০ জুলাই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ,

২০ আগষ্ট উপজেলা পরিষদ ঘেরাও

১২ থেকে ১৪ জুলাই প্রচার দিবস

১৫ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল

১৬ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সমাবেশ,

১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন করা হবে।

ডাকসুতে অশনি সংকেত

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কনভেনশন ও সংগ্রামী ছাত্রজোটের সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মসূচী ঘোষণার পূর্বেই ডাকসুতে নতুন সংকটের সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগের সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর (তিনি ডাকসুর সহসভাপতিও) তাঁর কক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একটি আলোকচিত্র স্থাপন করেন।

আলোকচিত্রটি তিনি অনেক দিন ধরেই প্রতিস্থাপন করেছিলেন। অন্যান্য সংগঠনগুলি বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখেন নি। কিন্তু দৈনিক মিল্লাত, ইনকিলাব, দেশ এবং সরকারী দৈনিকগুলি এই নিয়ে প্রতিদিন উত্তেজনাকর সংবাদ ছাপতে থাকেলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত সংগঠনগুলির পক্ষে বিষয়টি আর এড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। বস্তুত সত্য হলেও বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, উপরিউক্ত সংবাদপত্রগুলি বিষয়টি নিয়ে প্রতিদিন উত্তেজনাকর খবর না ছাপলে বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্র সংগঠন গুলি হয়তো বিষয়টি এড়িয়েই যেত। সংবাদপত্রগুলি ডাকসু অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলার বিষয়টি এমন করে ছাপতে থাকায়, রাজনৈতিকভাবে ৫ দল সম্পর্কি ত ছাত্র সংগঠনগুলির কাছে তা একটি মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

৫ দলভুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলি ছাত্রলীগ (হাবিব-অসীম)-কে শেখ মুজিবের ছবি ডাকসু অফিস থেকে নামিয়ে ফেলার অনুরোধ করে। কিন্তু এই অবস্থায় ছাত্রলীগ (সু-র)-এর জন্যেও তা মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পত্র-পত্রিকায়

এতোদিনে বিষয়টি এমনভাবে সাজিয়ে ফেলা হয়েছিল যে, জাতির জনকের আলোকচিত্র তুলে আবার নামিয়ে ফেলা তাদের পক্ষে রাজনৈতিক মৃত্যুর সমান হয়ে দাঁড়ায়।

এই অবস্থায় ছাত্রলীগ (সু-র) এবং প্রতিপক্ষ ছাত্রলীগ (মু-না), বাসদ ছাত্রলীগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রী যার যার অবস্থানে অটল থাকে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এই অবস্থায় একটি আপোষ প্রস্তাব আনে যে, বঙ্গবন্ধুর প্রতি ছাত্র সংগঠনগুলো একটি আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন করে আলোকচিত্রটি ডাকসু অফিস থেকে নামিয়ে ফেলবে। কিন্তু কোনো পক্ষ থেকেই এই ব্যাপারে সাড়া মেলে না।

এই অবস্থায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কার্যতঃ নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে। একদিকে এমনিতেই কোনো ছাত্র আন্দোলন নেই, তারপর নিজেদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব, ছাত্র আন্দোলনকে এই ভাবে হতাশ প্রান্তে নিয়ে আসা হয়।

ছাত্রদলের ঠেকে শেখা

এর মধ্যে ১৫ আগষ্ট (১৯৮৯) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ঘটনা ঘটে। ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির ১৪ আগষ্ট এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তার জের হিসেবে ১৫ আগষ্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির পুনরায় সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে ছাত্রদল কর্মী ইতিহাস বিভাগের ছাত্র হাবিবুর রহমান কবির গুরুতর আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। ২১ আগস্ট কবির হাসপাতালে মারা যায়। এই খবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৌঁছলে ছাত্রদল কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে এবং পাগলের মতো দিকবিদিক শিবির পেটানো শুরু করে। সকালেই ক্যাম্পাসে ছাত্রদল কর্মীরা ৪ জন শিবির কর্মীকে প্রহার করে আহত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরণ করে।

কবিরের লাশ হাসপাতাল থেকে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে নিয়ে আসলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। এই সময় ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় অবস্থানরত শিবির কর্মীরা নিরাপত্তার অভাবে দল বেধে হল ত্যাগ করে।

অন্যদিকে অনির্ধারিত ভাবে ২২টি ছাত্র সংগঠন আবার ঐক্যবদ্ধ মঞ্চে এসে যায়। সর্বদলীয় ছাত্র সমাজে একই সাথে বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান রিপন, জহিরুদ্দিন স্বপন, মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল, নাজমুল হক প্রধান, অসীম কুমার উকিল, কামাল হোসেন প্রমুখ।

ছাত্রনেতারা স্বত:স্ফূর্ত তিন দিনের শোক কর্মসূচী গ্রহণ করে বলেন, আমাদের মধ্যে যতো অনৈক্য ও বিভেদ থাকুক না কেন, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি এবং থাকব।

১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে ছাত্র শিবির বিরোধী কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কারণেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্র জোট বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ছাত্রদল সেই সময় ছাত্র শিবির বিরোধী কর্মসূচী নিতে অনীহা প্রকাশ করেছিল। ছাত্র শিবির সম্পর্কে ছাত্রদল তাদের মূল্যায়ন পরিবর্তন করলে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এই সময় শিরোনাম করে, 'ছাত্রদলের ঠেকে শেখা'।

২২ ছাত্র সংগঠন ঘোষণা করে, স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দেশের কোনো শিক্ষাঙ্গনে আর রাজনীতি করতে দেয়া হবে না। আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, স্বাধীনতার পর সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ক্ষমা করা এবং তাদের পুনর্বাসিত করার মতো ভুল দ্বিতীয়বার আর করার কোনো সুযোগ নেই। স্বাধীনতার সপক্ষের ছাত্র সংগঠন গুলোর মধ্যে যতোই অনৈক্য ও বিভেদ থাকুক জামায়াত শিবির চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই।

মাধ্যমিক পর্যায়ে টেকস্ট বই প্রকাশের দায়িত্ব বেসরকারী খাতে অর্পণ এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি বিষয়ে তিনটি করে বই প্রকাশের সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবীতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সারাদেশে ২ আগষ্ট ধর্মঘট পালন করে। রাজধানীতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের দাবীর সমর্থনে মিছিল বের করে।

১৭ আগষ্ট ছাত্র সমাবেশ শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পুনরায় স্মারকলিপি প্রদান করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন অব্যাহত থাকার পরও পান্ডুলিপি চেয়ে টেন্ডার আহবানের নিন্দা করে। সংগ্রাম পরিষদ বলে, সরকারের সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির অবনতিতেই সহায়তা করবে।

খালেদা জিয়ার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি

সেপ্টেম্বর (১৯৮৮) মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আন্তঃবিরোধের সংঘর্ষে অস্থির হতে থাকে। প্রতিদিনই ছাত্রদলের বিভিন্ন উপদল একে অপরের বিরুদ্ধে গুলী, বোমাবাজি চালাতে থাকে। কখনো নীরু গ্রুপ বনাম ইলিয়াস গ্রুপ, কখনো ইলিয়াস গ্রুপ বনাম অভিগ্রুপ, আবার কখনো নীরু গ্রুপ বনাম অভিগ্রুপের মধ্যে লাগাতার সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিভীষকা নেমে আসে।

১৮ সেপ্টেম্বর রাতে উপায় না দেখে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মহলের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী দলের সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তাঁর ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসকারীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নেওয়ার আহবান জানায়। এক চিঠিতে কর্তৃপক্ষ বলে, এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে

কোন প্রাণহানী ঘটলে তার সকল দায় দায়িত্ব শ্রদ্ধেয়া নেত্রী বেগম জিয়া ও তাঁর দলের ওপর বর্তাবে।

কর্তৃপক্ষ চিঠিতে আরো বলে ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছিল এবং নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা চলছিল ঠিক সে সময়ে অত্যন্ত উদ্বেগ ও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, গত ৫ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের অভি, রিপন, আমান এবং ইলিয়াস, রফিক এই দুই গ্রুপের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি ও অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার চলে। সে রাতে জিয়াউর রহমান হলের সামনে ৪০ মিনিট ধরে আনুমানিক ২৫০ রাউন্ড গোলাগুলী চলে বলে জানা যায়। গোলা-গুলীর প্রচন্ড শব্দে সারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ক্যাম্পাসের সকলকে আতঙ্ক ও দুঃস্বপ্নের মধ্যে রাত কাটাতে হয়। অনুরূপভাবে গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত অভি গ্রুপ ও ইলিয়াস গ্রুপের মধ্যে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখস্থ স্থলে গোলাগুলী চলে।

চিঠিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরো বলে, ইত:পূর্বে যে নয়জনকে সন্ত্রাসী ও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বহিষ্কার করেছিলেন, উপরি উল্লিখিত অভি ও ইলিয়াস তাদের অন্যতম। গত ৫ ও১৭ সেপ্টেম্বর রাতের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে কারা দায়ী আবার তাই প্রমাণ করছে। বেগম খালেদা জিয়া বহুবার বিবৃতি মারফত দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্যে শিক্ষাঙ্গন ও বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করায় তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ্য। বর্তমানে তার কাজের মাধ্যমে তিনি তা প্রমাণ করবেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলেই আশাবাদী।

বেগম খালেদা জিয়ার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাঠানো চিঠিকে জাতীয়তাবাদী দল নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। তারা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলে যে, খালেদা জিয়ার কাছে পাঠানো চিঠিটি নিজের দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপানোর অপচেষ্টা মাত্র। চিঠিটি অশালীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উপাচার্যের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে জনপ্রিয় জননেত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার এক নজিরবিহীন আহবান জানানো হয়েছে।

বি.এন.পি পাল্টা প্রশ্ন করে মাননীয় উপাচার্য ও বর্তমান সরকার প্রধানের কাছে প্রশ্ন এতো অস্ত্র ও গোলাবারুদ আসে কোথা থেকে? বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রেখে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা মূলতঃ উপাচার্যের দায়িত্ব।

বি.এন.পি.র এই বিবৃতিতে রাজনৈতিক মহল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মহল বিস্মিত হয়। কারণ দিনের পর দিন ছাত্রদলের নেতৃস্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস চলে আসছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছিল লেবাননের বৈরুত নগরীতে। যদি বি.এন.পি-র অভিযোগ সত্য হয় যে, সরকারই এই সব অস্ত্রের মূল যোগানদার, তাহলে অস্ত্রধারীরা নিঃসন্দেহে সরকারের এজেন্ট। বি.এন.পি কেন তাহলে এই অস্ত্রধারীদের নিজ দল থেকে বহিষ্কার করে দিচ্ছে না। অস্ত্রবাজী করার জন্যে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে বি. এন.পি কেন তাদের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানায়। যদি সরকারী দলের কাছে অস্ত্র থাকলে দোষ হয়, তাহলে বিরোধী দলের কাছে অস্ত্র থাকলে দোষ হবে না কেন?

অস্ত্রধারীরা এই সময় ৪টি মূল সংগঠনে আশ্রয় নেয়। সংগঠনগুলি হচ্ছে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (সু-র), ছাত্রলীগ (মু-না) ও নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ। তবে সরকারী সংগঠন নতুন বাংলা ভেঙে দেওয়ায় এই সংগঠনের অস্ত্রধারীরা পরোক্ষভাবে অস্ত্রবাজিতে অংশ নেয়। সংগঠনগুলি সকলেই অস্ত্রধারীদের নিজ নিজ সংগঠন থেকে বের করে দিতে ব্যর্থ হয়। তবে অস্ত্রধারীদের প্রধান অংশ ছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আশ্রয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই চিঠি বি.এন.পি প্রত্যাখ্যান করায় এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগিতায় ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৮৯) ছাত্রাবাসগুলোতে তল্লাশী অভিযান চালায়। মোট ৪ ঘন্টা স্থায়ী এই অভিযানের সময় মহসিন হল, সূর্যসেন হল, জসীমউদ্দীন হল, মুজিব হল, জিয়া হল ও জহুরুল হক হল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ছাত্রদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গোলাম ফারুক অভিসহ এই সময় ৩৪ জন গ্রেফতার হয়।

ছাত্রদল এই অভিযানের বিরুদ্ধে মিছিল বের করে এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিদাবী করে। ছাত্রদল নেতা ইলিয়াস আলী ও ফজলুল হক মিলনের নেতৃত্বে এক মিছিল ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ করে। বক্তারা ক্যাম্পাসে পুলিশের প্রবেশ ও হল তল্লাশির সমালোচনা করে বলেন, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন লঙ্গিত হয়েছে। তারা ৪ অক্টোবর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডাকে।
দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট করে যে, গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল নেতা গোলাম ফারুক অভি পুলিশের কাছে এক জবানবন্দিতে বলে, রাজনৈতিক দল বি. এন. পি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন সিনিয়র অধ্যাপক তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে তাকে দিয়ে অস্ত্র ব্যবহার করেছে।[৩৫]

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের রণক্ষেত্র এতেও বন্ধ হল না। ২ অক্টোবর আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ (হাবিব-অসীম) -এর সাথে ছাত্রদলের গোলাগুলী ও বোমাবাজি চলতে

থাকে। ছাত্রদল নেতা আসাদুজ্জামান রিপন ও ছাত্রলীগ নেতা কামরুজ্জামান আনসারী পরস্পর প্রতিপক্ষের হাতে লাঞ্ছিত হন।

'সংবাদ'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন ছাত্রনেতা বলেন, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী অভিযানের মধ্য দিয়ে আবারো প্রমাণিত হল অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা ক্যাম্পাসে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় থাকে। এসব সংগঠন অস্ত্রধারীদের প্রশ্রয় দিয়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত করছে এবং সরকার এর সুযোগ নিচ্ছে।

ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেফতারের পর তাদের মুক্তির দাবী জানালে সন্ত্রাসকেই উৎসাহিত করা হয়। ছাত্রনেতা নাজমুল হক প্রধান বলেন, একাধিকবার তল্লাশির পরও ক্যাম্পাসে অস্ত্র থেকে যায়, এখানো আছে। সরকার ইচ্ছা করেই তা রেখে দেয়। ছাত্রনেতা জহিরুদ্দিন স্বপনও বলেন, সরকার কোন সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ক্যাম্পাসে তল্লাশি চালাচ্ছে না, ছাত্র রাজনীতিকে হেয় করার জন্যে তা করা হচ্ছে। কয়েকটি ছাত্র সংগঠন অস্ত্র ও অস্ত্রধারীদের সাথে রেখে সরকারকে লাভবান করছে।

জহিরুল হক হল থেকে অস্ত্র রাখার দায়ে ছাত্রলীগ (হা–অ) কর্মী টোকন, আলতাফ ও তাহেরকে গ্রেফতার করায় আওয়ামী লীগ নেতা আমীর হোসেন আমু প্রতিবাদ জানিয়ে ৯ অক্টোবর সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন।

সুপ্রীম কোর্টে এরশাদ পরাজিত হলেন

২ সেপ্টেম্বর (১৯৮৯) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এক যুগান্তকারী সাহসী রায় দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে। এরশাদের ভোট ডাকাতির সংসদে অষ্টম সংশোধনীর হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশের আইনজীবীরা সুপ্রীম কোর্টে যে মামলা দায়ের করেছিলেন তাতে সরকারের রাজনৈতিক ও নৈতিক পরাজয় ঘটে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী, বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ (পরবর্তী কালে এরশাদ পতনের পর তিনি বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন), বিচারপতি এম. হাবিবুর রহমান ও বিচারপতি এ. টি. এম. আফজাল (তিনি রায়ের পক্ষে দ্বিমত পোষণ করেন)–এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ জাতীয় সংসদে গৃহীত অষ্টম সংশোধনীর হাইকোর্ট বিষয়ক ধারাটি বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক মহলে এই বিজয়ে প্রবল উল্লাস ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সরকারী মহল এই রায়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে ভাঙন

১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এরশাদের শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান ঘোষিত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের জন্য ১৪টি ছাত্র সংগঠন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছিল। এর সদস্য ছাত্রগুলি ছিল।

১. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও খ. ম. জাহাঙ্গীর-এর নেতৃত্বাধীন)
২. বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক ও আনোয়ারুল হক-এর নেতৃত্বাধীন)
৩. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মুনিরউদ্দীন আহমদ ও আবুল হাসিব খান-এর নেতৃত্বাধীন)
৪. বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী (ফজলে হোসেন বাদশা ও আতাউর রহমান ঢালীর নেতৃত্বাধীন)
৫. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ফজলুর রহমান ও বাহালুল মজনুন চুন্নুর নেতৃত্বাধীন)
৬. বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি (আসাদুল্লাহ তারেক নেতৃত্বাধীন)
৭. বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (মিজানুর রহমান মানু নেতৃত্বাধীন)
৮. বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (আশরাফ গিরানীর নেতৃত্বাধীন)
৯. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আখতারুজ্জামান ও জিয়াউদ্দিন বাবলুর নেতৃত্বাধীন)
১০. জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন
১১. ছাত্রলীগ (প্রধান)
১২. সমাজবাদী ছাত্র জোট
১৩. ছাত্র ঐক্য ফোরাম
১৪. জাতীয় ছাত্র সংসদ।

এই সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে তা ছিল নিম্নরূপ:

১৯৮২, ১৭ সেপ্টেম্বর: ১৪ টি ছাত্র সংগঠন এবং ডাকসুর সমন্বয়ে ১০ দফা দাবীর ভিত্তিতে আনুষ্ঠনিকভাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ডাকসু ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আখতারউজ্জামান (ডাকসু সহসভাপতি)। সম্মেলনে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচীও ঘোষিত হয়।

১৯৮৩, ১৪ ফেব্রুয়ারী: মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে শিক্ষাভবন ঘেরাও-এর কর্মসূচীতে পুলিশের গুলীবর্ষণ। ৩ জন নিহত। দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

১৯৮৩, ২২ জুন: ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুর আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম পরিষদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ

১৯৮৬, ৮ ফেব্রুয়ারী: বিভিন্ন প্রশ্নে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মতবিরোধ

১৯৮৬, ২৭ মার্চ: আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন প্রশ্নে সংগ্রাম পরিষদে ভাঙন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুজিববাদী ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় ছাত্রলীগ সহ কয়েকটি ছাত্রসংগঠন নির্বাচনের পক্ষে, অন্যদিকে জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্রলীগ, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রী নির্বাচনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়

১৯৮৬, ৩০ মার্চঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগ্রাম পরিষদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আসলামের মৃত্যু

১৯৮৭, ১৭ সেপ্টেম্বর: যুগপৎ কর্মসূচীর মাধ্যমে সংগ্রাম পাষিদের দুই গ্রুপের ঐক্য প্রয়াস

১৯৮৭, ২১ ডিসেম্বর: বর্ধিত ছাত্র বেতনের প্রতিবাদে ২২টি ছাত্র সংগঠনের ঐক্য প্রয়াস

১৯৮৮, মে: সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতার প্রশ্নে ছাত্রদলের সাথে ১৩টি ছাত্র সংগঠনের মতবিরোধ

১৯৮৮, ১৭ জুন: নতুন আঙ্গিকে ১০ দফা প্রণয়নের মাধ্যমে ১৩টি ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে সংগ্রাম পরিষদের পুন: গঠন।

১৯৮৯, ৯ ফেব্রুয়ারী: ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিষদের ডাকসুতে বিজয়।

১৯৮৯, ১৭ মে: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ডাকসু সহসভাপতির কক্ষে লাগানো নিয়ে সংগ্রাম পরিষদে মতবিরোধ

১৯৮৯, ৪ জুন: সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র কনভেনশন এবং ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা

১৯৮৯, ২৮ সেপ্টেম্বর: ৯টি ছাত্র সংগঠনের আনুষ্ঠানিকভাবে ঐক্যবদ্ধ স্বৈরাচার সাম্প্রদায়িক এবং সন্ত্রাসবিরোধী কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব

১৯৮৯, ৩ অক্টোবরঃ ৯টি ছাত্র সংগঠনের পৃথক বিবৃতি।

দীর্ঘ সাত বছর ক্রমাগত সংগ্রাম মুখর এই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নিজেদের মধ্যে আন্ত:মতাদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ১৯৮৯ সালের মাঝ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবেই এগিয়ে আসছিল। এরমধ্যে সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে-কমেছে। আবার সংগ্রামী ছাত্রজোটের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে গিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নাম ব্যবহার স্থগিত রেখে ২২ ছাত্র সংগঠন নামে নতুন জোটবদ্ধ আন্দোলন করেছে।

কিন্তু এই প্রথম ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাঙতে এগিয়ে আসে ৯টি ছাত্র সংগঠন। ৯ ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছিলঃ ১. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (নাজমুল হক প্রধান ও শফি আহমেদ নেতৃত্বাধীন) ২. বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী (জহিরুদ্দিন স্বপন ও নূর আহমেদ বকুল নেতৃত্বাধীন), ৩. বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আ-মো), ৪. গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন (আখতার সোবহান মাশরুর ও সুজাউদ্দীন জাফর নেতৃত্বাধীন), ৫. সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট (মোস্তফা ফারুক ও বজলুর রশীদ ফিরোজ-এর নেতৃত্বাধীন), ৬. ছাত্র ঐক্য ফোরাম (মাশরেফা মিশু নেতৃত্বাধীন), ৭. বাংলাদেশ ছাত্র কেন্দ্র (মিরাজুল ইসলাম আব্বাসী নেতৃত্বাধাধীন), ৮. বিপ্লবী ছাত্র ধারা (আমিরুল হক আমিন), ৯. সমাজবাদী ছাত্র জোট।

উল্লিখিত ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে ৫ টির মতো সংগঠন একবারেই ছিল নাম সর্বস্ব। শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের ছাত্রফ্রন্ট সমাজবাদী ছাত্র জোট শুধু নামে ছিল। একজন কর্মী বা নেতাকেও পাওয়া যেতনা। ছাত্র ঐক্য ফোরাম নামমাত্র সংগঠন হয়েও তাতেও তিনটি প্রকাশ্য উপদলের অস্তিত্ব ছিল। ছাত্র কেন্দ্রের অবস্থাও তদ্রুপ।

এমন একটা অবস্থায়ও ৯ ছাত্র সংগঠন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসে। এভাবেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দীর্ঘ ৭ বছর পর ভেঙে যায়। এর সম্ভাব্য প্রভাব পড়ে ডাকসুতেও। ডাকসুতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মোটামুটি সকল সদস্যের প্রতিনিধিত্ব ছিল। ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেন ৯ ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দেন।

২২ অক্টোবর ডাকসুভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৯ ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এক লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেন। এতে দেশের বর্তমান নিস্ক্রিয় ছাত্র রাজনীতিকে চাঙ্গা করে বৃহত্তর ছাত্র ঐক্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যায়ে ব্যক্ত করা হয়।

ছাত্রনেতা মুশতাক বলেন, একটি ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে শুধু বি.এন.পি বিরোধী ছাত্র মোর্চা হিসেবে ভূমিকা পালনের চেষ্টা নেওয়ায় বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ডাকসুর সহসভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর ও ছাত্রলীগ (হাবিব-অসিম) নেতারা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ভাঙনকে সরকারের বহুদিনের নীল নকশার সফল বাস্তবায়ন বলে মন্তব্য করেন। তারা বলেন, জাসদ ও বাসদপন্থী ছাত্রলীগ ও অন্যান্যরা সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়নে সাহায্য করলো।

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক ও জাসদপন্থী ছাত্রলীগের নেতা মুশতাক হোসেন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের নেতা মোস্তফা ফারুক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে আনুষ্ঠানিক ভাঙনের ঘোষণা দেওয়ার পটভূমি ব্যাখ্য করে এই লেখককে বলেন, বাইরে থেকে হিসেব করলে মনে হয়, এতে সরকারের 'ডিজাইন'ই বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ছাত্র আন্দোলন পূর্বের চেয়ে আরো হতাশাগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু এটা ছিল মুজিববাদী ছাত্রলীগের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। স্বচ্ছ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে এর প্রয়োজন ছিল। এরশাদ সরকার ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল যা চাচ্ছিল, ৯ ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভেঙে দিয়ে তা-ই করে দিল, অভিযোগ সত্য নয়।

মুশতাক হোসেন ও মাস্তফা ফারুক আরো বলেন, দেশে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রয়োজন ছিল। তাদের শক্তিকে অস্বীকার করার কোনো যৌক্তিক কারণ ছিল না।

১৯৮৮ সালের ১৩ মে চট্টগ্রামে ছাত্র শিবিরের তান্ডবের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্রদল অস্বীকৃতি জানালে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি।

১৯৮৮ সালের ১৭ জুন নতুন আঙ্গিকে ১০ দফা প্রণয়নের মাধ্যমে ১৩ ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে সংগ্রাম পরিষদ আবার পুনর্গঠন করা হয়।

১৯৮৯ সালের ২১ আগষ্ট ছাত্রদল কর্মী কবির জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হলে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের পুনরায় সম্ভাবনা দেখা দেয়। ২২টি ছাত্র সংগঠন একত্রিত ভাবে তিন দিনের শোক দিবস পালন করে। কিন্তু আবার এতে অচলাবস্থা দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ পন্থী ছাত্রলীগ দেশের সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করে বি.এন.পি-র ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাথে এক মঞ্চে ছাত্র আন্দোলন করতে ইচ্ছুক ছিল না। তিন দিনের শোক কর্মসূচীর পর তারা ছাত্রদলকে নিয়ে আর আগাতে চায় নি।

ছাত্রনেতা মুশতাক হোসেন ও মোস্তফা ফারুক এই প্রসঙ্গে বলেন, ছাত্রদলের 'ঠেকে শেখা' মূল্যায়নকে আমাদের কাজে লাগানো প্রয়োজন ছিল। এতে স্বৈরাচার ও

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠতে পারতো। কিন্তু এরই মধ্যে ডাকসুর সহসভাপতি ও ছাত্রলীগ (হা-অ) নেতা সুলতান মোহাম্মদ মনসুর তাঁর কক্ষে শেখ মুজিবের ছবি তুলে বসে। সংবাদপত্রগুলি এই নিয়ে পরিস্থিতি আরো জটিল করে তোলে। এই পরিস্থিতিতেও বৃহত্তর ছাত্র ঐক্য গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে এক বিবৃতিতে একমাত্র ছাত্রলীগ নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব আপত্তি জানায়'।৩৬

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভেঙে যাওয়ার পূর্বক্ষণে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও জাতীয় ছাত্রলীগ একটি ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালায়। তারা সংগ্রাম পরিষদ ভেঙে যাওয়ার চেয়ে যা আছে তা-ই নিয়ে অগ্রসর হতে চায়। অন্যদিকে, ঐক্য প্রক্রিয়ায় রাজী না হওয়ায় ছাত্রলীগ (হা-অ)-কে বাদ দিয়ে ছাত্রদলকে নিয়ে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের ডাকের প্রস্তাব বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বাতিল করে দেয়। ৯ ছাত্র সংগঠনের পক্ষথেকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়ন বলে, এ ক্ষেত্রেও বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন সম্ভব ছিল না। কারণ তাহলে একইভাবে একটি বৃহৎ সংগঠন ছাত্রলীগ (হা-অ) বাদে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন সারাদেশে ব্যাপকতা লাভ করতে পারবে না, যেমন সম্ভব নয় ছাত্রদলকেও বাদ দিয়ে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল ও নাসির উদ দুজা বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রলীগ (হা-অ)-এর নেতিবাচক মনোভাবকে সমালোচনা করেন। একই সাথে তারা বলেন, বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের কথা বলে ৯ ছাত্র সংগঠনের বিভক্তি প্রয়াস নিন্দনীয়। তাঁরা বলেন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দশ দফা নিয়ে কোনো মত প্রার্থক্য নেই, দেশের বিভিন্ন স্থানে এখনো পরিষদের ব্যানারেই তৎপরতা চলছে। অথচ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটি অংশ দুঃখজনক ভাবে পরিষদকে অকার্যকর করে তুলছেন। তাঁরা আরো বলেন, ডাকসু অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি লাগিয়ে সুলতান যেমন ভুল করেছেন, তেমনি মুশতাকও ডাকসুর প্যাডে সংগ্রাম পরিষদ ভাঙার বক্তব্য স্থাপন করে ভুল করেছেন।৩৭

জাতীয় ছাত্রলীগের নেতা জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু ও এস. এম কামাল হোসেন এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের হাতে কোনো মিক্সার মেশিন নেই যে, সংগঠনগুলোকে মেশিনে চাপ দিলেই বৃহত্তর ঐক্য হয়ে যাবে। বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। বৃহত্তর ঐক্যের রোমান্টিকতার জন্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভাঙার তারা নিন্দা করেন।৩৮

রাকসু ৯ ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগ সমর্থন করে বিবৃতি দেয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল বলে, এটা একটা শুভ উদ্যোগ। তারা ৯ ছাত্র সংগঠনকে অভিনন্দন জানায়। ছাত্র ঐক্য সমিতি ও ইউকসুর সাধারণ সম্পাদক ৯ সংগঠনের নিন্দা করে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ কবি, সংগ্রামী পুরুষ শামসুর রাহমান ছাত্র আন্দোলনে ভাঙনের আলামত লক্ষ্য করছিলেন পূর্ব থেকেই। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে লেখেন:

'২২ ছাত্র সংগঠনের ঐক্যে ফাটল ধরেছে। এই ফাটল দেখে স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি লাভবান হয়েছে, তাই তাদের মনে আনন্দের বান ডেকেছে। প্রায় সকল ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মনে করেছেন, ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার কুমতলবে বিশেষ মহল তৎপর হয়েছে। কারা ছাত্র সংগঠনগুলোর ঐক্যে ফাটল ধরাচ্ছে?

আমরা যারা এখনো ছাত্র সমাজকে আমাদের ভরসাস্থল বলে মনে করি, তাদের দৃষ্টি ছাত্র সংগঠন সমূহের দিকে নিবদ্ধ। তারাইতো এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে আলো দেখাবে। আমরা জানি, তারা যদি এককাট্টা হয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান তাহলে জয় তাদের হবেই। সাময়িক বাধা বিপত্তি আসতে পারে, তাদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর অপচেষ্টা চালানো হবে। কিন্তু এতে দমে গেলে চলবে না।....

'যারা এই ঐক্য নষ্ট করতে চাইবে, তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিবাদী কণ্ঠ'।[৩৯]

তিব্বতের আদর্শ ও ড. আশরাফ সিদ্দিকীর আহবান

ছাত্র আন্দোলনের এই অবস্থায় সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনে একটি ঘটনা ঘটে, যা সারা বাংলাদেশে আলোড়ন তোলে। জগন্নাথ সরকারী কলেজ সরকারী ছাত্র সংগঠনের বড় মজবুত ঘাটি বলে পরিচিত ছিল। জেনারেল নিজেই তাঁর সরকারী ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত ঘোষণার পরও এখানকার সরকারী ছাত্রনেতা তিব্বত সরকারী সংগঠনের অস্তিত্ব রক্ষার্থে দোর্দন্ড প্রতাপে তার কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছিলেন। জেনারেল এরশাদের নামে তারা একটি ছাত্রাবাস করে সমগ্র বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এলাকায় নিয়মিত খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, সন্ত্রাস সকল অপকর্মের নায়ক হয়ে দাঁড়ায় তিব্বত।

তিব্বত একদিন জগন্নাথ কলেজের নিকটস্থ পতিতালয়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রতিপক্ষের হাতে মারা যায়। এই সময়ে এক শ্রেণীর শিক্ষকও কতখানি অধঃপতিত হয়ে পড়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তিব্বতের তথাকথিত শোকসভায় কলেজের অধ্যক্ষ ড. আশরাফ সিদ্দিকীর বক্তব্যে। সভাপতির ভাষণে একজন সাহিত্যিক বলে খ্যাত আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, তিব্বতের আদর্শ সকল ছাত্রকে অনুসরণ করতে হবে।

সংবাদপত্রে অধ্যক্ষ আশরাফ সিদ্দিকীর এই বক্তব্য ছাপা হলে সমগ্র শিক্ষক সমাজ তাকে এক 'কলঙ্ক' বলে অভিহিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী দৈনিক সংবাদপত্র সংবাদ-এ এক উপসম্পাদকীয় কলামে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময়কার ছাত্র সমাজের কতকগুলি নেতিবাচক দিক তুলে ধরেন। জগন্নাথ কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল কলেজ-পুরনো ঢাকার এই তিন কলেজে সরকারী ছত্রছায়ায় প্রতিষ্ঠিত ছাত্রনেতাদের প্রতাপ সমগ্র শিক্ষা জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। চৌধুরী লেখেন:

'ক'দিন আগে ছিনতাই করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে এক ছাত্র। ছাত্র নয় শুধু, ছাত্রনেতাই সে। খবরটির ভাষ্য এরকম, 'সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক আবুজর মোঃ মামুন ছিনতাই করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছে। মামুনের বাসায় একটি মোটর সাইকেল পাওয়া গেছে, যার কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই'। চমকে উঠতে হয় বৈকি। বিশেষভাবে ওই সাহিত্যের খবরটা শুনে। সাহিত্য কি তবে ছিনতাইকারীদের হাতে চলে গেল?... শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্র সংসদের নাম কিছুদিন আগে কাগজে এসেছিল, পাতলা খান লেনে চাঁদা আদায়ের তান্ডবকে জড়িয়ে। ওই শ্রীমানরাও 'নির্বাচিত' ছিলেন। পাশেই কবি নজরুল কলেজ, সেটি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। নির্বাচিতদের প্রকোপে।...

'তিব্বত নামে শক্তিধর এক ছাত্রনেতা ছিলো (অবশ্যই সরকারী দলের) আবার ওই সদরঘাটেই, জগন্নাথ কলেজের। সেও ভক্তি পেয়েছিল অনেকের। আমরা জানতাম না, জানলাম মৃত্যুর পরে। সে মারা গেছে। শিক্ষাঙ্গনে নয়, বাড়িতেও নয়, মারা গেছে খারাপ পাড়ায়। সদরঘাটে সেই পাড়ায় যার দুর্গন্ধ বিষাক্ত করে রেখেছে এলাকার একাংশকে। গভীর রাতে নোংরা জায়গায়। 'শহীদ' হলো তিব্বত, পরে আওয়াজ উঠলো, এক তিব্বতের রক্ত থেকে লক্ষ্য তিব্বত জন্ম নেবে। ভক্তরাই দিলো আওয়াজ। কলেজে সভা হয়েছে, সভাপতিত্ব করেছেন (অবশ্যই বাধ্য হয়ে),

আর কেউ নয়, কলেজের অধ্যক্ষ। সেখানে বলা হয়েছে (আমরা কাগজে পড়লাম) যে তিব্বতের আদর্শ অনুসরণ করা আবশ্যক। সেদিন রাগ নয়, আমার কান্না পেয়েছিল'।৪০

হরিপুরের তেল নিয়ে যুব আন্দোলন

রাজনৈতিক আন্দোলন ১৯৮৯ সালে দুর্বল অবস্থানে পৌছলেও হরিপুরের তেলক্ষেত্র বিদেশী কোম্পানীকে লিজ দেওয়ার চুক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতা বিবেচনা করে জোর প্রতিবাদ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন ঢাকা থেকে সিলেট ৩৪৬ কিলোমিটার পদযাত্রা করে জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে।

যুব ইউনিয়নের উদ্যোগে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি গণতদন্ত কমিশনও গঠন করা হয়। এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এর সদস্য সচিব নিয়ুক্ত হন।

খালেদা জিয়ার অনশনঃ ডান-বাম, রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধার সম্মিলন

পয়লা নভেম্বর (১৯৮৯) বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের ১২৭ জন নেতা কর্মী গুলিস্তান চত্ত্বরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে ১০ ঘন্টার এক প্রতীক অনশন পালন করেন। এই সময় মঞ্চে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ সংগঠিত হয়। ডানপন্থী, বামপন্থী, রাজাকার, মুক্তিযোদ্ধা, এরশাদ বিরোধী, এরশাদের দালাল বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনীতিক খালেদা জিয়ার অনশনে একে একে সংহতি প্রকাশ করতে যান।

এখানে বক্তৃতা করেন, ছয় দলের পক্ষে ডেমোক্রেটিক লীগের অলি আহাদ। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশীদ আমাদের বাঁচিয়েছে।

এরশাদ আমলের দুই মন্ত্রী এবং এই সময়ে মন্ত্রিসভা থেকে পতিত, 'এরশাদের ডাকে ঝাঁড়ুদার হতেও রাজী' ঘোষণাকারী আনোয়ার জাহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্যতম রাজাকার নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীও মঞ্চে এসে বক্তৃতা করেন। কিন্তু উপস্থিত বি.এন.পি নেতা কর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে টু-শব্দটিও করেনি, মঞ্চে উপবিষ্ট বেগম খালেদা জিয়া হাততালি দিয়ে তাদের স্বাগত জানান।

মুসলিম লীগ নেতা এম. এ মতিন ও সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজও এতে বক্তৃতা করেন। মতিন বক্তৃতায় বলেন, হাজেরান মজলিস, বহুদিন পর এক হতে পেরেছি। রাজিয়া ফয়েজ এর কয়েকদিন পরই এরশাদের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

এই সময় মঞ্চে একজন নতুন ঝাঁড়ুদার আগমন করেন। জেনারেল এরশাদের দালাল বলে কথিত জাতীয় দলের নেতা এডভোকেট সিরাজুল হুদা বক্তৃতা দিতে মঞ্চে উঠলে ৭ দল নেতা শামসুল আরেফিন খান, 'এরশাদের দালালদের সমর্থন চাইনা' বলে প্রতিবাদে মঞ্চ থেকে নেমে যান। এডভোকেট সিরাজুল হুদা মাইকে তখন চিৎকার করে বলতে থাকেন, আরেফিন ভাই যাবেন না, খালেদা জিয়া হুকুম দিলে আমি শহরও ঝাঁড়ু দেব।

অনশন মঞ্চের এই জগা-খিচুড়ি অবস্থায় সংহতি প্রকাশ করতে আসেন বামপন্থী জোট বলে পরিচিত ৫ দলের নেতা হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, নির্মল সেন প্রমুখ। ছাত্রনেতা মুশতাক হোসেনও এই সময় বক্তৃতা করেন।

এরশাদের সাথে ছাত্রনেতাদের বৈঠক

নভেম্বরের (১৯৮৯) প্রথম সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র নেতা যারা ডাকসু ও হল সংসদেরও নির্বাচিত কর্মকর্তা, জেনালের এরশাদের সাথে দেখা করেন। এরশাদের সাথে তাদের বৈঠকের খবর বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ বুলেটিনে সচিত্র চলমান আলোকচিত্রসহ প্রচারিত হয়।

এই বৈঠকে মহসিন হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ও ছাত্রদল নেতা এমদাদ খান, ছাত্রলীগ (হা-অ) নেতা ও সূর্যসেন হল সংসদের অন্যতম সম্পাদক মোস্তফা আরিফ, এফ রহমান হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও জাসদ ছাত্রলীগ নেতা অহিদুজ্জামান লনি সহ বিভিন্ন হল সংসদের বেশ কয়েকজনকে টেলিভিশনে দেখা যায়। এদের অনেককেই সাথে সাথে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়, অনেকে পূর্বেই পালিয়ে যায়। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ড খন্ড মিছিল হতে থাকে।

নতুন করে একটি সরকারী ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তুতি হিসেবেই অত্যন্ত চড়া দামে এই সব ছাত্রনেতাদের কিনে নেওয়া হয় বলে ধারণা করা হয় কতিপয় ছাত্রনেতার নীতি বিরোধী অবস্থানকে নিন্দা করে বিভিন্ন হল সংসদের নেতারা ৪ নভেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন করে।

৯ নভেম্বর প্রকাশ্যে মটর সাইকেল যোগে বহু সংখ্যক সশস্ত্র যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করে। তাদের এই শক্তি প্রদর্শনের মহড়ায় শান্তি প্রিয় ছাত্র সমাজ ভবিষ্যত আশঙ্কায় আবার চিন্তিত হয়ে পড়ে।

আবার সাম্প্রদায়িকতা

নভেম্বরের (১৯৮৯) মাঝামাঝি ভারতের বাবরী মসজিদ ও সাম্প্রদায়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের প্রস্তুতি নেয়। ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে হিন্দু সম্প্রদায় ও মন্দিরের উপর হামলা চলে। সরকারী 'প্রেস এডভাইসে'র মাধ্যমে এ ঘটনা সংবাদপত্রে ছাপানো নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

ঢাকায় ২০ নভেম্বর স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি এক সমাবেশ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে সাম্প্রাদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানায়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রবীন সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। অন্যান্যর মধ্যে বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের আহবায়ক এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী, ৮ দলের আমির হোসেন আমু, ৭ দলের শামসুল আরেফিন খান, ৫ দলের খালেকুজ্জামান ভুইয়া, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের টি, রোজারিও, ডাকসুর সুলতান মোঃ মনসুর, ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের মালেকা বেগম বক্তৃতা করেন। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের আতাউর রহমান ঘোষণা পাঠ করেন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান।

ঘোষণায় পাড়ায়–মহল্লায় দলমত নির্বিশেষে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে কালো শক্তিকে রুখে দাঁড়াবার আহবান জানানো হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, সংগ্রামী ছাত্র জোট কিংবা ২২ ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি কোনোভাবে জোট না থাকলেও ভারতের সাম্প্রদায়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উস্কানীদাতাদের প্রতিরোধ করতে ছাত্র সংগঠনগুলি আবার এক মঞ্চে এসে হাজির হয়।

১৫ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে সর্বদলীয় ছাত্র সমাবেশে ডাকসুর সহসভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান, নাজমুল হক প্রধান, কামাল হোসেন, নাসির উদ দুজা, জহিরুদ্দিন

স্বপন, খায়রুল কবির খোকন, আবদুস সাত্তার খান, আমিরুল ইসলাম আমিন, মোশরেফা মিশু, আখতার সোবহান মাশরু।

সমাবেশ শেষে ছাত্ররা উস্কানীমূলকভাবে খবর পরিবেশনের অভিযোগে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় আগুন দেয়।

সংগ্রামী ছাত্র জোট ১৯ নভেম্বর পত্রিকা পোড়ানোর ঘটনা নিন্দা করে বলে, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভারতীয় সেবাদাসরা এই ঘটনা সংগঠিত করেছে।

থিয়েটারের উৎসব: উৎসের সন্ধানে

মধ্য নভেম্বর (১৯৮৯) থেকে শুরু হয় ১১ দিন ব্যাপী থিয়েটার উৎসব। নাট্যগোষ্ঠী থিয়েটার আয়োজিত 'উৎসের সন্ধানে' শীর্ষক এই উৎসবে মঞ্চে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি বলেন, বাঙালী সংস্কৃতি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক। তিনি বলেন, উৎসবের প্রতীকের মধ্যে স্বৈরাচার ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে অজেয় হয়ে এগিয়ে যাবার আলোকশিখার পথ দেখতে পাওয়া যায়।

সৈয়দ শামসুল হক বক্তৃতা দিতে গিয়ে উৎসবের নকশাটি সম্পর্কে বলেন, এটি মাটির সরার নকশা-যাতে নর এবং নারীর মূল কল্পনা করা হয়েছে এবং এটি করেছেন বাংলার সাধারণ মানুষেরা। শত শত বছরের ঐতিহ্য এক মাটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, আমাদের সংস্কৃতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা উপমহাদেশের অন্য দেশগুলোর সাথে ভাগ করে নিয়েছি।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, আজকের বাংলাদেশে যা কিছু দুর্দশা, তার একটি বড় কারণ হচ্ছে নিকট উৎস সম্পর্কে আমাদের অসচেতনতা। তিনি এজন্যে নতুন প্রজন্মের সামনে এর সত্যিকার রূপ চেহারা, এর তাৎপর্য তুলে ধরার আহবান জানান।

মুসলীম লীগের সভাপতি কাজী আবদুল কাদের ও মহাসচিব মুঃ আয়েনউদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে থিয়েটার উৎসবের উদ্বোধন এ দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমানকে বিদেশী প্রভুদের সংস্কৃতিতে ডুবাইয়া মারারই সুকৌশল।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতীক অনশন

১৩ নভেম্বর (১৯৮৯) সকাল ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগ্রামী ছাত্র জোট, ৯টি ছাত্র সংগঠন এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আলাদা আলাদা ভাবে প্রতীক অনশন কর্মসূচী পালন করে।

সংগ্রামী ছাত্র জোট ও ৯টি ছাত্র সংগঠন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রতিরোধ, বহিরাগত দুর্বৃত্ত ও অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার এবং কথিত ১ লক্ষ ২৫ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের দাবীতে প্রতীক অনশন পালন করে। ছাত্র ইউনিয়ন অনশন পালন করে সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও শিক্ষার দাবীতে।

শতশত ছাত্র কর্মী তিন দলে বিভক্ত হয়ে অনশন কর্মসূচীতে অংশ নেয়। গাজীপুর, নরসিংদী, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী প্রভৃতিস্থানেও ছাত্র কর্মীরা একইভাবে তাবু খাটিয়ে মাঠে প্রতীক অনশন পালন করে। স্তিমিত ছাত্র আন্দোলনে এই প্রতীক কর্মসূচী উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

হাসিনার সশস্ত্র বিপ্লব ও খালেদার ফাইনাল খেলা

১৯৮৭ সালের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচীর দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ৮ দলের জনসভায় শেখ হাসিনা ১০ নভেম্বর (১৯৮৯) বলেন, সরকার আন্দোলনে হরতালের বিকল্প পথ গ্রহণের জন্যে বিরোধী দলকে পরামর্শ দিচ্ছেন। হরতালের পরে আন্দোলনের বিকল্প পথ হলো সশস্ত্র বিপ্লব–বাংলার মানুষ এ বিপ্লব একাত্তরে করেছে। প্রয়োজনে এই বিকল্প পথে যেতে জনগণ আরেকবার পিছপা হবে না।

তিনি বলেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সরকার প্রচার করতো যে, বিরোধী দল আহূত হরতাল হয় নি। এখন তারাই হরতালের ফলে কত ক্ষতি হয়েছে তার বিবরণ দিচ্ছেন।

জনসভায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সাইফউদ্দিন মানিক, ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তি ও বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্যে উভয় দেশের জনগণের কাছে আহবান জানান।

১২ নভেম্বর গুলিস্তান চত্ত্বরে ৭ দল আয়োজিত সভায় বেগম খালেদা জিয়া জেনারেল এরশাদের উদ্দেশ্যে বলেন, সেমিফাইনাল শেষ, এবার আমরা ফাইনাল খেলবো। তিনি বলেন, এখানো সময় আছে পদত্যাগ কর।

বেগম জিয়া প্রশ্ন করেন, দেশে আজ ৪০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি কেন? কেন ৭বছরে ঋণের পরিমাণ ৩১ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

বি. এন. পি নেতা মীর্জা গোলাম হাফিজ শেখ হাসিনার 'হরতালের বিকল্প সশস্ত্র বিপ্লব' শীর্ষক বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের রায় নিতে চাই, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে নয়।

১৩ নভেম্বর জেনারেল এরশাদ সরিষাবাড়ির তারাকান্দি গ্রামে এক সমাবেশে খালেদা জিয়ার সমালোচনা করে বলেন, গুলিস্তান স্কোয়ারে জনসভায় বক্তৃতা দিয়েই জনগণের আস্থা অর্জন করা যায় না। তাদের বক্তৃতা সরকারকে দুর্বল করতে পারবে না, বরঞ্চ এসব নেত্রী তাদের বিভ্রান্তিকর নীতির দরুণ নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

তিনি বেগম জিয়ার ফাইনাল খেলার প্রসঙ্গ উথাপন করে বলেন, আপনার দলকে 'ক' শ্রেণীতে উন্নীত করুন, তারপর ফাইনাল খেলা হবে। আমরা 'গ' শ্রেণীর টিমের সাথে খেলিনা।

বাংলার মানুষ দু'টি স্বাধীনতা ও ১১টি সরকার দেখেছে

২২ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ন্যাপের জনসভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, এদেশের মানুষ দুটি স্বাধীনতা এবং ১১টি সরকার দেখেছে। কিন্তু তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। তিনি বলেন, মাকাল ফল যেমন ফল নয়, তেমনি সব পার্টিও পার্টি নয়। যারা রাজনীতির নামে ব্যবসা করে তাদের চিনে নিতে হবে।

ক্রমাগত হরতাল প্রসঙ্গে মোজাফফর আহমদ বলেন, হরতাল জনগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের শেষ অস্ত্র। অপব্যবহারের ফলে এই অস্ত্র ইতোমধ্যে ভোঁতা হয়ে গেছে।

আরিফ হত্যা: শোকের নিস্তব্ধতা

২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক করুণ ঘটনা ঘটে। এদিন সকালে কলাভবন চত্বরে আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগ (হা–অ) এবং জাসদপন্থী ছাত্রলীগ (না–শ)–এর মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে দু'দলেরই কয়েকজন ছুরিকাহত হয়।

এই সংঘর্ষের জের হিসেবেই রাত ১১ টায় ছাত্রলীগ (হা–অ)–এর একদল কর্মী সলিমুল্লাহ হলে ছাত্রলীগ (না–শ) কর্মীদের উপর হামলা চালাতে যায় বলে অভিযোগ

করা হয়। এই সময় গুলী চালানো হলে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিন্যান্স বিভাগের অনার্স ক্লাশে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী আরিফ আহমেদ নিহত হয়। তাঁর পাঁজরে গুলী লেগে লিভার ফুটো হয়ে গিয়েছিল। কৃতিছাত্র আরিফের মৃত্যুতে সমগ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে, ক্যাম্পাসে বিরাজ করে নীরব নিস্তব্ধতা।

রাতেই সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের উদ্যোগে এর প্রতিবাদে মিছিল হয়। কে বা কারা ডাকসু অফিস ভাঙচুর করে এবং ডাকসুর সহসভাপতির কক্ষে উত্তোলিত বঙ্গবন্ধুর বিতর্কিত ছবিটি নামিয়ে তাতে আগুন দেয়। পরদিন সকালে ছাত্রলীগ (হা-অ) বাদে সকল সংগঠনের উদ্যোগে একত্রে শোক ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

৭ ডিসেম্বর (১৯৮৯) পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সলিমুল্লাহ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. কে. এম. মোহসিন বিবেকের তাড়নায় পদত্যাগ করেন। পরে হলের সকল আবাসিক শিক্ষকগণও পদত্যাগপত্র জমা দেন। সকল মহল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মেধাবী ছাত্রের হত্যাকান্ডকে নিন্দা করা হয়।

এদিন রাতেই হোসেনী দালানস্থ ছাত্র ইউনিয়নের কার্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আরিফ হত্যার তদন্ত দাবী করা হয়। তিন দিনের শোক কর্মসূচী পালন ও সর্বদলীয় শিক্ষা পরিবেশ ফোরাম গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৫ দল ২ ডিসেম্বর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলে, যখনই আন্দোলন শুরু হয়, তখনই সরকারী চক্রান্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিতভাবে এইসব ঘটনা ঘটনো হয়। তবে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দানকারী সংগঠনগুলো তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। আরিফ হত্যাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছে দায়িত্ব নিয়েই তার প্রতিবিধান করা প্রয়োজন।

বিশ্ব ছাত্র ধর্মঘট

মধ্যপ্রাচ্যের অধিকৃত অঞ্চলে সকল প্যালেষ্টাইনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার দাবীতে আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ৬ ডিসেম্বর সারা পৃথিবীতে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়।চট্টগ্রামে ৫ ডিসেম্বর এই উপলক্ষে ১১ টি ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য প্রাঙ্গনে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন,প্যালেষ্টাইনী ছাত্র সংগঠনের চট্টগ্রাম শাখার সাবেক সভাপতি জামাল ফাত্তাহ, বর্তমান সভাপতি এমাদ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নাজমুল করিম দুলাল।

৬ ডিসেম্বর (১৯৮৯) ডাকসুসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন এই উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে ছাত্র ধর্মঘট পালনের ডাক দেয়। দিনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী হিসেব সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও জেনারেল ইউনিয়ন অব প্যালেস্টাইন স্টুডেন্টস বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ভাষণ দেন প্যালেস্টাইনী ছাত্র নেতা ওমর ইব্রাহিম ও ইয়াসির মাল্লাম, বাংলাদেশের ছাত্র নেতা নাজমুল হক প্রধান, জহিরুদ্দিন স্বপন, অসীম কুমার উকিল, নাসির-উদ-দুজা, কামাল হোসেন, আমিনুল ইসলাম, আবু আকবর, ইকবাল প্রমুখ। ঘোষণা পাঠ করেন নাইম-উল-ইসলাম। সভায় প্যালেস্টাইনের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া ও প্যালেস্টাইনী ছাত্রদের ইসরাইলী কারাগার থেকে মুক্তি দাবী করা হয়।

কিশোরগঞ্জে পীরদের সশস্ত্র যুদ্ধ

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামে ভন্ডপীর মেজর (অবঃ) মতিউর রহমানের 'আল মনসুর' বাহিনীর রাষ্টক্ষমতা দখলের তথাকথিত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে কিশোরগঞ্জের পুলিশ বাহিনী মধ্য ডিসেম্বরে এক যুদ্ধে নামে। টানা ৪৪ ঘন্টা যুদ্ধের পর সশস্ত্র আল মনসুর ও মিল্লাত বাহিনী অবশেষে ১৪ ডিসেম্বর (১৯৮৯) আত্মসমর্পন করে।

এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পীরবাদ ও ইসলামী জোশের কালো দিক উন্মোচিত হয়ে ওঠে।

ভেতরে ভেতরে এই রকম একটি সশস্ত্র দল গড়ে তোলার এই ভয়াবহ ঘটনা রাজনৈতিক মহলে নতুন শঙ্কার জন্ম দেয়।

১৯৮৯ ছিল এরশাদের সুখের সংসার

১৯৮৯ সালের সুখের সংসার ছিল জেনারেল এরশাদের। তিনি তাঁর স্ত্রী 'ফার্স্টলেডী' বেগম রওশন এরশাদকে নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাজ না থাকলে প্রতিদিন একবার করে হলেও ঢাকা শহরের রাস্তা-ঘাট দেখেছেন, আর সি. সি. হবে, না পীচ ঢালাই হবে, তার নির্দেশ দিয়েছেন। একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বলেছেন, এরশাদ এই সময় ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের নিয়মিত 'ইঞ্জিনিয়ার' হিসেবে আবির্ভূত হন।

বিরোধী দল এই বছরটায় কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। ঘন ঘন হরতাল হচ্ছিল, কিন্তু মানুষের মনে আলোড়ন ছিল না। এরশাদ তাঁর দম্ভ দেখানোর জন্যে প্রতিটি হরতালের দিন নির্বিঘ্নে গলফ খেলেছেন অথবা হেলিকপ্টার দিয়ে দেশের কোনো ব্রীজ পরিদর্শন করতে গেছেন, এই নির্বিঘ্নতার সচিত্র চলমান আলোকচিত্র আবার ১৫ থেকে ২০ মিনিট টেলিভিশনের সংবাদের প্রথম অংশে দেখিয়ে বিরোধী নেতাদের ব্যঙ্গ করেছেন।

১৯৮৮ সালের ভোটারবিহীন নির্বাচনে জাতীয় সংসদের অনুগত বিরোধী দল তৈরী করা হয়। দেশের রাষ্ট্রপতি সাধারণভাবে সংসদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। সরকারী দল সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর একটা আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ প্রস্তাব উথাপন করে, সরকার ও বিরোধী দল এর উপর আলোচানা করে। কিন্তু এরশাদ আমলে তারও ব্যতিক্রম দেখা দিল। অনুগত বিরোধী দলের নেতা আ. স. ম. আবদুর রব নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯৮৯ সালে আ. স. ম রবের এই 'দালালী' মনোবৃত্তি সকল প্রকার শিষ্টতা ছাড়িয়ে যায়।

১৯৯০ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনেও রাষ্ট্রপতি হিসেবে জেনারেল এরশাদ ভাষণ দেন। ৪ জানুয়ারী প্রদত্ত ৩২ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ ভাষণে তিনি তাঁর আমলের 'উন্নয়নের জোয়ার' বয়ে যাওয়ার এক লম্বা ফিরিস্তি দেন। সাপ্তাহিক একতা তাঁর এই ভাষণের উপর একটি উপসম্পাদকীয় লেখে:

'রাষ্ট্রপতি এরশাদ উজ্জ্বলতর নতুন দিনের অভিযাত্রী হিসেবে গোষ্ঠী ও দলীয় স্বার্থ ভুলে গিয়ে সকলকে জাতীয় ঐক্যের এক মিছিলে শামিল হওয়ার আহবান জানিয়েছেন...।

'কথাগুলো ভাল। কথাগুলো সত্য। জাতীয় উন্নয়নের জন্যে জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন..। কিন্তু কথা কথাই। কথা ও কাজের সময় যদি না হয় তাহলে কথার কোনো মূল্য নাই। ভালো কথা ও সুন্দর কথা কার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে, কে বলছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ..।

'যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মেনে নিতে পারে না, যারা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিকে মদত দিয়ে সমাজে ভেদাভেদ বাড়িয়ে তুলেছে, যারা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্যকে নষ্ট করার জন্যেই সংবিধানকে কাটা-ছেঁড়া করে ধর্মীয় ও

সাম্প্রদায়িক বিভেদ উস্কে দিচ্ছে, জাতি পরিচয়ের চেয়ে যারা ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিচয়কে প্রতিনিয়ত উস্কাচ্ছে তাদের মুখে জাতীয় ঐক্যের কথা শোভা পায় না...।

'গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কে ধ্বংস করেছে? কে ভোটাভুটিকে প্রহসনে পরিণত করেছে? ভোট ডাকাতি, বুথ দখল ও রেডিও-টেলিভিশনে নির্বাচনের বানোয়াট ফলাফল প্রচারের মহাপ্রহসন কখন চালু হয়েছে? কে নির্বাচনী কমিশনকে আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করেছে?...। কে জরুরী অবস্থা জারী করে, রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ রেখে গণভোট ও উপজেলা নির্বাচন করিয়েছে? গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের কথা কার মুখে শোভা পায়?...।

'তিনি একদিকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বিষয়ে ঐক্যমতে উপনীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছেন, বিরোধী দলের সহযোগিতা কামনা করবেন, আর একই নি:শ্বাসে '৪র্থ জাতীয় সংসদের' প্রশংসা করছেন তাতো হয় না। এই সংসদই যদি তাঁর কাছে আর্দশ স্থানীয় হয় তবে তাঁর পুরো বক্তৃতাটাই বাগাড়ম্বর মাত্র। তাঁর সকল কথা মিথ্যা হয়ে যায়। তাঁর আহবানে কোনো রাজনীতিকের পক্ষে সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়..।

'বিগত কয়েক বছর পদত্যাগের আন্দোলন করে বিরোধী নেতারা সফল হননি। গণতন্ত্রের অভাবে দেশবাসী সর্বস্তরে পেশী শক্তির দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। এরশাদ ক্ষমতা দখল করেছেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। বাঘের পিঠে চড়লে কেউ নামতে পারেনা।[৪১]

কমিউনিস্ট পার্টির পদযাত্রা

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৫ জানুয়ারী (১৯৮৯) থেকে তেতুলিয়া, সিলেট, চট্টগ্রাম ও খুলনা থেকে ৪টি রুটে ঢাকা অভিমুখে পদযাত্রার এক কর্মসূচী শুরু করে। চীনের মাও-সে-তুং-এর লং মার্চ ধাচের ঐ পদযাত্রা এক অন্যন্য অভিযাত্রা হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে চিহ্নিত হয়। ২৮ জানুয়ারী পাঁয় হেটে পদযাত্ররা ঢাকায় প্রবেশ করে। তাদের মুখে শ্লোগান ছিল 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব'।

'পরাজিত হয়না মানুষ'

'পরাজিত হয় না মানুষ। ভেঙে যেতে পারে মৃদঙ্গের লয়, কিন্তু মানব নৃত্যের দর্পিত মুদ্রা চিরকাল স্পর্শ করে মহাকালকে'-এই ঘোষণা পাঠ করে পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে

শুরু হয় চতুর্থ জাতীয় কবিতা উৎসব। এবারের শ্লোগান করা হয় 'কবিতা রুখবেই সন্ত্রাস'। উৎসবের উদ্বোধন করে কবি বেগম সুফিয়া কামাল বলেন, স্বৈরাচার, মৌলবাদ আর অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এই শ্লোগান এক নতুন উদ্দীপনা।

ছাত্রনেতা চুন্নু নিহত

২৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এদিন ছাত্রলীগ (হা–অ) ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসে এক ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে জহুরুল হক হলের সহসভাপতি ও ছাত্রলীগ (হা–অ) নেতা শহীদুল ইসলাম চুন্নু নিহত হয়। সমগ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই খবরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান চুন্নুর লাশ দেখতে গেলে লাঞ্ছিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ছাত্র লীগ (হা–অ) হত্যাকারী হিসেবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে চিহ্নিত করে এবং তাদের গ্রেফতার দাবী করে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা এক সাংবাদিক সম্মেলনে, ঘটনার জন্যে বি.এন.পি–কে দায়ী করে বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারীতে বি.এন পি–র মিছিলে হামলা হওয়ার পর বি. এন. পি মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদার ঘটনার জন্যে শহীদুল ইসলাম চুন্নুর নাম করেছিলেন। এতে বোঝা যায়, মিথ্যে প্রতিশোধের জন্যে তারাই চুন্নুকে হত্যা করেছে।

আওয়ামী লীগ ২৮ ফেব্রুয়ারী চুন্নু হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা শহরে সকাল–সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়। সারাদেশে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বি.এন.পি. ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। টাঙ্গাইল, সিলেট, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে।

চুন্নুর হত্যার পর অশান্ত পরিস্থিতিতে কয়েকদিন পর উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান পদত্যাগ করেন। ছাত্রদল প্রথম থেকেই তাঁর পদত্যাগ দাবী করে আসছিল। পরে ৯ ছাত্র সংগঠনও তাঁর পদত্যাগ দাবী করে। চুন্নু হত্যার পর ছাত্রলীগ (হা–অ) কর্মীদের হাতে উপাচার্য লাঞ্ছিত হন।

আ.স.ম. রবের বায়না

পয়লা মার্চ (১৯৯০) সরকার অনুগত বিরোধীদলের নেতা আ. স. ম. আবদুর রব বায়না ধরেন তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংবর্ধনা দিতে হবে। কারণ ১৯৭১ সালের ২ মার্চ

তিনি নাকি স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলেছিলেন। এই বায়না তিনি তুলে ধরেন আবার জেনারেল এরশাদের কাছে গিয়ে। জাসদ (রব) আ.স.ম রব সহ গিয়ে এরশাদের কাছে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করে। স্মারকলিপিতে তারা বলে, আ. স. ম রবের ঘটনাটি পাঠ্য পুস্তকেও লেখা থাকতে হবে।

১৯৭১ সালে আ. স. ম. রব আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। তিনি সে সময় যা করেছেন তা দলের নির্দেশেই করেছেন। ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছিল সেই সময়। এর চার নেতা ছিলেন, আ. স. ম. আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন (এরা ডাকসুরও নেতা ছিলেন), নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ

এই চার নেতার দুই নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখন ২ মার্চ এক বিবৃতিতে আ. স. ম. রবের বায়না ধরাকে নিন্দা করেন এবং বলেন, তাঁর বক্তব্য ইতিহাস বিকৃত ও একক কৃতিত্বের দাবীদার। তাঁরা জেনারেল এরশাদের কাছে এ ব্যাপারে ধর্ণা দেওয়ারও নিন্দা করেন।

এরশাদ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে অনেক বাঙালী সামরিক অফিসার পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও এরশাদ সুযোগ পেয়েও বাঙালীর অস্তিত্বের যুদ্ধে অংশ নেননি। বরং সামরিক শেলে বিদ্রোহী বাঙালী সামরিক অফিসারদের জন্যে যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল, তার তিনি প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানী সামরিক প্রভুদের একান্তজন না হলে তাঁকে সামরিক ট্রাইব্যুনালের কর্তা নির্বাচনের প্রশ্ন আসতো না।

২ মার্চ আ. স. ম. রবের জন্যে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। জেনারেল এরশাদ এখানে প্রধান অতিথি হয়ে আসেন। অনুষ্ঠানে পরস্পর পরস্পরকে সনদ প্রদান করেন। আ. স. ম রব জেনারেল ওসমানীর মৃত্যুর পর তাঁর নাম ভাঙিয়ে বলেন, ওসমানী তাকে বলেছেন, এরশাদ নাকি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওসমানী বলেন, 'না তুমি (এরশাদ) ওখানেই থাক, এস না'।

স্বাধীনতার এতোদিন পর ওসমানীর এই 'সার্টিফিকেটের' কথা শুনে মুক্তিযোদ্ধারা হতভম্ব হয়ে পড়ে ওসমানী আর মানুষ পাননি, একমাত্র আ. স. ম. রবের কানে কানেই শুধুমাত্র তা বলে গেলেন, আর রব এতোদিনেই তা প্রকাশ করলেন না কেন? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বুঝতে পারেন, বাংলাদেশ শাসন করার জন্যে

'মুক্তিযোদ্ধার সনদ' কতবেশী আবশ্যক হয়ে পড়েছে। জেনারেল এরশাদ শেষ পর্যন্ত আ. স. ম. আবদুর রবকে ধরেছেন সেই 'সার্টিফিকেট'-এর জন্যে। কাজী জাফরও এই সভায় এরশাদকে 'সার্টিফিকেট' দেন। মুক্তিযোদ্ধারা শঙ্কিত হয়ে পড়েন, কবে জামায়াত, মুসলিম লীগ, গোলাম আজমও নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা ঘোষণা করেন এবং আ. স. ম. রব, কাজী জাফর–এর মতো পতিত মুক্তিযোদ্ধারা তা 'সত্যায়িত' করে দিয়ে আসেন।

দীর্ঘ ৩৮ দিন ক্রমাগত বন্ধ থাকার পর ৭ এপ্রিল (১৯৯০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার খোলে। এই উপলক্ষে ৪ এপ্রিল ২২ ছাত্র সংগঠন এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে বলে, 'আমরা কোন সন্ত্রাসীকে কোন ছাত্র সংগঠনে প্রশ্রয় দেব না'। নতুন উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে ডাকসু ও বাইশটি ছাত্র সংগঠন এক সভায় মিলিত হয়ে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৭ এপ্রিল সকল সংগঠন, শিক্ষক, কর্মচারী মিলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মৌন শান্তি মিছিল করে।

সিলেট, খুলনায় স্থানীয় আন্দোলন

সিলেটে ৬ (১৯৯০) মে স্থানীয় জাতীয় ছাত্রলীগের সভাপতি বিজিত চৌধুরীকে ৮ মাস বিনা কারণে আটক রাখার প্রতিবাদে সংগঠনের ৩৩ জন সদস্য আমরণ অনশন শুরু করে। প্রচন্ড গরমে অনশনকারীদের অবস্থা দ্রুত অবনতি ঘটলে তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ছাত্রনেতা বিজিত চৌধুরীর বিরুদ্ধে সরকার ৪০ টি মামলা দায়ের করে এবং এর মধ্যে ৩৯ টি মামলাতেই তার জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু একটি মামলায় তাঁকে জামিন না–মঞ্জুর করে আটকে রাখে।

৭ মে (১৯৯০) খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি এক বিশাল গণজমায়েতে ঘোষণা করে, খুলনার ন্যায্য দাবী অচিরেই না মানা হলে খুলনাবাসী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে। বক্তারা বলে, এতে অনির্দিষ্টকালের জন্যে খুলনা বন্‌ধ–এর ডাক দেওয়া হবে এবং সরকারকে বয়কট করা হবে।

ন্যাপ নেতা মোহাম্মদ ফেরদৌসের সভাপতিত্বে সমাবেশে বর্তমান সরকারের আমলের বিভিন্ন তথাকথিত উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দরনগরী খুলনায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই, মেডিকেল কলেজ নেই, বিমান বন্দর নেই, মংলা বন্দরও ধ্বংসের পথে, রূপসা সেতুও নির্মিত হল না।

অন্যান্যর মধ্যে বি. এন. পি–র নূরুল ইসলাম, মুসলিম লীগের শেখ মোহাম্মদ আলী, আওয়ামী লীগের এডভোকেট আবদুস সালাম, হারুনুর রশীদ, কমিউনিস্ট পার্টির এডভোকেট ফিরোজ আহমেদ প্রমুখ এতে বক্তব্য রাখেন। ৩১ মে খুলনার হাদিস পার্কে গণঅনশন কর্মসূচীর কথাও সমাবেশে ঘোষণা করা হয়।

মন্ত্রিসভা উপচে পড়লো

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে জেনারেল এরশাদ আরো কয়েকজন মন্ত্রী নিয়োগ করায় মন্ত্রীসভা উপচে পড়ে। দেখা যায়, সংবিধানের ৫৮ নং অনুচ্ছেদ লংঘন করে বেশী মন্ত্রী নেওয়া হয়ে গেছে। বিরোধী দলগুলো সংবিধান লংঘন করে আরো মন্ত্রী নেওয়ায় এরশাদের সমালোচনা করলে এরশাদ নতুন মন্ত্রী মনসুর আলী সরকার ও সুশীল অধিকারীকে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

৯ মে থেকে ১১ মে (১৯৯০) পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয় কুষ্টিয়ার শিলাইদহে। বাংলাদেশ উলেমা সম্মেলন এবং এরশাদ সরকারের পতিতমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ এর সমালোচনা করে বিবৃতি দেন। তারা বলেন, জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের মূল্যবোধের পরিপন্থী। আনোয়ার জাহিদ বলেন, এটা ভারতের সেবাদাসদেরই মানায়।

নীরুর কারা উত্তর সংবর্ধনা

১৬ মে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সদ্য কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদল নেতা সানাউল হক নীরুকে এক সংবর্ধনা দেয়। সংগঠনের আহবায়ক আমানউল্লাহ আমান এতে সভাপতিত্ব করেন। সংবর্ধনার উত্তরে ছাত্রদল নেতা নীরু বলেন, আজ আপনাদের এই বিপুল সংবর্ধনায় আমার জীবনের সকল দুঃখ, ক্ষোভ আমি ভুলে গেছি। আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে শহীদ জিয়ার আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে।

জ্যোতি পাউডারে মন্ত্রীরা

১৭ মে (১৯৯০) হুজুর দেওয়ান মোহাম্মদ সাইদুর রহমান (সায়েদাবাদের পীর সাহেব) সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করে বলে বলেন, তাঁর আবিষ্কৃত জ্যোতি হিমেল পাউডার–এর জন্যে প্রদত্ত উপরাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গের শুভেচ্ছা

বাণী কিছু অতি উৎসাহী ভক্ত বিভিন্ন দৈনিকের ক্রোড়পত্রে ছবিসহ প্রকাশ করে। এজন্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

ডাকসু নির্বাচন: ১৯৯০

উল্লেখ্য, জ্যোতি হিমেল পাউডার নামক একটি পাউডারের বিজ্ঞাপনে বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ, উপপ্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে 'আমিও ব্যবহার করি' ভাষ্য দেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ নিয়ে হাসির রোল পড়ে যায় এবং একটা বিষয় প্রমাণিত হয়, জেনারেল এরশাদের মন্ত্রিসভায় কান্ডজ্ঞানহীন তৃতীয় শ্রেণীর বেসামাল ব্যক্তিরাও স্থান পেয়েছে। সরকারের মর্যাদা এতে ক্ষুন্ন হয়। স্বয়ং জেনারেল এরশাদ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই জন্যে মন্ত্রীদের ভৎর্সনা করেন।

২৩ মে বি. এন. পি. নেত্রী খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের একদল কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উপর নগ্ন হামলা আর ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের মাধ্যমে যে কলঙ্কজনক ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও জাতির স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে।

তিনি বলেন, গত বছর ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রসমাজের রায় যারা বানচাল করেছিল আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র সমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। বেগম জিয়া আরো বলেন, স্বাধীনতার অব্যাবহিত পর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা জনগণের প্রত্যাশার সাথে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। তিনি বলেন, বর্তমান এরশাদ সরকার ও তাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন।

৬ জুন (১৯৯০) এরশাদ আমলে দ্বিতীয় বারের মতো ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভেঙে যাওয়ায় এই পরিষদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী সংগ্রামের সম্ভাবনা পূর্বেই বাতিল হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক জোট ৫ দলীয় ধারার ছাত্র সংগঠনগুলো মিলিতভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। রাজনৈতিক জোট ৮ দলীয় ধারার একটি নির্বাচনী সমঝোতার উদ্যোগ প্রাথমিক অবস্থাতেই বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বাতিল করে দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন বলে, যদি পুরনো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদগতভাবে নির্বাচন করা যায় তাহলেই শুধু জোটগত নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন রাজী।

এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সংগঠন যার যার সংগঠনগত ব্যানারেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল 'আমান-খোকন-আলম' পরিষদ, ৯ টি ছাত্র সংগঠন 'মুশতাক-স্বপন-নাঈম' পরিষদ, ছাত্রলীগ (হা-অ) 'আলম-কামরুল-মেহেদী' পরিষদ, ছাত্র ইউনিয়ন 'বাবলু-নাসির-ইয়াসিন' পরিষদ, জাতীয় ছাত্রলীগ 'বুলবুল-কামাল' পরিষদ, ইসলামী ছাত্র শিবির 'আমিন-মুজিব' পরিষদ, জাতীয় ছাত্র ঐক্য 'হান্নান-শাহীন' পরিষদ, ছাত্র ঐক্য সমিতি 'আমিনুল-মিন্টু' পরিষদ, গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি 'বেলাল-ইকবাল' পরিষদ, ছাত্রলীগ (ঐক্য জাসদ) 'মনির-কামাল' পরিষদ, গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ 'ইউনুস-কামরুল' পরিষদ, তিন সংগঠনের বামজোট 'ফয়জুল-শাহীন' পরিষদ, বিপ্লবী ছাত্র মঞ্চ 'আউয়াল-বারী' পরিষদ, ইসলামী ছাত্র সমাজ 'লোকমান-রেজাউল' পরিষদ, ইসলামী ছাত্র সেনা 'সামাদ-বখতিয়ার' পরিষদ, ছাত্রলীগ (ব-আ) 'রেজা-আরিফ' পরিষদ, জাতীয় ছাত্রফ্রন্ট 'মৃধা-মফিজ' পরিষদ, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল 'রফিক-রকিব' পরিষদ, ছাত্রবাংলা পরিষদের 'জহির-শিপন' পরিষদ, ছাত্রলীগ (খো-ই) 'খোরশেদ-শ্যামল' পরিষদ, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন 'কাশেম-আমিনুল' পরিষদ ইত্যাদি সংগঠনগুলি এবারের ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেয়। এবছর সর্বাধিক ২৮ টি সংগঠন ডাকসু নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে।

তবে এবারের প্রধান সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে প্রথম থেকেই পরিষদ গঠন নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়। সবাই ভেবেছিল 'দুদু-রিপন' অথবা 'রিপন-আমান' অথবা 'রিপন-খোকন' পরিষদ গঠিত হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়া নিজে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি 'আমান-খোকন' পরিষদের ঘোষণা দেন। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রদল কর্মী এই ঘোষণা মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা দুদু-রিপনকে নিয়ে বৃহৎ মিছিল করে। ছাত্রদলের সন্ত্রাসকারী সানাউল হক নীরু এই পরিষদের প্রধান সমর্থক হিসেবে নেতৃত্ব দেন। আমানুল্লাহ আমান ও খায়রুল কবির খোকনকে লাঞ্ছিত করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করা হয়। তাঁরা বেগম জিয়ার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েন। তাঁদের কান্নার আলোকচিত্র পরদিন সকল সংবাদপত্রে ছাপা হয়।

কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি অনঢ় থাকেন। ধারণা করা হয় যে, সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা 'দুদু-রিপন' পরিষদের পক্ষে কাজ করছে। নীরু-অভি বাহিনীর প্রচন্ড তৎপরতায় তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শ্রুতি আছে যে সাবেক রাষ্টপতি জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গঠন প্রক্রিয়ায়

সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত ছিল বলে দলটিতে বরাবরই গোয়েন্দা সংস্থার প্রভাব ছিল। এই জন্যে দেখা যেত, প্রায়ই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে উর্দ্ধতন নেতা-কর্মীরা সরকারী দলে যোগদান করছে। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এরশাদ সরকারের পতন পর্যন্ত এই যোগদান প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। ফলে বেগম জিয়া আপোষহীন মনোভাবের পরিচয় দেন। সারাদেশে তাঁর আপোষহীন মনোভাবের একটা 'মীথ'ও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় ও অপরিচিত হয়েও ডাকসুতে শেষ পর্যন্ত বেগম জিয়ার পরিষদ 'আমান-খোকন'-এর নেতৃত্বে জয়লাভ করে।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে বিস্ময়করভাবে দুটি ছাত্রী হলেও (রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলেও) ছাত্রদলই আংশিকভাবে হলেও জয়লাভ করে। অথচ সারাটি বছর ছাত্রদল গত বছরের বিজয় মিছিলে ছাত্রী মিছিলে হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিজয় মিছিলের প্রাক্কালে ডাকসুর নূতন সহ সভাপতি আমানুল্লাহ আমান ঘোষণা করেন, ডাকসু ও ছাত্রদল এখন থেকে ক্লাশ চলার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে মিছিল করবে না।

হাসনাতের ডিগবাজী

৩০ জুন (১৯৯০) বি.এন.পি থেকে আলাদা হয়ে নতুন দল বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠনকারী আবুল হাসনাত বলেন, জনগণের বাক স্বাধীনতা হরণকারী বর্তমান স্বেচ্ছাচারী সরকার মানুষের সকল মৌলিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। ফলে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন নির্বাসিত হচ্ছে। টেলিভিশনের মতো জনপ্রিয় গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে সরকারী রাজনৈতিক দলের প্রচারণার হীন-স্বার্থে।

২১ আগস্টই 'বর্ণচোরা' এই আবুল হাসনাত জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। যোগদান করে হাসনাত বলেন, জনগণের কল্যাণের সরকার এরশাদের নেতৃত্বে যে নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে তা বাস্তবায়নের জন্যে জীবন উৎসর্গ করবো।

বস্তুত শুধু হাসনাত নয়, এরশাদ মন্ত্রিসভার প্রতিটি সদস্য এরকম বিশ্বাসঘাতকতা স্বাক্ষর রেখে সরকারে যোগদান করেছেন। মওদুদ, কাজী জাফর, হালিম চৌধুরী, কোরবান আলী, আনোয়ার জাহিদ, সিরাজুল হোসেন খান প্রমুখ মন্ত্রিসভায় যোগদানের পূর্বদিনও এরশাদের ফাঁসি চেয়েছেন, মন্ত্রী হয়ে তাঁকে পরদিন 'পিতা' ডেকেছেন। এক শ্রেণীর রাজনীতিকের চরিত্রহীনতা রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল এই সময়।

'শেষবারের মতো প্রার্থী হব'

১২ জুলাই বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদের সাথে এক বৈঠকে জেনারেল এরশাদ বলেন, তাঁর শাসনামলে বিরোধী দলের ৫৫ থেকে ৬০ বার হরতাল হয়েছে। এতে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, এসব হরতাল তার সরকার পরিবর্তন করতে পারেনি। জেনারেল এরশাদ অত্যন্ত করুণভাবে ঘোষণা করেন, নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে তারিখ ঘোষিত হয়েছে তাতে তিনি এবারই শেষ বারের মত প্রার্থী হবেন। তিনি নির্বাচন প্রশ্নে বিরোধী দলকে আলোচনার প্রস্তাব দেন।

১৩ জুলাই ৮, ৭ ও ৫ দল নির্বাচন সম্পর্কে জেনারেল এরশাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

'ছাত্ররা শুধুমাত্র ছাত্র নয়'

এরশাদ আমলে নির্বাচিত দ্বিতীয় ডাকসুর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় ২৫ জুলাইস(১৯৯০)। এতে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, আমাদের মতো শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাদপদ একটি দেশে যারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়ার সুযোগ পান তাদের শুধু ছাত্র হিসেবে বিবেচনা করলে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে, তারাই এদেশের নেতৃস্থানীয় শক্তি। বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার আগেই তাদের দেশ ও জাতিকে নিয়ে ভাবতে হয়। জাতীয় পর্যায়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ভূমিকা রাখতে হয়। এই জন্যেই গণবিরোধী শাসক শক্তি ছাত্রদের সংঘকে ভয় পায়।

সাতদলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৫ আগস্ট সাভারে এক জনসভায় বলেন, আর ৫ টি বছর জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকলে এই বাংলাদেশ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতো। আর এরশাদ সরকারের হাতে আর পাঁচ বছর ক্ষমতা থাকলে আগামী প্রজন্মকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে।

'এমন মজাদার দেশ কোথা দেখিনি'

১৪ আগস্ট (১৯৯০) বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়ার্ড ডি প্রী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আমার ৩৫ বছরের কূটনৈতিক জীবনে এমন মজাদার দেশ কোথাও দেখিনি'। তিনি বলেন, এখানে পর্বত প্রমাণ সমস্যা আছে। তার মধ্যে অগ্রগতিও আছে। তবে ধীরগতির অগ্রগতি এটা।

১৫ আগস্ট ছাত্রদল নেতা গোলাম ফারুক অভিকে মুক্তি দিয়ে আবার জেল গেটেই গ্রেফতার করা হলে ছাত্রদল কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তারা বেশ কয়েকটি গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় ও ভাঙচুর করে। এই সময় তারা ৮ রাউন্ড গুলী ছুঁড়ে।

'একাত্তর চেয়ে ১৫ আগষ্ট বড়'

১৫ আগষ্ট (১৯৯০) বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীরা 'মহামুক্তির মহান দিবস' হিসেবে পালন করে। ফ্রিডম পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভায় কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদ বলেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন, পাকিস্তান ভেঙে ফেলা ঠিক হয়নি কিন্তু ১৫ আগস্ট নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। ১৫ আগস্টের বিপ্লবই এদেশের জনগণ সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করে। তাই ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেয়েও ১৫ আগস্টের গুরুত্ব বেশী।

আট দল, পাঁচ দল, কমিউনিস্ট লীগ, ঐক্য প্রক্রিয়া, জনতা মুক্তি পার্টি ২৬ আগস্ট (১৯৯০) ইরাক-কুয়েত যুদ্ধে বাংলাদেশের জড়িয়ে পড়ার প্রতিবাদে এবং সৌদী আরবে বাংলাদেশের সেনাদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে হরতাল পালন করে। হরতাল শেষে আয়োজিত সমাবেশ থেকে একই দাবীতে ৩ সেপ্টেম্বর সারাদেশেও হরতালের ডাক দেওয়া হয় এবং ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সচিবালয় ঘেরাও করার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

৪ সেপ্টেম্বর (১৯৯০) ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করে। তাদের ঘোষিত ৭ দফা দাবীতে তারা এই ঘেরাও কর্মসূচী অব্যাহত রাখে। ৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৮ জন শিক্ষক ছাত্র শিবির কর্তৃক প্রশাসনিক ভবন তালা দেওয়া ও পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার নিন্দা করে বিবৃতি দেয়। এতে স্বাক্ষর করেন ড. মাহবুব উল্লাহ, ড. শিরীন, মোহিত-উল-আলম, তপন জ্যোতি বড়ুয়া, নিলুফার সুলতানা, রেবেকা সুলতানা, মনিরউদ্দিন প্রমুখ।

'জয় বাংলা আর নতুন বাংলারা দেশকে ধ্বংস করছে'

৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে সাতদল নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হাটহাজারী কলেজ ময়দানে এক জনসভায় বলেন, জয় বাংলা ও সোনার বাংলা আর নতুন বাংলারা এক যোগে দেশকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। পরে বেগম জিয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিক্ষকদের এক সমাবেশেও ভাষণ দেন। তিনি এখানে বলেন, যারা নিছক মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে, তারা প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমিকদের অগোচরে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এই সমাবেশে যেসব শিক্ষকও ভাষণ দেন তাদের মধ্যে অধ্যাপক ইউসুফ শরীফ আহমদ খান, ড. আবুল কালাম আযাদ, ড. মাহবুবউল্লাহ অন্যতম।

নিউজপ্রীন্টের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ

নিউজপ্রীন্টসহ কাগজের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও ন্যায্য মূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের দাবীতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ডাকে ২২ সেপ্টেম্বর (১৯৯০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ডাকসু ও ছাত্র ফেডারেশন এই প্রসঙ্গে পৃথক বিবৃতি দেয়।

৯ টি ছাত্র সংগঠনের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় মধুর কেন্টিনে। এতে ছাত্রনেতা নাজমুল হক প্রধান, আখতার সোবহান মাশরুর বক্তৃতা করেন। ছাত্রলীগ (হা-অ) একই স্থানে পৃথক সভার আয়োজন করে। ছাত্রনেতা গোলাম মোস্তফা সুজন, কামরুজ্জামান আনসারী এতে বক্তব্য রাখেন।

ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের। সাজ্জাদ জহির চন্দন এতে বক্তব্য রাখেন। ছাত্র ইউনিয়ন পরে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শহরের রাজপথে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত করে। মিছিল শেষে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্র ইউনিয়ন আরেকটি সভা করে।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জাতীয় ছাত্রলীগের সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা এস. এম. কামাল হোসেন।

সারা সেপ্টেম্বর মাস আবার ছাত্রদলের দুই বিবদমান গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। এই সময় ২৫ সেপ্টেম্বর আবার গোয়েন্দা পুলিশ জসীমউদ্দীন হল ও বঙ্গবন্ধু হলে তল্লাশী চালায় এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গুলী, বোমাসহ ছাত্রদল নেতা ইলিয়াস আলীসহ চারজনকে গ্রেফতার করে।

সারাদেশে ডাক্তারদের লাগাতার ধর্মঘট

জুলাই (১৯৯০) মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির খসড়া প্রতিবেদন সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হতে থাকে। এর কতকগুলি বিশেষ দিক চিহ্নিত করে

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে ডাক্তারদের সংগঠিত করতে থাকে।

এর মধ্যে ২৫ জুলাই জেনারেল এরশাদ বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে রেডিও টেলিভিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করেন। জেনারেল এরশাদের ভাষণ শুনে মনে হয়, তিনি স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করতে আসেন নি। তিনি ডাক্তারদের আক্রমণ করতে এসেছেন। কতকগুলি অবান্তর বাক্যযোগে এরশাদ প্রকৃপক্ষে দেশবাসীকে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে উস্কে দেন।

তিনি বলেন, ডাক্তার আর রোগীর মধ্যে তৈরী হয়েছে এক বিরাট ব্যবধান।... ডাক্তারের সঙ্গে রোগ বা রোগীর সম্পর্ক এরকম হতে দেওয়া যায়না।... কেবল ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই চলবে না নতুন ডাক্তার তৈরী করতে হবে, মানুষকে ভালবাসে এমন ডাক্তার। ডাক্তারদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।... কেবল স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ালেই আর ওযুধের পরিমাণ বৃদ্ধি, করলেই এর সমাধান হবে না।... আমরা খেয়াল করিনা যে যেখানে ডাক্তার আছে এবং ওযুধও আছে সেখানে জনগণ চিকিৎসা পায় না কেন?'

বস্তুতঃ জেনারেলের ভাষণের প্রধান অংশ জুড়েই ছিল এমন উস্কানীমূলক বক্তব্য। তিনি ইচ্ছে করেই ভীমরুলের চাকে ঢিল দেন। ডাক্তারদের নেতিবাচক দিকগুলিই তিনি শুধু তুলে ধরেন। তার ভাষণের মূল কথা ছিল, 'ডাক্তাররা টাকা চেনেন, রোগী চেনেন না'।

প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে ও কতক ব্যবসায়ী চিকিৎসকের মনোভাবের কারণে দেশের মানুষের ডাক্তারদের সম্পর্কে কতকগুলি নেতি ধারণা ছিল, জেনারেল এরশাদ সাধারণ মানুসের এই 'সেন্টিমেন্ট'কে কাজে লাগানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হন।

খুব স্বাভাবিক কারণেই ডাক্তাররা জেনারেলের ঘোষিত এই স্বাস্থ্যনীতি প্রতিরোধ করতে এগিয়ে চলে। কিন্তু দুই পক্ষই অনঢ় ও অচল থাকে। ডাক্তাররা তাদের ধর্মঘট এক টানা ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত বর্ধিত করে এবং ৩০ জুলাই থেকে সকল মেডিকেল, চিকিৎসা কেন্দ্র ও সরকারী চাকুরী থেকে ডাক্তাররা একযোগে পদত্যাগ করতে শুরু করে।

দেশে এই নিয়ে এক অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনেক রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে থাকে। মানুষের জীবন নিয়ে এই পক্ষই দুই খেলায় মেতে ওঠে। রেডিও টেলিভিশনে একতরফাভাবে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চলে।

গণবিরোধী আখ্যায়িত করে স্বাস্থ্যনীতি বাতিলের ডাক্তারদের আন্দোলন আরো জোরদার হতে থাকে। বি.এম. এ নেতৃত্বাধীন ডাক্তারদের আন্দোলন ক্রমাগত একটানা আঠার দিন চলার পর ১৫ আগষ্ট সরকার ডাক্তারদের কাছে আত্মসমর্পন করে। তারা তাদের ঘোষিত স্বাস্থ্যনীতি স্থগিত ঘোষণা করে এবং নতুন কমিটি করার কথা ঘোষণা করে।

সরকার ও ডাক্তারের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার এই লড়াইয়ে সরকারের কোমর ভেঙে পড়ে এবং তার নৈতিক পরাজয়ও ঘটে। চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে চিকিৎসকদের আন্দোলন জড়েয় পড়ায় সরকার আরো বিপাকে পড়ে। এরশাদ সরকারের পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে পরে ডাক্তার ধর্মঘটও চিহ্নিত হয়।

ডাকসুর উদ্যোগে ছাত্র কনভেনশন

পয়লা অক্টোবর (১৯৯০) ডাকসুর উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে সারাদেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সারাদেশের ২৬ টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ২ হাজার ৭ শত ৩১ জন নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি অংশ নেয়। ডাকসুর সহসভাপতি আমানউল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে কনভেনশন শুরু হয়।

কনভেনশনে ১২ দফা দাবী সংবলিত এক কর্মসূচীর ভিত্তিতে মাসব্যাপী আন্দোলনের খসড়া তৈরী করা হয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ব্যতীত অন্য আর কোনো ছাত্র সংগঠন এই কনভেনশনে যোগ দেয়নি।

১০ অক্টোবর (১৯৯০): মঘাড় পরিবর্তনের সূচনা

এরশাদ বিরোধী ছাত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলন ১০ অক্টোবর একটি মোড় পরিবর্তনের সূচনা করে। এদিন আটদল, সাত দল, পাঁচ দল, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, জামায়াতে ইসলামী, ঐক্য প্রক্রিয়া, ৬ দল প্রমুখ রাজনৈতিক সংগঠন সচিবালয় ঘেরাও করার কর্মসূচী নেয়। সকাল থেকেই এক দিকে পুলিশ-

বিডিআর, অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্মীরা মুখোমুখি সমবেত হতে থাকে।১৯৮৭সালের পর জেনারেল এরশাদকে হটানোর আন্দোলনে এই প্রথম আবার এতো বেশী প্রাণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ নেমে পড়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল হতাশ রাজনৈতিক কর্মীরাই বুঝি ব্যাপকভাবে অতিউৎসাহে নেমে পড়েছে। কিন্তু পরে তা ভুল প্রমাণিত হয়। হাজার হাজার মানুষ, এমনকি ঘেরাওকৃত সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও এতে পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে। সচিবালয়ের ২০ তলা ভবনের ছাদে উঠে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দূর থেকে আন্দোলনকারীদের সাথে হাত তুলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে, হাততালি দিয়ে আন্দোলিত জনতাকে উৎসাহিত করে।

দুপুর নাগাদ যখন সচিবালয় ঘেরাও শেষ পর্যায়ে অবস্থান করে তখন উত্তেজনা সংঘর্ষে পরিণত হয়। এক দিকে পুলিশ, বিডিআর ও জাতীয় পার্টির কর্মী এবং অন্যদিকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' শ্লোগান মুখর রাজনৈতিক কর্মী। এই সময় মতিঝিল আল্লাওয়ালা বিল্ডিং-এ অবস্থিত এবং কয়েকজন নিহত জাতীয় পার্টির অফিস থেকে পার্টি কর্মীরা গুলী ছুঁড়লে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। সারা বিক্ষুব্ধ নগরীতে এদিন মোট পাঁচজন নিহত ও শতাধিক আহত হয়। অসংখ্য গাড়ী ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়।

এদিন গুলীতে নিহত উল্লাপাড়া কলেজের ছাত্র জাহিদ হোসেনের লাশ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসে। পুলিশ তাদের পিছু নিয়ে লাশ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু ছাত্রাবাসে জাহিদের লাশ লুকিয়ে রাখে। সাতদল নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা বঙ্গবন্ধু হলে জাহিদের লাশ দেখতে আসেন।

সন্ধ্যায় ৮ দল নেত্রী শেখ হাসিনা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে রক্ষিত জাহিদের লাশকে সামনে রেখে ছাত্রদের শপথ করান। শপথের শেষে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ 'জয়বাংলা' দিয়ে বাক্য শেষ করলে উপস্থিত ছাত্রদল কর্মীরা মৃদু আপত্তি করে। এরপর বাকশাল নেতা আবদুর রাজ্জাক সেখানে এসে পুনরায় ছাত্রকর্মীদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

ছাত্ররা পরে জাহিদের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার কাছে হস্তান্তর করে।

এ দিনের আন্দোলনে ছাত্রনেতা জহিরুদ্দিন স্বপনকে গ্রেফতার করা হয়। ডাকসু নেতা আমানুল্লাহ আমান পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন। মোট ৭০ জনকে গ্রেফতারের কথা পুলিশ স্বীকার করে।

পুলিশ যে চার জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে তারা হচ্ছে, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া কলেজের ছাত্র জাহিদ হোসেন (২৫) (সে ঢাকায় চাকুরী খোঁজার উদ্দেশ্যে এসেছিল), মনোয়ার হোসেন মনু (২৬), বাম হাত কাটা এক পঙ্গু যুবক জাকির হোসেন এবং কুষ্টিয়া নিবাসী মনিরুজ্জামান।

সাংবাদিকদের কাছে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া নিহত আলতাফ হোসেন, ময়না, সাহিন ও জামাল–এর পরিচয় প্রকাশ করেন।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন

১০ অক্টোবর (১৯৯০) জাহিদের লাশ সামনে নিয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির বাদে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সকল ছাত্র সংগঠন আবার এক মঞ্চে আসে এবং এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ থাকার শপথ নেয়। ছাত্ররা তাদের নতুন ছাত্র মোর্চার নাম রাখে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য।
আটদল, সাতদল, পাঁচদল, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, কমিউনিস্ট লীগ প্রভৃতি সংগঠনের ডাকে ১০ অক্টোবরের ঘটনার প্রতিবাদে ১১ অক্টোবর সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে ছাত্র মিছিল নগরীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশ ছাত্রনেতাদের ধরে ধরে লাঞ্ছিত করে। পরিচয় দেওয়ার পরও পুলিশ ডাকসু নেতা আমানুল্লাহ আমান, খায়রুল কবীর খোকন, হাবিবুর রহমান হাবিব, নাজমুল হক প্রধান, নাজিমুদ্দিন আলম, অসিম কুমার উকিল, শাহ আলম, গোলাম মোস্তফা সুজন, ইসহাক আলী খান পান্না, মোশাররফ হোসেন, শাহরিয়ার চৌধুরী সহ প্রায় ৫৫ জন ছাত্রকে রাইফেলের বাট দিয়ে প্রহার করে। ছাত্রনেতা আমান, খোকন, হাবিব, প্রধান, আলম গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন।

এই খবর পাওয়ার পর ছাত্ররা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং পুলিশের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করে।

১২ অক্টোবর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখস্থ সড়কে। ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, নূর আহমেদ বকুল, শফী আহমেদ, ফয়জুল হাকিম প্রমুখ ছাত্রনেতা এই সমাবেশে রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দের উদ্দোশ্যে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। তাঁরা বলেন, প্রয়োজনে ধানমন্ডীর ৩২ নম্বর (বঙ্গবন্ধুর বাসভবন-লেখক) ও ২৭ নম্বর (বি.এন.পি-র কার্যালয় লেখক ঘেরাও করে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করা হবে।

সমাবেশে ১৬ অক্টোবর সারাদেশে অর্ধ দিবস হরতালের ডাক দেওয়া হয়।

ঢাকার ঘটনার প্রতিবাদে এদিন ফরিদপুরে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজেন্দ্র কলেজের সহসভাপতি রেজাউল করিম রাজা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।
ঢাকায় আটদলের জামায়েতে শেখ হাসিনা ৫ খুনের বদলা নেওয়ার জন্যে ছাত্র-জনতার কাছে আবেদন করেন। বাকশাল নেতা আবদুল রাজ্জাক, কমিউনিষ্ট পার্টির নূরুল ইসলাম প্রমুখ জামায়েতে বক্তৃতা করেন। সমাবেশে ১৬ অক্টোবর ও ১০ নভেম্বর হরতালের ডাক দেওয়া হয়।

১৩ অক্টোবর (১৯৯০) সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী পালনকালে তেজগাঁও পলেটেকনিক ইনষ্টিটিটিউটের ছাত্র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে গুলী করে হত্যা করা হয়। বিরোধী দল তেজগাঁওয়ের সংঘর্ষে আরো দু'জন নিহত হওয়ার দাবী করে।

এদিন গুলী বর্ষণের ঘটনার পরপরই নগরীতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব থেকেই আন্দোলনের উত্তপ্ত কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্র জড়ো হয়। ক্যাম্পাসের চারদিকে পুলিশ বিডিআরের ব্যারিকেড ভেঙে ছাত্ররা রাজপথে বেরিয়ে আসে।

দুপুরে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মনিরুজ্জামানের লাশ নিয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এক বিশাল সমাবেশ করে। ছাত্রনেতা ফজলুল হক মিলন, কামাল হোসেন, নাসির-উদ-দুজা সরকারের পতন আসন্ন বলে ঘোষণা করেন। এই সময় রাজনৈতিক নেতারাও সমাবেশে যোগদান করেন।

আটদল নেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবাদী ছাত্রদের শপথ বাক্য পাঠ করান। পরে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়েই তা শেষ করেন। এই সমাবেশ স্থলেও এর মৃদু প্রতিবাদ করা হয়। পরদিন কয়েকটি সংবাদপত্র এই ঘটনাটি রং চড়িয়ে

এমনভাবে পরিবেশন করে যাতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারতো।

বস্তুত কয়েকটি সংবাদপত্র এদিন দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে নি, বরং সরকার লাভবান হতে পারে এমন রং মিশ্রিত খবরই পারবেশন করে। সরকার বিরোধী আন্দোলনে কি খবর পরিবেশন করলে স্বৈরাচারের লাভ হবে, দেশ ও জাতির দিক থেকে সাংবাদিকদেরও দায়িত্ব কি নেই ছাত্র সমাজ এই প্রশ্ন তোলে।

শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠার সাথে সাথে নানারকম আরো ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এদিন কে বা কারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত আনবিক শক্তি কমিশনে ঢুকে গাড়ী, যন্ত্রপাতি ও মূল্যবান দলিলপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। সবচেয়ে বিপদের কথা হলো, এতে বড় ধরণের বিস্ফোরণ ঘটে ভয়ানক ধরণের ঘটনাও ঘটে যেতে পারতো।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা অনুমান করেন, ছাত্রদের আন্দোলনে সরকারী এজেন্টরা ঢুকে এ কান্ড করেছে। প্রমাণ স্বরূপ তারা উথাপন করে, প্রায় দেড় থেকে দু'ঘন্টা ধরে এখানে আক্রমণ ও ভাঙচুর চলে। কিন্তু পুলিশ আসে নি। অনেকে মনে করেন, ছাত্রদের মধ্যে অবস্থিত একদল হঠকারীও অতিউৎসাহে এই জাতীয় ক্ষতির সাথে জড়িত থাকতে পারে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এদিন ঢাকা, আরিচা সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে রাখে। সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই অবরোধ চলে।

১৩ অক্টোবর শহরে সারাদিন থমথমে অবস্থা বিরাজ করে এবং রাতে বঙ্গভবনে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক বাতিল করা হয়। তথ্যমন্ত্রী ড. মীজানূর রহমান শেলীর পদত্যাগের গুজব সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে।

শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্র: উচ্চ মহলের সকলেই জড়িত

নতুন করে আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে সরকার ১৩ অক্টোবার (১৯৯০) আবার জোর করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ মহানগরীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। ১৫ অক্টোবর যখন–তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার অধিকার সম্পর্কিত একটি অধ্যাদেশ সরকার জারী করেন।

সমগ্র বাংলাদেশ ও শিক্ষিত সচেতন মহল সরকারের এই পদক্ষেপের নিন্দা করে। উর্দ্ধতন সরকারী ও ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের বেশীর ভাগ সন্তানই বিদেশে লেখাপড়া করে বলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দিনের পর দিন এভাবে বন্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে নীতি নির্ধারকরা সোচ্চার হন নি। এই অবস্থা পন্থীদের বিরোধী রাজনৈতিক মহলেও কম ছিল না। ফলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও তার ছাত্রদের অবস্থা সম্পর্কে কারো কোনো মাথা-ব্যথা ছিল না। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ এমনি একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে ছিল।

এই একই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সংগঠনে অস্ত্র ও অস্ত্রধারীদের আশ্রয় দেওয়া হয়। বাংলাদেশের চারটি ছাত্র সংগঠন, বি.এন পি সমর্থক জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল, জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির, আওয়ামী লীগপন্থী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (হা-অ), জাসদপন্থী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মু-না) অস্ত্র ও সন্ত্রাসের অভিযোগে কম বেশী সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে অভিযুক্ত হয়। কিন্তু তাদের কেউই নিজ নিজ ঘর পরিষ্কার করতে স্বীকৃত হয় না। একটা বড় ধরণের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ছাত্রদের জীবনকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্যেই যে ছাত্র সংগঠনে অস্ত্রের আমদানী তা এই সংগঠনগুলি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। কর্মীদের প্রায়ই তারা বোঝাতো, সংগঠনের অস্তিত্বের জন্যেই অস্ত্র প্রয়োজন, তা নাহলে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় টিকে থাকতে পারবেনা, ইত্যাদি।

ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই যে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করেছেন তার প্রতিবাদ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়। প্রখ্যাত আইনজীবী ড. কামাল হোসেন এই চ্যালেঞ্জের নেতৃত্ব দেন। তিনি আদালতে বলেন, ১৩ অক্টোবর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে কিন্তু ১৫ অক্টোবর অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছে। সুতরাং ১৩ অক্টোবর কোন ক্ষমতা বলে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেছেন দেশবাসী তা জানতে চায়। ১৩ অক্টোবর সরকার সুনির্দিষ্ট ভাবেই অবৈধ কাজ করেছেন, কারণ তখন অধ্যাদেশের অস্তিত্ব ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ৫ নভেম্বর এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে ৭ নভেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার জন্যে দাবী জানায়। শিক্ষকরা বলে, অন্যথায় ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারী মিলেই বিশ্বদ্যিালয় খুলে দেবে।

১৭ অক্টোবর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার জন্যে সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকার জন্যে উপাচার্যের প্রতি আহবান জানায়। তারা বিশ্বদ্যিালয় খোলা রাখতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ এনে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবী করে।

বিভিন্ন জেলায় ক্ষুব্ধ গর্জন

১৩ অক্টোবর (১৯৯০) ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এক বিরাট মিছিল বের করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজের ছাত্র সংসদের সহসভাপতি আনিসুর রহমান মঞ্জুর সভাপতিত্বে এক সমাবেশে ছাত্রদল নেতা মোশাররফ হোসেন ঠাকুর, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের দীপক চৌধুরী বাপ্পি, ছাত্রলীগ (হা–অ) নেতা শাহআলম, ছাত্রদল নেতা জহিরুল হক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আতিকুর রহমান প্রমখু বক্তৃতা করেন।

গোপালগঞ্জে এদিন ছাত্ররা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে অবিলম্বে এরশাদ শাহীর পতন কামনা করে। ছাত্রনেতা কারুজ্জামান, জাহিদুল আলম তুহিনসহ ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ এতে বক্তৃতা করেন।

১৪ অক্টোবর (১৯৯০) দৈনিক দেশ প্রথম পৃষ্ঠায় '**বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ**' শিরোনামে লেখে: 'রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আন্দোলন–সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সমাজ রোষে–ক্ষোভে আবারো ফুসে উঠেছে। রাজপথের আন্দোলন দমনে নির্বতন–মূলক ব্যবস্থা এই ক্রোধের তরঙ্গকে আরো উত্তাল করে তুলেছে। সকল ভেদাভেদ ভুলে ছাত্ররা তাদের সাংগঠনিক গন্ডি ভেঙে ঐক্যের কাতারে শামিল হয়ে নেমেছে সংগ্রামে'।

রাজধানী ঢাকায় উপর্যুপরি হত্যা ও পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী ১৪ অক্টোবর বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহীতে ছাত্র–পুলিশ সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশতাধিক যানবাহন ভাঙচুর এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়রসহ ৩৬ জন ছাত্র–পুলিশ আহত হয়।

১৪ অক্টোবর সকাল থেকেই মহানগরীতে ছাত্র–জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষুব্ধ ছাত্র–যুবকরা বিআরটিসি'র বাস ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সামনে পৌর কর্পোরেশন ও খাদ্য বিভাগের ট্রাক

ভাঙচুর করে। এছাড়াও দিনভর সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪০ টিরও বেশী সরকারী, বেসরকারী গাড়ী ভাঙচুর হয়।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সিটি কলেজ, সদর হাসপাতালের মোড়, সিটি কর্পোরেশন, সাহেববাজার, লক্ষ্মীপুর এলাকায় ছত্র-যুবক ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়। এ সময় পুলিশ প্রায় অর্ধশতাধিক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫ জন ছাত্র-যুবক ও ১৫ জন পুলিশ আহত হয়। এ সময় কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হন।

বেলা সোয়া বারটার সময় একদল যুবক পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ভেতর প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ সময় সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের জীপ ও অফিসে আগত এক ব্যক্তির মোটর সাইকেলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নুরুল হুদা মাথায় ইটের আঘাতে জখম হন।

পুলিশের সাথে সংঘর্ষ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের মধ্যদিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ২২ ছাত্র সংগঠন আহূত ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে।

ঢাকায় পুলিশের গুলীতে পুনরায় ছাত্রহত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লে ১৩ অক্টোবর রাতে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে রাত ১১ টার দিকে উত্তেজিত ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে ভাঙচুর এবং স্টেশন মাস্টারের রুম তছনছ করে। পরদিন সকাল ৭টায় ছাত্ররা কাজলা গেটের সামনে ঢাকাগামী একটি বিআরটিসি বাস থামিয়ে ভাঙচুর এবং ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

পুলিশ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। বেলা ১১টার দিকে উত্তেজিত ছাত্ররা বিশ্বদ্যিালয়ের পূর্বদিকে অবস্থিত অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আমিনুল হক বেগ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক এক যুক্ত বিবৃতিতে পুলিশের গুলীতে নিরীহ ছাত্র-জনতার মৃত্যুতে গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা করেছেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বদ্যিালয়ে এই দিন ছাত্র ধর্মঘট চলাকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সকাল ৮টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত ঢাকা–আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এই সময় কয়েকবার ছাত্র–পুলিশের মধ্যে ধাওয়া–পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জে কমপক্ষে ২০ জন ছাত্র আহত হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা দুপুর ১২টার দিকে একটি প্রাইভেট কার (ঢাকা মেট্রো ভ–৮৬৮৪) পুড়িয়ে দেয় এবং বেশ কয়টি বাস ভাঙচুর করে।

যশোরে ১৪ অক্টোবর (১৯৯০) দড়াটানা মোড়ে ৭ দলীয় ঐক্যজোটের উদ্যোগে আলী রেজা রাজুর সভাপতিত্বে একটি জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, এডভোকেট নজরুল ইসলাম, মোঃ ইসহাক, ছাত্রদলের সাবেরুল হক প্রমুখ।

খুলনায় ছাত্ররা শোক মিছিল, সমাবেশ করে। ছাত্ররা এ সময়ে ৫টি যানবাহন ভাঙচুর ও বেশকিছু দোকানপাটে ইট–পাটকেল ছুঁড়ে।

ছাত্ররা সকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বইখাতা নিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল আকারে বেরিয়ে আসে। এ সময়ে ছাত্ররা খুলনা পলিটেকনিকের মোড়ে ১টি জীপ, পিকচার প্যালেসের মোড়ে বিসিআইসি ব্যাংকের ১টি কারসহ ৩টি গাড়ী এবং সুন্দরবন কলেজের সামনে ১টি গাড়ী ভাঙচুর করে। বিকেলে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের এক সমাবেশ হয়।

চট্টগ্রামেও বিক্ষোভ সমাবেশ পালিত হয়। এ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ৭ দলীয় ঐক্যজোটের উদ্যোগে সন্ধ্যায় দোস্ত বিল্ডিং চত্বরে এবং দারুল ফজল মার্কেট চত্বরে ৮ দলের সামাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ৭ দলীয় ঐক্যাজোটের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, জনাব আবদুল্লাহ আল নোমান। সমাবেশে জনাব আবদুল্লা আল নোমান প্রত্যেক জোট ও দলকে এক মঞ্চে এসে সরকার হটাও আন্দোলন জোরদার করার আহবান জানান।

সন্ধ্যায় দারুল ফজল মার্কেট চত্বরে আয়োজিত ৮ দলীয় ঐক্যাজোটের অপর এক বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। এদিকে আজ বিকেলে জাতীয় শ্রমিক লীগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরী কর্মপরিষদের এক জরুরী সভায় ঢাকায় গত কয়েকদিনের ঘটনার নিন্দা করা হয়।

ঢাকায় ছাত্র মিছিলের ওপর গুলী বর্ষণসহ ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের নির্বিচার হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন চট্টগ্রামে ২ ঘন্টা কলম বিরতি ঘোষণা করে।

সিলেটে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়। সকাল ১০টা থেকেই শহরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সকাল সাড়ে ১১টায় টিলাগড়স্থ এমসি কলেজের সামনে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা সিলেট কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (সিলেট ট-৪৬৭৪) ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় শহরের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতা ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে।

বিকেল ৪টায় চৌহাট্টাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ঢাকায় নিহতদের স্মরণে এক বিরাট শোক মিছিল বের করে।

নোয়াখালিতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বে সব ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। দুপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা মিছিল সহকারে টাউন হল চত্ত্বরে এক প্রতিবাদ সভা সাইদ মাহবুব পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত করে। এতে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রদল সভাপতি হারুনুর রশীদ আজাদ, ছাত্রলীগ (হা-অ) নেতা ও কে এম আবু নাছের, কাজী শাহজাহান শাহীন, কৈশর ও আরমান প্রমুখ।

বরিশালে দ্বিতীয় দিনের মত ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। শহরের সব শিক্ষা প্রতি নের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসে। তাদের মুহর্মুহ শ্লোগানে বরিশাল শহর একটি বিক্ষোভ নগরীতে পরিণত হয়। দুপুর ১২টার দিকে সার্কিট হাউজ সংলগ্ন সদর রোডে একটি সরকারী গাড়ী ভাঙচুর করা হয়। সন্ধ্যায়ও বেশ কয়েকটি মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বরিশাল বি এম কলেজের সামনের রাস্তায় মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর একটি কুশপুত্তলিকা টাঙ্গানো হয়। মিছিলকারীরা সরকারের পদত্যাগ, পুলিশী গুলী বর্ষণের নিন্দা , ১৫-১৬ অক্টোবরের হরতালের সমর্থনে শ্লোগান প্রদান করে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটি শোক মিছিল স্থানীয় সরকারী কলেজ থেকে শহরে প্রবেশের পথে বি এ রোডে আসলে পুলিশ বাধা দেয়। এতে উত্তেজিত ছাত্ররা এক পর্যায়ে গাজীপাড়াস্থ জেলা জাতীয় পার্টির কার্যলয়ে ভাঙচুর চালায়। এ সময় পুলিশ তাড়া করলে উত্তেজিত ছাত্ররা টিএন্ডটি অফিসের সামনে দাঁড়ানো

একটি মাইক্রোবাস (ঢাকা-৫০৪৪) এবং জনতা ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসের দরজা-জানালা ভাঙচুর করে। এ সময় পুলিশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। সকালে ৮. ৭ ও ৫ দলের এক যৌথ বৈঠকে তিন জোটের এক লিয়াজোঁ কমিটি গঠিত হয়।

মানিকগঞ্জে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে একটি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, ৫টি গাড়ী এবং মানিকগঞ্জ জেলা জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর করা হয়। ঘিওর উপজেলার বরঙ্গাইল বাসস্ট্যান্ডের কছে দু'টি বিআরটিসি যাত্রীবাহী বাস ও একটি ট্রাক বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ভাঙচুর করে।

রাত ৮টায় সর্বদলীয় ঐক্যজোট আওয়ামী লীগ অফিস ভাঙচুরের প্রতিবাদে একটি মিছিল সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে এবং সাবিস মিলনায়তনের সামনে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

নীলফামারীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। সন্ধ্যায় ছাত্র ঐক্য পরিষদের আহবানে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

চাঁদপুর-এ সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে একটি সরকারী জীপ এবং বিপণীবাগ মার্কেটের সামনে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জীপ ভাঙচুর করার হয়। চাঁদপুর সরকারী কলেজের মধ্যে পুলিশ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। এতে জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদসহ ১০ জন ছাত্র আহত হয়।

দুপুরে গাজীপুর চৌ-রাস্তায় ১১টি যানবাহন ভাঙচুর করা হয়। বিআরটিসি বাসে (ঢাকা চ-১৭৪৮) আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। সড়ক ও জনপথ বিভাগের ৫টি গাড়ী ভাঙচুর করা হয়। বিকেলে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজীর মাঠে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে এবং একই সময়ে জয়দেবপুর বটতলায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলে দমকল বাহিনী আগুন নেভানোর জন্য পানিবাহী গাড়ী নিয়ে বের হয়। কিন্তু পথিমধ্যে দমকলের গাড়ীর গতিরোধ করে তাতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। এতে সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা হারুনুর রশিদ, ৩ জন ফায়ারম্যান ও গাড়ীর চালক গুরুতর আহত হয়। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মাগুরায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের আহবানে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধর্মঘট পালিত হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা খুলনা থেকে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে ভাঙচুর করে।

কিশোরগঞ্জ-এ সরকারী গুরুদয়াল কলেজ প্রাঙ্গনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বাসস্ট্যান্ডে বিআরটিসি বাস (ঢাকা মেট্রো চ-৭৩৫৮) ও পৌরসভার একটি ট্রাক (ঢাকা অ-১৪৮) ভাঙচুর করা হয়।

নারায়ণগঞ্জের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট চলাকালে শহরে বেশ কয়েকটি বাস ভাঙচুর করা হয় ও কয়েক দফা ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়।

জয়বাংলা বিতর্ক এবং সাংবাদিকদের নিরুদ্ধ দায়িত্বহীনতার অভিযোগ

১৪ অক্টোবর (১৯৯০) আটদল নেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় আট দলের বিশাল সমাবেশে অত্যন্ত উত্তেজনাকর বক্তৃতা দেন। বস্তুতঃ ১৩ অক্টোবর 'জয় বাংলা', নিয়ে কথিত ঘটনার ফুলানো-ফাঁপানো রিপোর্ট লিখে কতিপয় সংবাদপত্র (দৈনিক দেশ, মিল্লাত, ইনকিলাব যে পরিস্থিতি সৃষ্টির উস্কানী দেন, শেখ হাসিনা তার ফাঁদে পা দেন।

তিনি জনসভায় এক অপরিপক্ক অথচ উত্তেজনাকর বক্তব্য দিয়ে বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর, জয়বাংলা শ্লোগানেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। জয়বাংলা শ্লোগান শুনলে যাদের কষ্ট হয়, তারা সরকারের এজেন্ট এবং তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'-এর মতো এই দেশে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' চলবে না।

আন্দোলকামী ছাত্র-জনতা দেশে গড়ে ওঠা এমনি এক অবস্থায় শেখ হাসিনার বক্তব্যে আহত হন। তাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়। ফ্রিডম পার্টিসহ আরো কতকগুলি সাম্প্রদায়িক দল সেদিনই আন্দোলনে ঐক্য বিনষ্টের লক্ষ্যে 'জয় বাংলায় লাথি মার-জিন্দাবাদ কায়েম কর' শ্লোগান দিয়ে মাঠে নামে।

এরশাদের পতিতমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ 'জয়বাংলা নিয়ে এক বিবৃতি দিয়ে উস্কানী সৃষ্টি করেন। তবে ১৬ আক্টোবর হরতালের দিন তিনি ১০-১৫ জনের বালক শ্রেণীর 'যুবক' নিয়ে মিছিল করলে ছাত্র জনতার হাতে লাঞ্ছিত হন। '৭১-এ পাক

সেনাদের মুরগী সরবরাহকারীকে ধর এরশাদের ঝাড়ুদারকে ধর-ধর বলে জনতা তাকে দৌড়ে দিয়ে আসে। আনোয়ার জাহিদ প্রাণ দিয়ে বেঁচে যান।

১৬ অক্টোবর (১৯৯০) আদল, সাতদল, পাঁচ দল এক বিবৃতি নিয়ে ১৩ অক্টোবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ হাসিনার 'জয়বাংলা' শ্লোগানকে নিয়ে কতিপয় সংবাপত্রের ফুলানো ফাঁপানো সংবাদ পরিবেশনকে 'হীন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত,' 'মিথ্যাচার' 'অতিরঞ্জিত' বলে নিন্দা করে।

কিন্তু বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন তিন জোটের এই বিবৃতি গ্রহণ করতে রাজী হয় না। তারা পাল্টা এক বিবৃতি দিয়ে 'অভিযোগ নিতান্তই মনগড়া' বলে প্রত্যাখ্যান করে।

দেশবাসী সাংবাদিকদের এই ভূমিকায় তাদের লজ্জা প্রকাশ করে। একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যেন সাংবাদিকদের কোনই ভূমিকা নেই, যেন তারা 'অবিকৃত সংবাদ পরিবেশন, এর আজীবন দুধে-ধোওয়া।

১১ অক্টোবর পুলিশের রাইফেলের বাটের আঘাতে আহত ছাত্র নেতারা ১৬ অক্টোবর হাসপাতাল ত্যাগ করেন। এদিন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ঘোষণা করে শ্লোগান নিয়ে কোনো অনাকাঙ্খিত বিতর্ক ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ফাটল ধরাতে পারবে না। ছাত্ররা এদিন ঘোষণা করে, 'পথে নেমেছি, পথে মরেছি, পথে থাকব'।

১৬ অক্টোবরের সফল হরতালের পর তিন জোটের পৃথক সমাবেশ থেকে ২৭ অক্টোবর সারাদেশে রাজপথ, রেলপথ, পানিপথ অবরোধের অভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ১৯ অক্টোবর (১৯৯০) সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নূর হোসেন চত্ত্বরে কালোপাতাকা উত্তোলন করে। ছাত্ররা বলে, স্বৈরাচারের পতন না হওয়া পর্যন্ত এ পতাকা উড়বে। ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান ও খায়রুল কবির খোকন যৌথভাবে এই পতাকা উত্তোলন করে।
পরে কালো পতাকা হাতে এক বিক্ষোভ মিছিল রাজধানীর রাজপথগুলি প্রকম্পিত করে তোলে। ছাত্রনেতা এস.এম কামাল হোসেন ও মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল বিক্ষোভ শেষে সমাবেশে বক্তৃতা করেন। ছাত্রনেতারা বলেন, শহীদ নূর হোসেন চত্ত্বরে দাঁড়িয়ে আজ আমরা শপথ নিলাম, রক্তের বদলা নেব, তবে ঘরে ফিরব।

সারাদেশে এই দিন তিন জোটের উদ্যোগে গত কয়দিনে নিহতদের স্মরণে শোক দিবস পালিত হয়। প্রতিটি প্রধান শহরে ছাত্র-জনতা মৌন মিছিল করে প্রধান প্রধান

সড়ক প্রদক্ষিণ করলে ভাব গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মানুষ ফুঁসে উঠে। গর্জে উঠে বীর বাঙালী।

রাজধানীতে আটদলের শোক মিছিলে নেতৃত্ব দেন শেখ হাসিনা, সাইফুদ্দিন মানিক, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মঞ্জুরুল আহসান খান, আবদুর রাজ্জাক, আবদুল মোমিন তালুকদার, সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ নাসিম, পংকজ ভট্টাচার্য, কামাল হায়দর প্রমুখ।

২১ অক্টোবর (১৯৯০) বিরোধী দলের পূর্ব ঘোষিত হরতাল ছিল। এরশাদ সরকার এক চাতুরী করে এই হরতালকে সেনাবাহিনীর 'সেন্টিমেন্টকে' কৌশল হিসেবে নেওয়ার চেষ্টা করে। প্রতি বছর ২১ অক্টোবর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' হিসেবে পালিত হয়। সরকার তথ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তরের এক বিবৃতি প্রচার করে মুক্তিযুদ্ধের এই দিনটি স্মরণে হরতাল প্রত্যাহার করার জন্যে আহবান জানায়। সরকার ভেবেছিল, বিরোধী দল এই আহবানে সাড়া দেবেনা। কিন্তু তিন জোট অত্যন্ত বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে এই হরতাল প্রত্যাহার করলে সেনাবাহিনী ও তিন জোট একটা মানসিক সমঝোতায় পৌছে যায়, যা এরশাদ সরকারের জন্যে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

এতোদিন জেনারেল এরশাদ সেনাবাহিনী, সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা ডি. এফ. আই, এন. এস. আই-কে নিজের ক্ষমতা রক্ষার কাজে ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে ব্যবহার করেন।

গণঅভ্যুত্থানের সম্ভবনা

এই সময় সরকার, বিরোধী দলের আন্দোলনে বিভিন্ন খবর যাতে সংবাপত্রে না ছাপা হতে পারে, তার জন্যে কড়া 'প্রেস সেন্সরসীপ' আরোপ করে। এছাড়া, সরকারী বিজ্ঞাপন বন্টনেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

২২ অক্টোবর (১৯৯০) ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ডাকে ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

একই দিন জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে এরশাদ সমর্থক জাতীয় মহিলা পার্টি একটি মিছিল বের করে। মহিলামন্ত্রী সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ, অধ্যাপিকা তৌফিকা করিম, ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভুইয়া, বেগম সবিতা মাহমুদ প্রমুখ মিছিলের নেতৃত্ব দেন।

মিছিলের পূর্বে মহিলা বক্তারা বলেন, 'দেশে এখন উন্নয়নের জোয়ার বইছে'২৩ অক্টোবর (১৯৯০) সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ও তিন জোটের ডাকে সারাদেশে জেলা-উপজেলা পরিষদ ঘেরাও করা হয়। প্রায় তিন শতাধিক আন্দোলনপন্থী এতে আহত হয়।

এদিন দেশের ৬৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক বিবৃতিতে আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করার আহবান জানান।

সরকারের উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ এদিন উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, গণঅভ্যুত্থানের কোনো সম্ভবনা নেই।

সারাদেশে রাজপথ, রেলপথ, পানিপথ অবরোধ

২৪ অক্টোবর ঢাকা বিভাগীয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ ময়মনসিংহ টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান, নাজিমুদ্দিন আলম, শফি আহমদ, এস. এম কামাল হোসেন, নাসির-উদ-দুজা, নূর আহমেদ বকুল, বেলাল চৌধুরী এবং বাকসুর সহসভাপতি আবদুর রফিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

২৫ অক্টোবর ঢাকায় সচিবালয়ের পশ্চিম গেট ও শহীদ মিনারে দুটি ছাত্র গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রনেতারা 'যেখানেই দালাল পাবেন, সেখানেই তাদের ধরবেন' নির্দেশ দেয়। নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত আগুন, পাড়া-মহল্লায় আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার আহবান জানান।

২৬ অক্টোবর ডাকসুভবনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের জাতীয় সংগঠনগুলির এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পয়লা নভেম্বর ঢাকা মহানগরীর স্কুলগুলিতে কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ এবং মিছিল করার সিদ্ধান্ত হয়। ৭ নভেম্বর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী দেশের সকল জেলা-উপজেলায় মন্ত্রী, দালাল ও সরকারী নেতাদের সামাজিকভাবে বয়কট করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৭ অক্টোবর সারাদেশে রাজপথ, সড়ক, রেলপথ, পানিপথ অবরোধ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশই এই সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সরকারের প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। মন্ত্রীদের দায়িত্ব দিয়ে এরশাদ যার যার জেলায় পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তার উল্টো ফল হয়। কোথাও কোথাও মন্ত্রীরাও জনতার রোষানলে পড়েন।

সরকার দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রাজনৈতিক নেতাদের ঢালাও আটকের নির্দেশ দেন।

৩১ অক্টোবর (১৯৯০) সিলেটে স্থানীয় আদালত মোড়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সভায় কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতারা বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ডাকসু নেতা আমানুল্লাহ আমান ছাড়াও ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান হাবিব, মোখলেসুর রহমান, রাফেকুজ্জামান রতন, গাজী সামছুদ্দীন, এম. এ আউয়াল, হুমায়ুন কবীর ববী, মোঃ ইয়াছিন আলপনা, আবু বকর ইকবাল, জিয়াউল হক জিয়া, ওবায়দুল্লাহ সাগর এবং আনোয়ার হোসেন মিন্টু বক্তৃতা করেন। ছাত্র নেতারা বলেন, রক্তের উপর দাঁড়িয়ে ঐক্য গড়েছি, তাকে ভাঙ্গার কোনো শক্তি নেই। তারা বলেন, চলমান আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোই আজ সময়ের দাবী।

একই দিন বরিশালে অশ্বিনী কুমার টাউন হল প্রাঙ্গনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য জোটের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাকসু নেতা রুহুল কুদ্দুস বাবু সহ এতে বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা নাজিমউদ্দিন আলম, শাহ আলম, এস. এম. কামাল হোসেন, বেনজির আহমেদ, আবদুল্লাহ কাফি রতন প্রমুখ। ছাত্রনেতারা এখানে বলেন, আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে রাজপথেই তাদের বিচার করা হবে।

আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: ইনকিলাব, ভোআ ইত্যাদি

জেনারেল এরশাদ তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলন ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্যে ৩১ অক্টোবর (১৯৯০) এক অমানবিক ও কান্ডজ্ঞানহীন পাপাচারে লিপ্ত হন। ভারতে তখন উগ্রবাদী হিন্দু সম্প্রদায় বাবরী সমজিদ নিয়ে এক প্রলয়ঙ্করী সাম্প্রদায়িক খেলায় মগ্ন। জেনারেল এরশাদ বাবরী সমজিদের ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশে ভারত বিরোধী জিগির তুলে আন্দোলনকে অন্য দিকে চালিয়ে দেওয়ার এক ব্যর্থ অপচেষ্টা করে। পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশের এরশাদ পর্যন্ত সকল স্বৈরশাসকই এভাবে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনকে ভারত বিরোধী বিভিন্ন ঘটনায় যুক্ত করে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু জেনারেল এরশাদের জন্যে এটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। তিনি ৩০ অক্টোবর নরপিশাচ মাওলানা মান্নানকে ডেকে নেন এবং তাঁর দৈনিক সংবাদপত্র ইনকিলাবে পরদিন ৩১ অক্টোবর সংখ্যায় এক মিথ্যা খবর ছাপানোর ষড়যন্ত্র করেন।

৩১ অক্টোবর মাওলানা মান্নানের দৈনিক ইনকিলাব প্রথম পাতায় এক বড় বড় শিরোনাম করে লিখে, 'উগ্রপন্থী হিন্দুরা অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভেঙ্গেছে'। প্রকৃপক্ষে এটা ছিল সত্যের অপলাপ। ভারত সরকার লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করে এই মসজিদটি রক্ষা করে। ইনকিলাব বাংলাদেশের মুসলমানদের জেহাদের ডাক দেয়।

দৈনিক ইনকিলাব-এর এই মিথ্যা খবর ছড়িয়ে পড়লে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুযায়ী সরকারী গুন্ডা ও লুটেরা বাহিনী ছিল প্রস্তুত। সারাদেশে তারা হিন্দুদের মন্দির, ঘর, বাড়ী, ব্যবসা কেন্দ্রে আগুন দেয়, লুট করে, হামলা চালায়।

দৈনিক ইনকিলাব ছাড়াও ৩১ অক্টোবর রাত ১০ টায় ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বুলেটিনে সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীও তাঁর স্বকণ্ঠে এক মিথ্যা শ্রুতির সংবাদ পরিবেশন করে উস্কানী দেন। তিনি যে বিবরণী পাঠান তার হুবহু বিবরণটি এরকম: 'দিনের বেলায় ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ হিন্দু মালিকাধীন মিষ্টির দোকান লুটপাট ও ভাঙচুরের সময় লুটেরার দল নাকি বলেছে যে, ঐসব মিষ্টির দোকান থেকে বাবরী মসজিদ আক্রান্ত হওয়ার সময় উল্লাস প্রকাশ করে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল। এই অজুহাতেই এসব লুট করা হচ্ছে'।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দৈনিক ইনকিলাব ও গিয়াস কামাল চৌধুরী স্বৈরাচারের এজেন্ট হয়ে এই যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলেন তা সমাজে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলো। এই একটি ভুলের জন্যে সারাদেশে তান্ডব বয়ে গেল।

সরকার মিথ্যা খবর পরিবেশনের জন্যে লোক দেখানোর ছলনায় ১৫ দিনের জন্যে 'ইনকিলাব' নিষিদ্ধ ঘোষণার একটা ছল করেন।[৪২]

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এই সময় আরেক 'দায়িত্বশীলতার' পরিচয় দেয়। এরা সিদ্ধান্ত নেয়, মিথ্যা খবর পরিবেশন করুক, আর যা-ই করুক, ইনকিলাব নিষিদ্ধ ঘোষণা করা চলবে না। নিষিদ্ধ করলে সাংবাদিকরা ধর্মঘটেরও হুমকি দেয়। মিথ্যা খবর ছেপে জাতির এমন একটি সর্বনাশ করে দায়িত্বহীন সাংবাদিকতার পরিচয় দিল 'ইনকিলাব', সাংবাদিক ইউনিয়ন তার বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করলো না, এটা নাকি ছিল পেশার স্বাধীনতা। সাংবাদিক ইউনিয়নের মাধ্যমে এটাও ছিল সরকারের

একটি সাজানো ঘটনা। সরকার প্রায় সাথে সাথেই আবার নিষিদ্ধ ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেয়।

তথ্যমন্ত্রী ড. মীজানূর রহমান শেলীকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'ইনকিলাব নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন কেন, তিনি জবাব দেন, 'আজকের ইনকিলাব পড়ুন'। পরে আবার জিজ্ঞেস করা হয়, 'ইনকিলাবের নিষিদ্ধ ঘোষণা প্রত্যাহার করলেন কেন, তিনি জবাব দেন, 'আগামীকালের ইনকিলাব পড়ুন'।

পরদিন পয়লা নভেম্বর, দৈনিক ইনকিলাব-এর সম্পাদক অবিশ্বাস্যভাবে 'নাকে-খত' দেয়। ইনকিলাব বলে, গতকালের বাবরী মসজিদ ভেঙেফেলার ঘটনার খবরটি ভিত্তিহীন ছিল। তারা দুঃখপ্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধে, দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষারও আহ্বান জানায় ইনকিলাব পত্রিকা।

কিন্তু সরকার, ইনকিলাব এবং ভোআ-র মাধ্যমে দেশে কবরের শান্তি কায়েম করেছিল, সারাদেশেই তখন লুট, হত্যা, আগুন জ্বলছিল। সর্বনাশা এই ঘটনায় কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান প্রধান মৌলবাদী ও ধর্মভিত্তিক দলগুলো যোগ দিল না। তারা সরকার বিরোধী আন্দোলনে তিন জোটের সাথে ছিল। জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিস সহ বিভিন্ন মসজিদের হাক্কানী আলেমগণ সরকারের ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যোগ দেয়। অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংবাদপত্র 'সংবাদ'-এর মতোই ভূমিকা পালন করে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম'।

ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ বেশ কয়েকটি শহরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। এখানে কারফিউ ও ১৪৪ ধারা জারী করা হয় নাম মাত্র। শুধু বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্যে ছাত্র, জনতার মিছিলকে প্রতিহত করতে। কিন্তু এই কারফিউর মধ্যেও লুটেরারা ঠিকই লুট ও অগ্নিসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছিল।

৩১ অক্টোবর (১৯৯০) জেহাদ ঘোষণাকারী 'ইনকিলাব' ২ নভেম্বর ব্যানার শিরোনাম করে 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই: একসাথে থাকতে চাই'।

রাজনৈতিক মহল জীবন নিয়ে খেলার এই সরকারী অপকর্মে ও খেলায় স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, পেশাজীবী পরিষদ, তিন জোট ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল সংগঠন সারাদেশে শান্তি মিছিল বের করে এবং সম্প্রীতি রক্ষা কমিটি করে লুটপাট বাহিনী প্রতিহত করার তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

তিন জোট ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ঘোষণা করে, সরকারের ষড়যন্ত্র সফল হবে না, স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন চলবে। বস্তুতঃ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনমনে সরকারের বিরুদ্ধে আরো বেশী ঘৃণা ও ক্ষোভের জন্ম নেয় এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলন আরো জঙ্গীরূপ লাভ করে।

জেনারেল এরশাদ আবার টেলিভিশন পর্দায় উদয় হন। তিনি বিভিন্ন জেলায় মন্দির পরিদর্শন ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে দেখা করে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে 'খয়রাত' দিতে থাকেন। তাঁর 'সর্প হয়ে দংশন করে, ওঝা হয়ে ঝারার' এই চাতুরী ইতোমধ্যেই জনগণের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল।

ঢাকার ইংরেজী সাপ্তাহিক 'সানডে এক্সপ্রেস' ৪ নভেম্বর সংখ্যায় মাওলানা মান্নানের একটি ছবি (যা ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলায় ছেপে সংবাদ করেছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী 'এই নরপিশাচকে ধরিয়ে দিন') ছেপে শিরোনাম করে, 'ই Muslim-or -ট Munafiq?'[৪৩]

জেলায় জেলায় ছাত্রনেতাদের গণসংযোগ

২ নভেম্বর (১৯৯০) কুষ্টিয়ায় পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সভায় অবৈধ ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ার চির অবসানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ও তার সহযোগী মন্ত্রীসহ দালালদের প্রকাশ্যে বিচার করা হবে বলে ঘোষণা করেন।

ছাত্রলীগ (হা–অ) নেতা নারায়ণ চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা অসীম কুমার উকিল, নূর আহমেদ বকুল, আবদুল্লা হিল কাইয়ুম, অহিদুজ্জামান চান, সাজ্জাদ জহির চন্দন প্রমুখ।

সমাবেশে কুষ্টিয়ার কারাগারে আটক স্থানীয় ৫ ছাত্রনেতা আলী আহমেদ টুটুল, জগলুল হায়দার, স্বপন ঘোষ, জামিরুল ইমাম ওলি ও বদরুদ্দিন বদুর নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করা হয়।

নোয়াখালীতে এই দিন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সভায় যোগদান করেন ছাত্রনেতা আমানুল্লাহ আমান, হাবিবুর রহমান হাবিব, রাফেকুজ্জামান রতন, মোখলেছুর রহমান, ইয়াসিন আলপনা, মাহবুব আলমগীর আলো, আকতার হোসেন প্রমুখ। স্থানীয় ছাত্রনেতা শাহীন মাহমুদ পারভেজ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ছাত্রনেতারা আন্দোলন বানচালের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের আহ্বান জানান।

একই দিন বগুড়া জেলা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ছাত্রনেতা তুহীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ছাত্রঐক্য নেতা ফজলুল হক মিলন, সফি আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, কাদের সরকার, এস. এম. সোলায়মান, আবদুস সাত্তার খান, রাগিব আহসান মুন্না, রেজাউল করিম, সুজাউদ্দিনজাফর, সুশান্ত মিত্র, মহসিন আল আব্বাস, স্থানীয় ছাত্র নেতা আমিনুল করিম, আলী আজগর হেনা, শাহাদত আলম ঝুনু, জাহিদ হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

৩ নভেম্বর যশোর টাউন হল ময়দানে এক বিশাল ছাত্র জনসভায় ঢাকা থেকে আগত কেন্দ্রীয় ছাত্রঐক্য নেতারা ঘোষণা করেন, বর্তমান আন্দোলনের মীর জাফরদের তালিকা তৈরী করা হবে। ছাত্রমৈত্রীর জেলা সভাপতি মাহমুদ হাসান বুলুর সভাপতিত্বে এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন, ছাত্রনেতা অসীম কুমার উকিল, নাজিমউদ্দীন আলম, রাকসু নেতা রুহুল কুদ্দুস বাবু, আবদুল্লাহ হিল কাফি রতন, মোস্তফা কামাল, মামুনুর রশিদ, কামরুল ইসলাম প্রমুখ।

৩ নভেম্বর (১৯৯০) সাত দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় ট্রেনযোগে পথে পথে শতাধিক পথসভায় ভাষণ দেন। যে ট্রেন রাত ৯ টায় চট্টগ্রাম পৌছার কথা ছিল, তা পৌছে পরদিন ভোরে। বিভিন্ন স্থানে রাত জেগে সংগ্রামী জনতা একবার দলনেত্রীর কণ্ঠ শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

দু'দিন পর সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ট্রেন বিলম্বের কারণে দুঃখ প্রকাশ করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। এতে বলা হয়, একজন নেত্রীর কান্ডজ্ঞানহীন আচরণই শত শত ট্রেনযাত্রীর দুর্ভোগের জন্যে দায়ী।

৩ নভেম্বর (১৯৯০) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নাম করে সরকার আন্দোলন দমনের জন্যে রাজধানীসহ আরো বেশ কয়েকটি শহরে কারফিউ ও ১৪৪ ধারা জারী করে। এই পুলিশী ব্যবস্থা ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। কিন্তু আন্দোলনকামী ছাত্র-জনতা তা তুচ্ছ করে কারফিউ ভঙ্গ করে সরকারকে হতবাক করে দেয়। রাজধানীতে সভা-মিছিল নিষিদ্ধ থাকলেও সভা-মিছিল চলতেই থাকে।

৪ নভেম্বর কারফিউ এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই খোদ রাজধানী কেন্দ্রবিন্দু গুলিস্তান মোড়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য মিছিল করে। শত শত ছাত্র এই মিছিলে যোগ দিয়ে স্বৈরাচার ও মৌলবাদের ধ্বংস কামনা করে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে মিছিল প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। পুলিশের লাঠির আঘাতে ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, সাইফুদ্দিন মনি, মানিক চৌধুরী, হাবিবুর রহমান হাবিব, মশিউর রহমান, বিংকু সহ ১৫ জন ছাত্রনেতা আহত হন।

ছাত্ররা এই দমননীতির মাঝেও গোলাপ শাহের মাজারের কাছে একটি সমাবেশ করে এরশাদের পতন কামনা করে।

৫ নভেম্বর (১৯৯০) আদমজীনগরে ছাত্র শ্রমিক সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এক বিশাল জনসভায় শ্রমিক নেতা রেহানউদ্দীনের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন ডাকসু নেতা আমানউল্লাহ আমান, হাবিবুর রহমান হাবিব, মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, খায়রুল কবির খোকন, সুশান্ত মিত্র, আবদুস সাত্তার খান, সাইফুদ্দিন মনি, বেলাল চৌধুরী প্রমুখ।

ছাত্রনেতারা আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, বন্ধুদের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে ঐক্য গড়েছি। এরশাদকে বিদায় না করে ঘরে ফিরব না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার তালা দিয়েছে, সচিবালয়ে তালা লাগানো হবে।

৬ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ডাকে সারাদেশে উপজেলা পরিষদের সামনে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

৫ নভেম্বর ৮ দল, ৭ দল, ৫ দল, জামায়াতে ইসলামী, ৬ দল প্রমুখ জোট ও গোষ্ঠী রামপুরা টেলিভিশন কেন্দ্র ঘেরাও করে রাখে। একটানা মিথ্যা খবর ও 'সাহেব-

বিবি-গোলামের' প্রচার কেন্দ্র হওয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো সারাদিন টেলিভিশন কেন্দ্র ঘেরাও করে রাখে।

'বিরোধী আন্দোলন শীতকালীন মেলা'

বাংলাদেশের ইতিহাসে বিদেশী সাহায্য দাতারা যখন প্রথমবারের মতো সহায়তার মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন বৈঠকে বাংলাদেশের সোনারগাঁও হোটেলে ৬ নভেম্বর সরকারের মুখোমুখি তখন হোটেলের পাশে পান্থপথে আটদলের উদ্যোগে এক বিশাল জনসভায় শেখ হাসিনা এরশাদ সরকারকে সাহায্য বন্ধ করার জন্যে সাহায্য দাতা গোষ্ঠীগুলিকে অনুরোধ করেন।

৮দল নেত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশ মাত্র ৬৭ কোটি ডলার সাহায্য পেয়েছিল। তখন বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৭ ভাগ। জিয়াউর রহমানের সময় বাংলাদেশ ৪ শত কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য পায়। তখন বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশ নেমে আসে। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ ১ হাজার ২ শত কোটি ডলার সাহায্য পেয়েছে। অথচ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১.৯ শতাংশ নেমে এসেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, অস্ত্রের জোরে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ফলে জনগণ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। সম্পদ লুটপাট ও আখের গোছানো তাদের কাজ। এই জন্যে কোটি কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় নি।

হাজার হাজার জনতার ঢল নামে পান্থপথের ৮ দলের জনসভায়। শেখ হাসিনা বলেন, এদেশে সামরিকতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র কোনোটাই চলতে দেয়া হবে না।

এদিন ৮ দল নেত্রী সরকারের পদত্যাগের সাংবিধানিক পথও বাতলে দেন। তিনি বলেন, সংবিধানের ৫৫ ধারায় উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ এবং ৫১ ধারায় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিধান আছে। কোনো প্রকার সাংবিধানিক বাধা নেই এরশাদ সরকারের পদত্যাগের।

৮ দল নেতা সাইফউদ্দিন মানিক, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, সাজেদা চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখও এই সভায় ভাষণ দেন।

৭ দলেরও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সোনারগাঁও হোটেলের অদূরে বাংলা মটরের কাছে। ৭ দল নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এখানে বলেন, গত ৮ বছরে বিদেশী সাহায্য লুটপাট হয়েছে। দেশের উন্নয়ন কিছুই হয়নি। জনগণ এই সাহায্যের দায় বহন করবে না বলে তিনি সাহায্য দাতাদের জানিয়ে দেন।

তিনি বলেন, সরকারের সাথে আলোচনায় বসতে রাজী আছি যদি তারা পদত্যাগের ঘোষণা দেন। আলোচনা হবে স্বৈরাচারের বিদায়ের পদ্ধতি নিয়ে।

সাতদল নেতা শামসুল আরেফিন খান জানান, এ দেশে একটি শিশু জন্ম নেয় হাজার ১৫ টাকা ঋণ নিয়ে।

৭ নভেম্বর (১৯৯০) জেনারেল এরশাদ বিরোধী দলের এইসব সমাবেশকে ব্যঙ্গ করে নোয়াখালীর জয়াগ গ্রামের গান্ধী আশ্রমে এক জনসভায় বলেন, জনগণ ঢাকার রাজপথে 'রাজনৈতিক প্রহসন' উপভোগ করছে। তিনি বলেন, ঢাকায় বিরোধী দল যা করছে তা বার্ষিক 'শীতকালীন মেলা' অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়। এরশাদ বলেন, সচিবালয়, রেডিও, টিভি ঘেরাও করার পর বিরোধী দল এখন আশেপাশের হোটেলগুলোও ঘেরাও করতে শুরু করেছে।

জেনারেল এরশাদ এই সময় অত্যন্ত দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেন, আমার সঙ্গেই সংলাপে বসতে হবে এবং আমি ক্ষমতায় থাকাকালীনই তা করতে হবে, পদত্যাগ করার পর নয়।

রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঘেরাও

৮ নভেম্বর (১৯৯০) ছাত্ররা এক দুঃসাহসিক অভিযান চালায়। এদিন রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার ছাত্রের এক মিছিল পান্থপথে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হয়। পুলিশ ও বি. ডি. আর ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করলে পান্থপথ এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এদিন প্রায় ৫০ টির মতো গাড়ী ভাঙচুর করা হয়। ছাত্রদের একটি দল ফেরার পথে গ্রীন রোডে অবস্থিত তথ্যমন্ত্রী ড. মীজানূর রহমান শেলীর বাসভবনে অবস্থিত দু'টি গাড়ীও ভাঙচুর করে। ছাত্রদের একটি দল বেলা সোয়া ২ টা পর্যন্ত পান্থপথ মোড়ে অবস্থান ধর্মঘট করতে থাকে।

ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান হাবিব এই সময় সমাবেশে বলেন, এই সরকারকে এবারের বিজয় দিবসই পালন করতে দেওয়া হবে না।

সম্প্রতি জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও উপপ্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছিলেন, বিরোধী দল সারাদেশে যেভাবে জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর করছে, জাতীয় পার্টি ইচ্ছা করলে বিরোধীদলের সাইনবোর্ডও ভাঙচুর করতে পারে। ছাত্র নেতা নাজমুল হক প্রধান, শাহ মোয়াজ্জেমের এই বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, তিনি যেন পারলে বিরোধী দলের সাইন বোর্ড ভাঙার সাহস দেখান।

ছাত্র–শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিল

ঢাক বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ৮ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার ব্যাপারে এক মত হতে ব্যর্থ হয়। সরকার এক মাসের জন্যে গত ১৩ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন, সেই অনুযায়ী ১২ নভেম্বর আপনা–আপনিই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে যাওয়ার কথা। উপাচার্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়ার সভাপতিত্বে সিন্ডিকেট ১২ নভেম্বরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সরকারী আদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের নিদর্শনের জন্যে একদিন আগেই ১১ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিতে চান। ৯ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যও ১১ নভেম্বর (১৯৯০) থেকে ক্লাশে যোগদান করতে ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এদিন একটি দীর্ঘ কর্মসূচীও ঘোষণা করে। এর মধ্যে:

১১ নভেম্বর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাশে যোগদান
১২ নভেম্বর: কাল ব্যাজ পরিধান
১৩ নভেম্বর: ছাত্র শ্রমিক সংহতি সমাবেশ, তেজগাঁও
১৪ নভেম্বর: জেলা–উপজেলায় কাল পতাকা উত্তোলন
১৫ নভেম্বর: ছাত্র শ্রমিক সংহতি সমাবেশ, টঙ্গি
১৬ নভেম্বর: ছাত্র কৃষক সংহতি সমাবেশ, নরসিংদী
১৭ নভেম্বর: গণদুশমন প্রতিরোধ দিবস, ঢাকায় মন্ত্রিপাড়া ঘেরাও, সারাদেশে ভোটডাকাত সংসদ সদস্য ও দালাল রাজনীতিক ঘেরাও
১৮ নভেম্বর: ছাত্র শ্রমিক সংহতি ও অবরোধ

এরশাদ সরকার ছিল এই সময় একেবারেই দিশেহারা। বিরোধী দলের আন্দোলন বানচাল করার জন্যে হটাৎ করেই পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। সরকার ভেবেছিল, মানুষের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি কাজে লাগিয়ে, ভারত বিরোধী জিগির তুলে রাজনীতির হাওয়াকে কাজে লাগাবেন। কিন্তু সরকার ধরা পড়ে যান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগেনি, সরকারের ভাড়া করা গুন্ডারা উস্কানী দিয়েছে সব যায়গায়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় হটাৎ করে বন্ধ করে দেন। ভেবেছিলেন ছাত্ররা বাড়ী চলে গেলে আন্দোলন থেমে যাবে। ৯ নভেম্বর হটাৎ করে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করে দেন। সরকার ভেবেছিল, ফল জানার জন্যে পরীক্ষার্থীরা হরতাল ভেঙে ফল জানতে আসবে। কিন্তু সবগুলো পদক্ষেপই হিতে বিপরীত হয়ে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরো জমাট বাঁধতে থাকে।

১০ নভেম্বর সারাদেশে সফল হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে সংস্কৃতি কর্মীরা নূর হোসেন চত্বরে আবৃত্তি ও গণসঙ্গীত পরিবেশন করে আন্দোলনকামী মানুষকে উজ্জীবিত করে।

হরতাল শেষে সাত দলের জনসভায় বেগম জিয়া বলেন, সরকার আর নেই, তার আদেশ–অধ্যাদেশ মানার কোনো প্রয়োজন নেই। নেত্রী উপস্থিত জনতাকে বলেন, তিনি পুলিশের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন। পুলিশের উদ্দেশ্যে বেগম খালেদা জিয়া এই সময় বলেন, আন্দোলনের সাথে মিশে যান, মিছিলে বাধা দেবেন না।

আটদলের সভায় এদিন নেত্রী শেখ হাসিনা সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নভেম্বর মাসের মধ্যেই সকল পরীক্ষা সমাপ্ত করে ফেলার নির্দেশ দেন।

কমিউনিস্ট পার্টির সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক বলেন, আঘাতের পর আঘাত করে এবারই সব ফয়সালা করে ফেলতে হবে।

৫দল নেতা রাশেদ খান মেনন, এরশাদকে চূড়ান্ত ধাক্কা দেওয়ার জন্যে ছাত্র–জনতার প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

এ দিনের সমাবেশ থেকে তিন জোট ২০ ও ২১ নভেম্বর (১৯৯০) ৪৮ ঘন্টা পুনরায় হরতালের ডাক দেয়।

হরতালের দিন সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই এরশাদ সরকারের পতন ঘটানো হবে

বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। ছাত্রনেতা আমান, হাবিব, বাবুল, কামাল, মনি প্রমুখ এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে ১১ নভেম্বর ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়। এতে জেনারেল এরশাদের সরকারের একটা বড় ধরণের প্রশাসনিক ও নৈতিক পরাজয় ঘটে। ক্যাম্পাস এই সময় খন্ড মিছিল ও আনন্দ উল্লাসে মুখর হয়ে উঠে। শিক্ষকরা 'গণক্লাশ' নেন এবং ছাত্রনেতাদের সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশ নেয়।

কলাভবনে সকাল ৮ টায় এদিন প্রথম ক্লাশটি নেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। তিনি ছাত্রদের কাছে ' রবীন্দ্রনাথ ও গণতন্ত্র' বিষয়ে পাঠ দেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ক্লাশে 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনী' শীর্ষক ক্লাশ নেন ডঃ হারুনুর রশীদ। সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ড. রঙ্গলাল সেন 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশঃ ১৯৭৩' এর উপর ছাত্রদের জ্ঞান দান করেন।

ছাত্র-শিক্ষকরা এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলে সিন্ডিকেট আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে।

১৩ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্র ধরে ছাত্র ও শিক্ষকরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলে দেন।

১৪ নভেম্বর সারাদেশে জেলা-উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচী পালন কালে ঢাকায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা কালো পতাকা উড়িয়ে দেয়। এই সময় কালো পতাকা স্থাপনে পুলিশ বাধা দিলে ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে পুলিশের প্রতি আঙুল উঁচিয়ে বলেন, এই সরকারের প্রতি প্রতিবাদ জানানোর জন্যে আমরা এখানে কালো পতাকা রেখে গেলাম।

মন্ত্রিপাড়া ঘেরাও: 'লাশ হয়ে ফিরে যাবে'

১৪ নভেম্বর (১৯৯০) জাতীয় পার্টিও বহুদিন পর মতিঝিল আল্লাওয়ালা ভবন প্রাঙ্গনে এক সমাবেশ ডাকে। এখানে মহাসচিব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ' আর

যদি ৫টি বছর প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতায় থাকতে পারেন, বাংলাদেশকে তিনি সত্যিকার সোনার বাংলা বানিয়ে ছাড়বেন ইনশাআল্লাহ'।

শাহ মোয়াজ্জেম বিরোধী দলের গত কয়েকদিনের আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসী কার্যক্রম' আখ্যা দিয়ে বলেন, এর ফলে ১০০ কোটি টাকারও বেশী সম্পদ এরই মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। আগামী ১৭ নভেম্বর মন্ত্রিপাড়া ঘেরাও করার যে কর্মসূচী ছাত্ররা নিয়েছে, তার উল্লেখ করে শাহ সাহেব বলেন, আমাদের বাড়ী আক্রমণ করা এতো সহজ না। তারিখটা একটু খেয়াল করুন। ১৯৭৪ সালের মার্চের ১৭ তারিখে একজন মন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাও হয়েছিল। ঐদিন ৫০ জন লাশ হয়ে ফিরেছিল।

রাজনেতিক সভায় অশ্লীল শব্দ ব্যবহারে পটু শাহ মোয়াজ্জেম দু'নেত্রীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে ব্যঙ্গ করে বলেন, দুই মেয়েলোক মিলিত হলে কি হয়? কিছুই হয় না। দুইজন মেয়েলোকের মিলনে কোনো উৎপাদন সম্ভব নয়।

ঢাকার গদিনসীন মনোনীত মেয়র নাজিউর রহমান বিরোধী দলকে হুমকি দিয়ে বলেন, ঢাকার ৬০ লাখ লোক আপনাদের আগুনে পুড়িয়ে মারবে।

অল্প কয়েকদিন আগেও 'এরশাদের গদীতে–আগুন জ্বালো একসাথে' শ্লোগানধারী আবুল হাসনাত এরশাদের মন্ত্রিসভায় যোগদান করে এদিন এই জনসভায় খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি চট্টগ্রামে বলেছেন, ক্ষমতায় যাওয়া আপনার উদ্দেশ্য নয়, আপনাকে ক্ষমতায় আসতে হবে না। রাজপথে আন্দোলন করতে থাকুন।

উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদও এদিন গরম গরম বক্তৃতা দেন। কাজী জাফর আহমেদ বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে বলেন, ১৭ নভেম্বর আমরা সচিবালয়ে থাকব। দোহাই আমাদের বাসভবনে স্ত্রী–পরিজনদের ঘেরাও করবেন না।

এদিন আল্লাওয়ালা ভবনে জেনারেল এরশাদের চাকুরীজীবী মন্ত্রীরা যেভাবে বক্তৃতা করেন তাতেই বোঝা যায়, তাদের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। উত্তেজিত, অসংলগ্ন, অশ্লীল বাক্য চয়ন করে সরকারী নেতারা বিরোধী দলকে এদিন গালিগালাজ করেন।

এরশাদের, প্রতি প্রশ্ন: কোন সংবিধান বলে ক্ষমতায় এসেছিলেন?

৭ দল নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৫ নভেম্বর সরকারের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রশ্নে পাল্টা প্রশ্ন করেন, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা নিয়েছিলেন কোন

সংবিধান বলে? কোন সংবিধানে লেখা আছে একজন চাকুরীজীবী ক্ষমতা গ্রহণ করবে? যে ব্যক্তি কোনো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি তাকে সংবিধানের মাধ্যমে নয়, আন্দোলনের মাধ্যমেই যেতে হবে।

১৪ নভেম্বর (১৯৯০) আদমজীতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৫ জন নিহত হয় এবং শতাধিক আহত হয়। জাতীয় পার্টির সমাবেশ উপলক্ষে সরকারী শ্রমিক নেতা সিদ্দিক সরদার শ্রমিকদের নিয়ে ঢাকা আসতে চাইলে অন্য শ্রমিকরা এতে বাধা দেয়। এই সময় উভয় পক্ষ গোলাগুলী করলে ৫ জন নিহত হয়। ৫০০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

১৫ নভেম্বর এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজশাহী শহরে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য জাতীয় পার্টির কার্যালয় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

আদমজীর ঘটনার প্রতিবাদে ১৫ নভেম্বর ৮ দলের প্রতিবাদ সভায় শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের পথে সাংবিধানিক বাধা প্রশ্নের উত্তরে বলেন, যারা সংবিধান, সংবিধান বলে চেঁচান, তারা ৭৫-এর হত্যাকান্ডের পর সংবিধানের কোন্ অনুচ্ছেদ বলে ক্ষমতায় এসেছিলেন? ৮২ সালে কিভাবে এসেছিলেন? সামরিক আইনের কথা সংবিধানের কোথায় আছে?

৮ দল নেতা আবদুর রাজ্জাক বলেন, এ সরকার ৮ বছরে ১৩২ জনকে হত্যা করেছে। রক্তের দাগ এরশাদের হাতে রয়েছে।

এরশাদ এই সময় এক জনসভায় নিজের হাতের তালু দেখিয়ে বলেছিলেন, তাঁর হাতে রক্তের দাগ নেই।

শিক্ষক মোর্চা গঠন

দেশের তেরটি শিক্ষক সংগঠন ১৬ নভেম্বর 'সম্মিলিত শিক্ষক আন্দোলন' নামে একটি মোর্চা গঠন করে। নতুন এই শিক্ষক মোর্চা আগামী ২৮ নভেম্বর দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি ও কাল ব্যাজ ধারণের কর্মসূচী নেয়।

যেসব শিক্ষক সংগঠন এই ঐক্য মোর্চায় শামিল হয়, তার মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান), সহকারী শিক্ষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, জাতীয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (নজরুল ইসলাম), বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (ফজলুর রহমান), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ প্রভৃতি।

অভির মুক্তি লাভ এবং শঙ্কা

১৭ নভেম্বর (১৯৯০) সরকার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা, অস্ত্রধারী গোলাম ফারুক অভিকে মুক্তি দেয়। তার মুক্তিদানের খবরে ছাত্র আন্দোলন একটি অনিশ্চিত অবস্থানে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ছাত্রনেতারা বুঝতে পারেন, সরকার ছাত্র আন্দোলনে নৈরাজ্য ও আবার সন্ত্রাস বৃদ্ধি করার জন্যেই অভিকে মুক্তি দিচ্ছে। সানাউল হক নীরু বাইরেই ছিল। এই দুই রত্ন যোগে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে বলে এই সময় ছাত্রনেতারা শঙ্কা করতে থাকেন।

যুব মোর্চা গঠন

এদিন দেশের ৮ টি যুব সংগঠন 'যুব সংগ্রাম পরিষদ' নামে নতুন মোর্চায় আত্মপ্রকাশ করে। ১৭ নভেম্বর (১৯৯০) যুব সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বদলীয় যুব সমাবেশের ডাক দেয়। এতে ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

যুব সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ শুরু করে ২৫ অক্টোবর থেকে। বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগ, জাতীয়তাবাদী যুবদল, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, জাতীয় যুব লীগ, বাংলাদেশ যুব মৈত্রী, বাংলাদেশ যুব ঐক্য, যুব ঐক্য সমিতি, জাতীয় যুব ঐক্য প্রভৃতি সংগঠন যুব মোর্চায় অন্তর্ভূক্ত হয়।

যুব নেতা মোস্তফা মহসীন মন্টু, ফুলু সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর রায়, মাহাবুব জামান, মুহম্মদ হিলালউদ্দীন, নূরুল ফজল বুলবুল, মজিবুর রহমান চৌধুরী, ফজলে হোসেন বাদশা, অনীল চন্দ্র মরণ, পীযুশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফারুক রতন, পরিমল গুহ, রুহুল আমিন, আলতাফ আলী হাসু ও আইয়ুব খান এক যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।

গণদুশমন ঘেরাও এবং পাল্টা গুন্ডা সমাবেশ

১৭ নভেম্বর (১৯৯০) ছিল সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মন্ত্রিপাড়ায় গণদুশমন ঘেরাও কর্মসূচী। জাতীয় পার্টিও তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। ঢাকা শহরের বেইলী স্কোয়ারের মন্ত্রিপাড়ার চারদিক দিয়ে ৯ পয়েন্টে তারা মঞ্চ গড়ে 'গুন্ডা সমাবেশ' করে। প্রত্যেক মন্ত্রীর বাড়ীতে পূর্ব দিন রাতেই 'গুন্ডা বাহিনী' এনে রাখা হয়।

তাদের লালন-পালনের জন্যে মন্ত্রীরা টেলিফোনে যার যার এলাকার ব্যবসায়ীদের ডেকে এনে চাঁদা তোলে।

মন্ত্রিপাড়ার বিভিন্ন মন্ত্রীর বাসভবনগুলি পূর্বরাত থেকেই সশস্ত্র লোক দ্বারা পূর্ণ করে তোলা হয়। ছাত্ররা এই সংবাদ পাওয়ার পরও তাদের কর্মসূচী ব্যাপারে অটল থাকে। মোট ৯টি পয়েন্ট থেকে ছাত্ররা 'গণদুশমন ঘেরাও' কর্মসূচীর হিসেবে মন্ত্রীদের বাড়ীগুলি বিক্ষোভের কেন্দ্রে পরিণত করে।

শাহবাগের মোড়ে হোটেল শেরাটনের সামনে 'মন্ত্রিপাড়া রক্ষা মঞ্চ' করে অস্ত্র হাতে পাহাড়া দেয় ব্যাংক কর্মচারীদের দালাল নেতা জামালউদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ছাত্র মিছিল এই মঞ্চ আক্রমণ করলে সশস্ত্র দালাল জামালউদ্দিন পলায়ন করে প্রাণ বাঁচায়।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনেও একটি অনুরূপ মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল যাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র মিছিল এদিক না আসতে পারে। এই মঞ্চ পাহাড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় জগন্নাথ কলেজের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী লোটন-ঝোটন ভাতৃদ্বয়কে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ছাত্র মিছিল আসলে এরা প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে ছাত্রদের উপর গুলী চালায়।

কাকরাইল মসজিদের কাছে একটি মঞ্চ তৈরী করে এটি রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন দালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে। তিনি প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফরকে নিয়ে এখানে সভা করেন। জগন্নাথ কলেজ থেকে লোটন-ঝোটন বাহিনী এখানে এসে জমায়েত হয় এবং নিজেরাই বিভিন্ন অপকর্ম করতে থাকে।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে জাতীয় পার্টি'র মাস্তানদের হামলা এবং পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্ররা ২০ নভেম্বর হরতাল পালনের ডাক দেয়। হরতাল চলাকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে ছাত্র নেতারা বলেন, এরশাদের বিরুদ্ধে জনতা যেভাবে জেগে উঠেছে, তাতে এরশাদ সরকারের পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ছাত্ররা সমাবেশে বলে, দালাল মন্ত্রী, এম.পিদের যে যেখানে পাবেন উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেবেন।

১৮ নভেম্বর (১৯৯০) জেনারেল এরশাদ, বিরোধী দলগুলি তাঁকে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী বলায়, তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী সকল সরকারকে অবৈধ বলে মন্তব্য

করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শুরুই হয়েছিল অবৈধ সরকার দিয়ে। জেনারেল বলেন, আমার সরকারই প্রথম বৈধ সরকার।

রাজনৈতিক মহলে তা নিয়ে হাসির আসর বসে। জেনারেল এরশাদ বন্দুক কাঁধে নিয়ে একটি নির্বাচিত সরকার প্রধান বিচারপতি সাত্তারকে উৎখাত করেন। আর তিনিই দাবী করেন, তিনিই প্রথম বৈধ সরকার। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধ, ৭২ সালের সংবিধান ইত্যাদিকেও তিনি যথেচ্ছভাবে কটাক্ষ করে বেড়াচ্ছিলেন। আটদল, সাতদল, পাঁচদল, ছয়দল সকল কেন্দ্র থেকেই তাঁর মন্তব্যকে ক্ষমার অযোগ্য ঘোষণা করে বিবৃতি দেওয়া হয়।

২০ নভেম্বর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবনে। সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন অফিসার কর্নেল রসিদ এদিন বেগম জিয়ার বাসভবনে চড়াও হয় এবং 'হরতালের পাশ' চায়। এদিন ঢাকা শহরে পূর্ণদমে হরতাল চলছিল। কর্নেল মহোদয় বেগম জিয়াকে না পেয়ে তার পুত্র তারেক রহমানকে বেদম প্রহার করে।

ঘটনাটি কে সাজিয়েছে এবং কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল তা আজো রহস্যময় হয়ে আছে। সরকার এক প্রেসনোটে কর্নেল রসিদকে বিকৃত মানসিকতার অসুস্থ লোক বলে ঘাষণা করে এবং তাকে গ্রেফতার করে।

কিন্তু জনমনে এই নিয়ে বড় ধরণের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশে এই বিকৃত ঘটনার প্রতিবাদ করা হয়।

২০ নভেম্বর সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এই হরতালের মাধ্যমে ছাত্র জনতার আন্দোলন গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ে।

আমলাদের উপর হামলা

২০ নভেম্বর হরতালের সময় যেসব কর্মকর্তা কাজে যোগদান করেছিল তাদের বাড়ী ফেরার সময় ছাত্র-জনতা মারধর করে। তথ্যসচিব সৈয়দ আহমেদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হাবিবুর রহমান সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সচিব, যুগ্ম সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের ছাত্র-জনতা লাঞ্ছিত করে। কারো কারো শার্ট-প্যান্ট ছিঁড়ে ফেলে অথবা খুলে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ করা হয়। এই খবর সচিবালয়ে পৌছলে মন্ত্রীদের চোখে মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মন্ত্রীরা এই সময়

সামনে-পেছনে পুলিশ নিয়ে গাড়ীতে চালাচল করলেও ২০ নভেম্বর অনেক রাতে তাঁরা সচিবালয় থেকে তাঁদের বাসভবনে ফেরেন।

এই ঘটনা সম্পর্কে বি.সি.এস (প্রশাসন) সমিতি তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলে, গত সাড়ে ৮ বছর ধরে এক শ্রেণীর আমলার সরকারের সাথে বিশেষ সহযোগিতার কারণেই জনগণ গোটা আমলাতন্ত্রকে সরকার সমর্থক হিসেবে সন্দেহের চোখে দেখছে।

সচিবালয়ে 'লিফলেট'

২১ নভেম্বর (১৯৯০) থেকে সচিবালয় আন্দোলন মুখর হয়ে ওঠে। এদিন বিভিন্ন বেনামী 'লিফলেট' সচিবালয়ের বিভিন্ন ভবনের ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে সরকার বিরোধী আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা ঘোষণা করে। প্রধানভাবে সিভিল সার্ভিসের তরুণ অফিসাররা এই সাহসী পূর্ণ কাজে এগিয়ে আসে।

তিন জোটের যৌথ ঘোষণা

২০ নভেম্বর সরকার বিরোধী তিন জোটের যৌথ যুক্ত ঘোষণা প্রণয়ন সম্ভব হয় এবং তা আন্দোলকামী জনগণের জন্যে প্রকাশ করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়ঃ
'বর্তমান সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনেই তিন জোট অংশ গ্রহণ করবে না। একমাত্র একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই তিনজোট শুধু সার্বভৌম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।

এতে অন্তবর্তীকালীন সরকারের অভিন্ন রূপরেখাও ঘোষণা করা হয়। এই রূপরেখা অনুযায়ী অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

তিন জোটের ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখার প্রধান দিক হচ্ছে সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে তিন জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপরাষ্টপতি হিসাবে নিয়োগ। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করে প্রেসিডেন্টের পদতাগ এবং উক্ত উপরাষ্টপতি নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় নিরপেক্ষ হবেন। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন না।

তিনি প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট বা সংসদ সদস্য পদের জন্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। তার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন মন্ত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না।

ঘোষণায় বলা হয়: সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তথা সংবধিানের ৫১ অনুচ্ছেদের (ক) তিন ধারা এবং ৫৫ অনুচ্ছেদের (ক) এক ধারা এবং ৫১ অনুচ্ছেদের তিন নম্বর ধারা অনুসারে আন্দোলনরত তিন জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োগ করতে হবে।

একই সময়ে অনুষ্ঠিত আটদল, সাতদল ও পাঁচদলের পৃথক সমাবেশ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই রূপরেখা ঘোষণা করা হয়। আটদলের সমাবেশে ন্যাপ নেতা কামাল হায়দার, সাতদলের সমাবেশে বিএনপি নেতা কর্ণেল (অবঃ) অলী আহমদ এবং পাঁচ দলীয় জোটের সমাবেশে জাসদ (ইনু) নেতা শরীফ নুরুল আম্বিয়া রূপরেখা সম্পর্কে যুক্ত ঘোষণা পাঠ করে শোনান।

জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের রূপরেখা সম্পর্কে অনুরূপ পৃথক ঘোষণা দেয়া হয়।

যুক্ত ঘোষণায় বলা হয়: অন্তবর্তীকালীন সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করবেন। ভোটাররা যাতে নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনতভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই আস্থা পুন: স্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ঘোষণায় বলা হয়: প্রচার মাধ্যমকে পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও-টিভিসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক দলের প্রচার-প্রচারণার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘোষণায় আরও বলা হয়: অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের কাছে অন্তর্বতীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এই সংসদের কাছে সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। দেশে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে। অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায়

ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা রোধ করা হবে। নির্বাচন ছাড়া অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোন পন্থায় ও কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না। জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে। মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে।

আটদল, সাতদল ও পাঁচদলীয় জোট যুক্ত ঘোষণায় বলেছেঃ বর্তমান সরকারের পদত্যাগের দাবীতে, একটি স্থায়ী গণতান্ত্রিক ধারা ও জীবন পদ্ধতি কায়েম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুণঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চলমান গণআন্দোলনে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘোষণায় বলা হয়, দেশবাসী যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তার অন্যতম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা বদলের পরিবর্তে সাংবিধানিক পন্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল ও হস্তান্তর নিশ্চিত করা।
তিনি জোটের সংগ্রামের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে, একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা করা।

ঘোষণায় অভিযোগ করা হয় যে, এ সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।

জাতীয় পার্টির সমাবেশ বানচাল

সরকারী বিরোধী আন্দোলনের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে জাতীয় পার্টি ২৬ নভেম্বর (১৯৯০) ঢাকায় এক মহাসমাবেশের আয়োজন করে। কিন্তু ছাত্ররা এদিন ঢাকায় হরতালের ডাক দেয়। ভয়ে জাতীয় পার্টি কর্মসূচী ২৬ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর এগিয়ে আনার কথা ঘোষণা করে। ছাত্ররা ২১ নভেম্বর ঘোষণা করে, জাতীয় পার্টি যেদিন সমাবেশ করবে, সেদিনই সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবে।

জেনারেল এরশাদ এই মহাসমাবেশে ভাষণ দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এই সমাবেশে নির্দেশ দিয়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপয়ান্তর না দেখে জাতীয় পার্টি ও সরকার তাদের কর্মসূচী বাতিল করে।

২১ নভেম্বর (১৯৯০) সশস্ত্র বাহিনী দিবসে বিরোধী দলের ডাক দেওয়া হরতাল পূর্বেই সশস্ত্র বাহিনীর অনুরোধে বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু এদিন তিন জোটের

বড় বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের ঢাকা সমাবেশ থেকে ১০,১১,১২ ডিসেম্বর লাগাতার ৭২ ঘন্টার হরতাল কর্মসূচী ঘোষণা করা হলে রাজনৈতিক আন্দোলন তার চূড়ান্ত গতিপথের দিকে মোড় নেয়।

এই সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে 'কাকের ময়ুর পুচ্ছধারীরা' বিভিন্ন কর্মসূচী দিয়ে আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হতে শুরু করে। মুসলিম লীগ কাজী কাদের গ্রুপ এদিন ২৫,২৬ ও ২৭ নভেম্বর দেশব্যাপী পূর্ণ হরতালের ডাক দিয়ে হাসির খোরাকের পাত্রে পরিণত হয়।

২২ নভেম্বর তিন জোট, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, যুব সংগ্রাম পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন একত্রে বসে সরকারের সম্ভাব্য পতন ও গণঅভ্যুত্থানের সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বৃহত্তর ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুতি নেয়।

নীরু—অভি বাহিনীর অভিযান: সরকারের মুখোশ উন্মোচন

অভির মুক্তির পর নীরু ও অভি-বাহিনী পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে লেবানন নগরীতে পরিণত করে। গোলাগুলি ও বোমাবাজিতে প্রতিদিন ক্যাম্পাস আবার প্রকম্পিত হতে থাকে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য তাদের সরকারের এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ঐক্য অটুট রাখার স্বার্থে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বি.এনপি-কে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানিয়ে চিঠি দেয়।

ছাত্রনেতারা আশঙ্কা করছিলেন, ছাত্রদলের এই দুই খুনী মাস্তান আন্দোলনে 'সাবোটাজ' করতে পারে, যাতে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে জনগণের মনে ঘৃণা জন্ম নিতে পারে। অতীতে ছাত্র রাজনীতির নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অপকর্ম সাধিত হয়েছে যার দায় বহন করতে হয়েছে, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলোকেই। সরকার বিরোধী আন্দোলনে আসন্ন বিজয়ের মুহূর্তে ছাত্রনেতারা তাই ছাত্রদলকে তাদের ঘর পরিষ্কারের পরামর্শ দেয়।

অবশেষে খালেদা জিয়ার বোধদয়: নীরু—অভি বহিষ্কার

দীর্ঘদিন পর বি. এন.পি নেত্রী খালেদা জিয়া ও ছাত্রদল একটি সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হয়। ২৩ নভেম্বরই (১৯৯০) সানাউল হক নীরু, গোলাম ফারুক অভিসহ ৬ জন ছাত্রদল নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

এরপর শুরু হয় অন্য ঘটনা। ২৪ নভেম্বর নীরু-অভি বাহিনী ক্যাম্পাসে মিছিল করে এবং বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্যে বেগম জিয়ার প্রতি আহবান জানায়। তাদের সমর্থকরা ডাকসু অফিস ভাঙচুর করে এবং ডাকসু নেতা আমান, খোকন-আলমকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে।

তারা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলেও অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ তাদের স্বীকৃতি দেয় না। ফলে তারা আলাদা সমাবেশ করে। এই সমাবেশে সানাউল হক নীরু বলে, দীর্ঘদিন থেকে আমি বি.এন.পি-র সেবা করে এসেছি, আমার ভাই বাবলু বি.এন.পি-র কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে প্রাণ দেয়। কারাবরণও করতে হয়েছে আমাকে, বি.এন.পি-র কর্মকান্ড পরিচালনা করতে গিয়েই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হতে হয়েছে। আজ বি.এন.পি-ই আমাকে বহিস্কার করলো। আমাদের শ্রমে গড়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। এই সংগঠন থেকে আমাদের বহিস্কার করবে কারা?

সমাবেশে নীরু-অভি তাদের বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্যে বি.এন.পিকে ২৪ ঘন্টা সময় দেয়। বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমান-খোকনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবেনা বলে ঘোষণা করা হয়। বহিস্কৃত অন্যান্য ছাত্রদল নেতা রানা শিকদার, মাসুদ, গাজী কামরুল ইসলাম সজলও এতে বক্তব্য রাখে।

ছাত্রদলের এই অভ্যন্তরীণ সংকটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এক নতুন সংকটের দিকে যাত্রা করে। এরপর আর নতুন কি কি ঘটতে পারে তার অপেক্ষায় সাধারণ ছাত্রদের দিন কাটতে থাকে।

২৫ নভেম্বর (১৯৯০): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা

২৫ নভেম্বর ছাত্র আন্দোলনে নাটকীয় ঘটনার শুরু হয়। এদিন ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। নীরু-অভি বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অংশ নেয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন হলের সংসদ নেতারা এরই মধ্যে বিবৃতি দিয়ে নীরু-অভির পক্ষ অবলম্বন করে নিয়েছিল এবং তাদের বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছিল।

কিন্তু সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পেছনে সাধারণ ছাত্ররা ঢালাও ভাবে নেমে পড়লে নীরু-অভি বাহিনী ছাত্র সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের সাধারণ ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

এদিন (২৫ নভেম্বর, ১৯৯০) ১১টা ২০ মিনিটের সময় মধুর ক্যান্টিন থেকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটি মিছিল বের হয়। কিন্তু প্রথমবার মিছিলে ডাকসুর সহসভাপতি বা ছিল না। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলটি কলাভবন এক চক্কর দেয়ার পর যখন আবার প্রদক্ষিণ শুরু করে তখন মিছিলের সামনে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদকখায়রুল কবীর খোকনকে দেখা যায়। খোকনকে দেখে সাধারণ ছাত্ররা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায় এবং উল্লাসে ফেটে পড়ে।

মিছিলটি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে শেষ হয়। এখানে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলের সভাপতিত্বে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকনসহ বেশ ক'জন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতা বক্তৃতা করেন। 'জীবন দিতে প্রস্তুত আছি তবুও ছাত্র ঐক্য টিকিয়ে রাখবো'-খোকন যখন তার বক্তৃতায় একথা বলেন, তখন শত শত ছাত্র করতালির মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ করে।

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক খোকন যখন বক্তৃতা করছিলেন 'তখন ঢাকা-জ ৪৮১১ নম্বরের একটি এ্যাম্বুলেন্স ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। ডায়াবেটিক হাসপাতালের এই এ্যাম্বুলেন্সটি যখন কলাভবনের দক্ষিণ গেইট দিয়ে প্রবেশ করে তখনই ছাত্রদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া এ্যাম্বুলেন্স সম্পর্কে ক্যাম্পাসে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল; আর তা হলো 'ক্যাম্পাসে এ্যাম্বুলেন্স আসে লাশ নিতে-নতুবা অস্ত্র দিতে'।

এ্যাম্বুলেন্সটি থেকে ৫ জন যুবক নেমে ক্যাম্পাসের বিভিন্নদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে তাদের কখনো কোনদিন ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি। এ্যাম্বুলেন্সটি আসার পরপরই সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য তাদের সমাবেশ সংক্ষিপ্ত করে মিছিল বের করে। মিছিল বের হবার পরপরই এ্যাম্বুলেন্সটি সূর্যসেন হলের সামনে চলে যায়।

মিছিলটি মধুর ক্যান্টিন ঘুরে যখন কলাভবনের উত্তর দিকে লেকচার থিয়েটারের পশ্চিম কোণায় পৌছে, তখনই অস্ত্রধারীরা সূর্যসেন হলের সামনে থেকে এলোপাথাড়ি গুলী শুরু করে। এ সময় ৫০ রাউন্ড গুলী বর্ষিত হয়।

গুলী হওয়ার সাথে সাথে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং অনেক ছাত্র রাস্তায় শুয়ে পড়ে। কেউ কেউ মাথা নীচু করে দৌড়ে বিভিন্ন দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নেয়।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মিছিলে গুলী করা হয়েছে–একথা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সাধারণ ছাত্ররা পর্যন্ত উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়– এটা ছাত্রদলের কোন্দল নয়। সন্নকারী নীলনকশা। 'জাতীয় পার্টি ক্যাম্পাসে এসে পড়েছে–আপনারা সবাই একে প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ান'। সর্বদলীয় ছাত্রনেতাদের এ আহবানে ছাত্ররা আবার একত্রিত হতে থাকে।

এ সময় ছাত্রঐক্যের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণ রচনা করা হলে 'সরকারী এজেন্টরা' সূর্যসেন হল ও মহসীন হলে আশ্রয় নেয়। ১১ টা ৫০ মিনিট থেকে ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এ সংঘর্ষ চলে।

এই ৩৩ মিনিট সংঘর্ষ চলাকালে ১২টা ৮ মিনিট, ১২টা ১০ মিনিটে এবং ১২টা ১২ মিনিটের সময় পরপর তিনজন ছাত্রঐক্যের কর্মী গুলীবিদ্ধ হয়। সাথে সাথে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আরো একজন আহত হয়।

সূর্যসেন হলে মেইন গেইট বন্ধ করে ছাদে শুয়ে অস্ত্রধারীরা সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ছেলেদের প্রতি শত শত গুলী বর্ষণ করলেও সাধারণ ছাত্ররা মনোবল হারায়নি। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের এই অনমনীয় মনোবল বরং অস্ত্রধারীদেরই মানসিকভাবে চাপে ফেলে দেয়।

তাছাড়া, সূর্যসেন হল থেকে যতই গুলী বর্ষিত হচ্ছিল, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ছেলেরা ততই শ্লোগান সহকারে এগিয়ে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে অস্ত্রধারীরা সূর্যসেন হল ছেড়ে মুহসীন হলে চলে যায়। বেলা ১২টা ২৭ মিনিটের সময় ছাত্রদল নেতা রতনের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্ররা সূর্যসেন হলের গেইট ভেঙ্গে হলে প্রবেশ করে বিজয় উল্লাস করতে থাকে।

মহসীন হলে অস্ত্রধারী সাবেক ছাত্রদল নেতা এবং কথিত সরকারী এজেন্টরা মাত্র তিন মিনিট থাকতে পেরেছিল। তারা ফাঁকা গুলী করেছে অনেক, বোমা ফাটিয়েছে অনেক কিন্তু এরপরও সাধারণ ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে তারা কয়েক মিনিটের বেশী থাকতে পারেনি।

ঐ সময় হলে অবস্থানকারী একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাধারণ ছাত্র জানান, একেবারে শেষ পর্যায়ে অস্ত্রধারীরা ক্যাপ মাথায় দিয়ে বীরদর্পে ধীরে ধীরে হেঁটে হলের পিছনে চলে যায়। হলের দেয়াল এবং নবনির্মিত পৌর কর্পোরেশন দোকান পার হয়ে অপেক্ষারত একটি মাইক্রোবাসে উঠে তারা হল ছেড়ে চলে যায়। অন্যরা এর আগেই গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসেছিল। অস্ত্রধারীদের মধ্যে অন্যতম ছিল সদ্য জেল থেকে বের হওয়া ছাত্রদলের অভি। অভির সাথে সর্বমোট ৩৫ জনের মতো অস্ত্রধারী ছিল বলে ঘটনার সময় সূর্যসেন হলে অবস্থানকারী একজন ছাত্র জানান।

ঠিক সাড়ে ১২ টার সময় সাধারণ ছাত্ররা মহসীন হলের গেইট ভেঙ্গে দলে দলে ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু তখন পর্যন্ত ছাত্ররা নিশ্চিত ছিল না-অভি এখনো হলে আছে কি না। এ সময় প্রায় ১০ রাইন্ড গুলী বর্ষিত হয়। ছাত্ররা হলের প্রতিটি এলাকায় অভিকে খোঁজখুঁজি করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে না পেয়ে ছাত্ররা নিশ্চিত হয় যে, অভি তার দল নিয়ে পালিয়ে গেছে। ক্ষিপ্ত ছাত্ররা অভি যে রুমে থাকতেন সে রুমটিসহ তার সমর্থকদের রুম জ্বালিয়ে দেয়।

সূর্যসেন এবং মহসীন হল সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের কর্তৃত্ব আসার পরপরই সাধারণ ছাত্ররা উল্লাসে নাচতে থাকে। 'হৈ হৈ রৈ রৈ-জাতীয় পার্টির গুন্ডারা গেল কৈ' শ্লোগানে শ্লোগানে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত করে তোলে। সারা ক্যাম্পাস মিছিলে মিছিলে ছেয়ে যায়। হাজার হাজার ছাত্ররা মিছিলে শরীক হয়। এমনকি ছাত্রী কর্মীরাও গড়ান কাঠের লাঠি হাতে মিছিলে যোগ দেয়।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের এ আনন্দ মিছিল ২৫নভেম্বর গভীর রাত পর্যন্ত চলে। বিকেলে টিএসসিতেও মিছিল বের হয়।

বেলা ১টা ২৫ মিনিটের সময় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য অপরাজেয় বাংলা চত্বরে সমাবেশ করে। সমাবেশে যখন ছাত্রদের জানানো হয় যে, 'অভির নেতৃত্বে অস্ত্রধারীরা শহীদুল্লাহ হলে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা এখনি শহীদুল্লাহ হল ঘেরাও করব', তখন ছাত্রদের মধ্যে আবারো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সমাবেশ শেষে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের একটি বিশাল মিছিল শহীদুল্লাহ হলের দিকে যাত্রা করে। বাংলা একাডেমীর ভিতর থেকে ছাত্ররা বাঁশ নিয়ে এগিয়ে চলে। এ সময় হাজার হাজার ছাত্রের মিছিলে শত শত ছাত্রের লাঠি হাতের দৃশ্য এক অভাবনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে।

ছাত্ররা যখন শহীদুল্লাহ হলে পৌছে তখন অভি গ্রুপ হলে ছিল না। হলের ছাত্ররা জানায়, মাত্র ২০ মিনিট আগে অভি তার দলবল নিয়ে হল ছেড়ে চলে যায়। এ সময় ক্ষিপ্ত ছাত্ররা ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হলের নীরু-অভির সমর্থক বলে কথিতদের রুম ভাংচুর করে এবং আগুনে জ্বালিয়ে দেয়।

অভিসহ অস্ত্রধারীরা ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি আবাসিক হলের মোট ২১টি রুম ভাংচুর করে ও জ্বালিয়ে দেয়। এ সকল রুমে নীরু-অভিগ্রুপের ছেলেরা থাকতো বলে অনুমান করা হয়েছিল।

সূর্যসেন হলের ২৬৯ নং রুমটি ছাত্ররা ভাংচুর করে ও জ্বালিয়ে দেয়। এ রুমে ছাত্রদলের বহিষ্কৃত নেতা জুয়েল থাকতো। মহসীন হলের যে ৪টি রুম ভাংচুর ও জ্বালিয়ে দেয়া হয় সেগুলো হলো হল, সংসদের সহসভাপতি শাহজাহান হাওলাদার সুজনের ৫৫৭ নং রুম, সহ সাধারণ সম্পাদককামরুল ইসলাম সজলের ৪৫৬ নং, মাসুদুল হক মাসুদের ৪৫৮ নং এবং ২৫৪ নং রুম। শেষোক্ত রুমটিতে অস্থায়ীভাবে অভি থাকতো।

সলিমুল্লাহ হলের একটি মাত্র রুম ভাংচুর করা হয়। ২৬ নম্বর-এ রুমটিতে হল সংসদের সহসভাপতি ইকবাল রশীদ অপু থাকতো।

জগন্নাথ হলের দু'টি রুম ভাংচুর ও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। রুম দু'টি হলো ৪৪৯ ও ২১১। রুম দু'টি ভাংচুর করার সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সুনীল দাস নামক একজন ছাত্রকে মারধর করে।

সবচেয়ে বেশী রুম ভাংচুর করা হয় শহীদুল্লাহ হলে। এ হলে মোট ১০টি রুম ভাংচুর ও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। হল সংসদের ভিপির ২১৬, জিএস ২১৪, ক্রীড়া সম্পাদক ৩০১২ নং রুমগুলো ভাংচুর ও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া ২৩২, ৩০২, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪ ও ৬০৫ এ রুমগুলোতেও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

ফজলুল হক হলের ভিপি আশফাকের ৩৩২, পাঠকক্ষ সম্পাদকের ২০৫ নং রুম ছাড়া আরো একটি রুম (৩৫২) জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের ভূমিকা ছিল নির্লিপ্ত। তারা দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে ভিসির বাসভবনের সামনে দু'টি পুলিশের গাড়ী ছিল।

কিন্তু সংঘর্ষ শুরু হওয়ার সাথে সাথে পুলিশের গাড়ী দু'টি পিছিয়ে গিয়ে পলাশীর দিকে চলে যায়।

সকাল থেকেই পুলিশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশ মুখে সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ রিক্সা ছাড়া অন্য কোন যানবাহন ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়নি। সংঘর্ষ যখন শুরু হয় তখন পুলিশ অফিসারদের হাতে ওয়ারলেস নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। তাদের ভীষণ ব্যস্ত দেখালেও তাদের কোন কিছু করতে দেখা যায়নি।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য শুরু থেকেই ক্যাম্পাসে যাতে পুলিশ না আসতে পারে তার জন্য তৎপরতা চালায়। সাধারণ ছাত্রদের বলতে শোনা যায়, যদি এখন পুলিশ ক্যাম্পাসে আসে তাহলে অস্ত্রধারীদের তাড়ানো যাবে না। ক্যাম্পাসে একটি ধারণা বহুদিন ধরেই প্রচলিত ছিল, ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি কেবল অস্ত্রধারীদেরই নিরাপত্তা দেয়। সাধারণ ছাত্রদের নয়।

পুলিশের সামনে অস্ত্রধারীরা যখন মহসীন হলের পিছন দিয়ে গাড়ীতে করে পালিয়ে যাচ্ছিল তখনো পুলিশ দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।
নীরু-অভিবাহিনী ধানমন্ডী ২৭ নম্বর সড়কে অবস্থিত বি.এন.পি কার্যালয় এদিন দখল করে রাখে।

ডা: মিলন হত্যা: আগুন ছড়িয়ে পড়লো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের সম্মিলিত অভ্যুত্থানে বিতাড়িত নীরু-অভি বাহিনী ২৬ নভেম্বর সশস্ত্র যুবকদের এক বিরাট বহর নিয়ে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে। প্রথমে তারা শহীদুল্লাহ হল ও ফজলুল হল দখল করে নেয়। পরে দোয়েল চত্ত্বর দিয়ে বাংলা একাডেমী সড়ক ঘেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অভিযান চালালে তাদের গুলী-বোমার মুখেও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের হাজার হাজার কর্মী ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের কাছে তাদের প্রতিরোধ করে। এই সময় একজন নিরীহ যুবক নিমাই নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়।

প্রতিরোধের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পলায়ন করে। কয়েক হাজার গুলী বর্ষণ ও বোমাবাজির পরও হাইকোর্ট মোড়ে শত শত

পুলিশ নীরব থাকে। সাধারণ মানুষ সরকার কর্তৃক প্রেরিত এই সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করে এবং কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করছে, এতোদিনের বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

২৭ নভেম্বরও নীরু-অভি বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের অভিযান অব্যাহত থাকে। দোয়েল চত্ত্বর থেকে বাংলা একাডেমী পর্যন্ত যায়গা অস্ত্রধারীরা দখল করে রাখে।

এই সময় এই এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের কয়েকজন নেতা মেডিকেল কলেজের দিকে আসছিলেন। অকস্মাৎ তাদের দিকে গুলী ছুঁড়ে সন্ত্রাসকারীরা। বি.এম.এ-র যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন এই গুলীতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

ডাঃ মিলনের নিহত হওয়ার খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র রাজধানীতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। রাজপথে একে একে জঙ্গী মিছিল ব্যস্ত সড়কগুলীকে প্রকম্পিত করে তোলে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সকল শিক্ষক ও ডাক্তার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন।

সারা শহরে এরই মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, আজ রাতেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা হতে পারে। সম্ভাব্য জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে আগাম প্রতিবাদ মিছিল হতে থাকে। জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে আগাম শ্লোগান দিয়ে ছাত্র জনতা রাজপথ গরম করে তোলে।

সচিবালয় থেকে জেনারেল এরশাদের মন্ত্রীরা সামরিক আইন জারী হচ্ছে, এই রকম আশাবাদ নিয়ে ২৭ নভেম্বর অফিস ত্যাগ করে। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীরাও এই সময় রাষ্ট্রের সকল কেন্দ্রীয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারাও জানতেন না কি হতে যাচ্ছে। তবে কেউ কেউ বুঝতে পারছিলেন, তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে।

একমাত্র খোদা জানে, ডাঃ মিলন হত্যার প্রতিক্রিয়ায় পরদিন ২৮ নভেম্বর মানুষ কি করতো। যদি জরুরী অবস্থা না হতো তাহলে সেদিনই সরকারের পতন হতো। মিলন হত্যার প্রতিশোধ কামনায় মানুষ পাগল হয়ে উঠেছিল।

তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে তা ভঙ্গ করা হবে। রাতে জেনারেল এরশাদ এক ভাষণ দিয়ে সত্যি সত্যি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে করে 'কারফিউ ও ইমার্জেন্সী' ভঙ্গ করে শত শত মিছিল পাড়া-মহল্লা থেকে বেরিয়ে পড়ে। 'এরশাদের ঘোষণা, ছাত্র জনতা মানে না' শ্লোগান দিতে দিতে তারা রাজপথে এসে পড়ে।

২৮ নভেম্বর (১৯৯০) সকালে কারফিউ ও জরুরী অবস্থা ভঙ্গ করে ছাত্রদের মিছিল শহীদ মিনার হয়ে সচিবালয় এলাকায় পর্যন্ত চলে যায়। পুলিশ, বি.ডিআর সেনাবাহিনীর টহলদানকারী গাড়ীগুলীতে মেশিনগান উচানো উদীপড়া জোয়ানরা তাজ্জব বনে যায়। মিছিলে শত শত সাহসী ছাত্রী-বোনকে দেখে তারা আরো অবাক হয়ে বসে। রামপুরাকে ছাত্র জনতা মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে। মালিবাগে কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিলকালে ২ জন নিহত হয়। সারাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষের নিহত হওয়ার খবর আসতে থাকে। আহত হয় শত শত।

সংবাদপত্রে ধর্মঘট: শিক্ষকদের পদত্যাগ: এরশাদের টঙ্গিব্রীজ পরিদর্শন

২৭ নভেম্বর (১৯৯০) রাতেই বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে পত্রিকা বের হবে না বলে ঘোষণা করেছিলেন। ২৮ নভেম্বর তাই আর কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। সরকার পক্ষ থেকে প্রাণান্তকর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ সিদ্ধান্তে অটল থাকে। পূর্বেই তথ্যমন্ত্রী ড. শেলীকে বদলিয়ে গোলাম মোস্তফাকে তথ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আরো বেশী ব্যর্থতার পরিচয় দেন। সাংবাদিকরা এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত আর বাংলাদেশে খবরের কাগজ বের করে নি।

২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক এক যোগে পদত্যাগ করেন। ছাত্র শিক্ষকদের চাপে উপাচার্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞাও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ পদত্যাগের হিড়িক শুরু হয়। ঢাকায় কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল অব্যাহত থাকে। গুলীতে রক্তদানও অব্যাহত থাকে। দেশের বিভিন্নস্থানে মন্ত্রী, সাবেক মন্ত্রীদের বাড়ীতে হামলা চলে।

খুলনায় ছাত্র–জনতা এমন করে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখে যে, পুলিশ ও বি. ডি. আর দৌলতপুর ও খালিসপুর এলাকায় ঢুকতেই পারে নি।

রাতে টেলিভিশনে খবরে দেখানো হয়, জেনারেল এরশাদ টঙ্গিতে একটি ব্রীজ পরিদর্শন করছেন, যেন দেশে কিছুই ঘটছেনা। কিন্তু এতটুকু দৃশ্যেও মূল পরিস্থিতি ভেসে ওঠে। জেনারেল এক যায়গায় গেলে ভাড়াটিয়া মানুষ ও ফুলে সয়লাব করে দেওয়ার জন্যে এদিন কাউকে পাওয়া গেল না। টেলিভিশন ক্যামেরা যেদিকেই ঘুরালো, সেদিকেই জনশূন্য প্রান্তর খাঁ খাঁ করতে থাকে।

গুলী: হত্যা: গায়েবানা জানাযা

৩০ নভেম্বর (১৯৯০) শুক্রবার জুমআ নামাজের জন্যে দু'ঘন্টার কারফিউ শিথিল ঘোষণা দেওয়া হলে মসজিদে মসজিদে গায়েবানা জানাযার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে পুলিশ বি.ডি.আর এবং সেনাবাহিনী, মুসল্লীদের নামাজে বাধা দেয়। কিন্তু মসজিদের খতিব হস্তক্ষেপ করলে মুসল্লীরা নামাজ পড়ার সুযোগ পায়। নামাজ শেষে হাজার হাজার জনতার বিশাল বিশাল মিছিল রাজপথে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেনাবাহিনী রহস্যময় কারণে বাধা দেয় না, নিস্ক্রিয় থাকে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। একই স্থানে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের শিল্পীরা এসে তাদের সাথে যোগ দেয়, এতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে অভিনেত্রী সুবর্ণা মোস্তফা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন।

রামপুরা ওয়াপদা রোডে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় বাসায় ঢুকে বি.ডি.আর–রা পাকিস্তানী কায়দায় এক মাকে হত্যা করে।

পয়লা ডিসেম্বর মীরপুরে হরতারের সমর্থনে জনতার বিশাল মিছিলে বি.ডি.আর–এর গুলীতে ঘটনাস্থলেই ৫ জন নিহত হয়। কাজীপাড়ায় নিহত হয় ২ জন, ডেমরা–যাত্রাবাড়ী এলাকায় ২জন, চট্টগ্রামে কালুরঘাটে সেনাবাহিনীর হাতে ১ জন নিহত, খুলনায় এরশাদের কুশপুত্তলিকা দাহ করার সময় রিক্সাচালক মহারাজ গুলীতে নিহত, নারায়ণগঞ্জে মন্ডলপাড়ায় রাতে একজন গুলীতে নিহত হয় এক কিশোর। সারাদেশ থেকে এমনি নিহত হওয়ার আরো খবর আসতেই থাকে।

খুলনায় ছাত্র–জনতা এমন করে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখে যে, পুলিশ ও বি. ডি. আর দৌলতপুর ও খালিসপুর এলাকায় ঢুকতেই পারে নি।

রাতে টেলিভিশনে খবরে দেখানো হয়, জেনারেল এরশাদ টঙ্গিতে একটি ব্রীজ পরিদর্শন করছেন, যেন দেশে কিছুই ঘটছেনা। কিন্তু এতটুকু দৃশ্যেও মূল পরিস্থিতি ভেসে ওঠে। জেনারেল এক যায়গায় গেলে ভাড়াটিয়া মানুষ ও ফুলে সয়লাব করে দেওয়ার জন্যে এদিন কাউকে পাওয়া গেল না। টেলিভিশন ক্যামেরা যেদিকেই ঘুরালো, সেদিকেই জনশূন্য প্রান্তর খাঁ খাঁ করতে থাকে।

গুলী: হত্যা: গায়েবানা জানাযা

৩০ নভেম্বর (১৯৯০) শুক্রবার জুমআ নামাজের জন্যে দু'ঘন্টার কারফিউ শিথিল ঘোষণা দেওয়া হলে মসজিদে মসজিদে গায়েবানা জানাযার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে পুলিশ বি.ডি.আর এবং সেনাবাহিনী, মুসল্লীদের নামাজে বাধা দেয়। কিন্তু মসজিদের খতিব হস্তক্ষেপ করলে মুসল্লীরা নামাজ পড়ার সুযোগ পায়। নামাজ শেষে হাজার হাজার জনতার বিশাল বিশাল মিছিল রাজপথে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেনাবাহিনী রহস্যময় কারণে বাধা দেয় না, নিষ্ক্রিয় থাকে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। একই স্থানে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের শিল্পীরা এসে তাদের সাথে যোগ দেয়, এতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে অভিনেত্রী সুবর্ণা মোস্তফা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন।

রামপুরা ওয়াপদা রোডে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় বাসায় ঢুকে বি.ডি.আর–রা পাকিস্তানী কায়দায় এক মাকে হত্যা করে।

পয়লা ডিসেম্বর মীরপুরে হরতারের সমর্থনে জনতার বিশাল মিছিলে বি.ডি.আর–এর গুলীতে ঘটনাস্থলেই ৫ জন নিহত হয়। কাজীপাড়ায় নিহত হয় ২ জন, ডেমরা–যাত্রাবাড়ী এলাকায় ২জন, চট্টগ্রামে কালুরঘাটে সেনাবাহিনীর হাতে ১ জন নিহত, খুলনায় এরশাদের কুশপুত্তলিকা দাহ করার সময় রিক্সাচালক মহারাজ গুলীতে নিহত, নারায়ণগঞ্জে মন্ডলপাড়ায় রাতে একজন গুলীতে নিহত হয় এক কিশোর। সারাদেশ থেকে এমনি নিহত হওয়ার আরো খবর আসতেই থাকে।

ভ্রাম্যমান আদালতে এরশাদের ফাঁসি কার্যকর

২ডিসেম্বর (১৯৯০) রাজধানীতে ছাত্রদের ভ্রাম্যমান আদালত বসে। এখানে বিচার শেষে জেনারেল এরশাদকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এরশাদের কুশপুত্তলিকা গাছে ঝুলিয়ে এই ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়।

এদিনে 'কাকে ক্ষমতায় রাখার জন্য ভাইয়ের বুকে গুলী করছেন?' শীর্ষক একটি প্রচারপত্র ছেপে সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশের গাড়ীতে বিতরণ করা হয়। প্রচারপত্রটি সশস্ত্র বিভিন্ন সরকারী বাহিনীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

যুবনেতা মাহাবুব জামান প্রচারপত্রটির খসড়া করেন এবং ইলিয়াস মল্লিক ও এনায়েত হোসেন খান তা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ছেপে সারা শহরে বিলির ব্যবস্থা করেন।

সচিবালয়ে মিছিল

৩ ডিসেম্বর (১৯৯০) সচিবালয়ে প্রকাশ্যে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। তরুণ বি.সি.এস অফিসাররা এই মিছিলে নেতৃত্ব দেয়। 'এরশাদের চাকরী–আমরা করি না' শ্লোগান দিয়ে সিভিল সার্ভেন্টরা তাদের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। এর ফলে সচিবালয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মন্ত্রী ও সচিবরা তাঁদের অফিস কক্ষ ত্যাগ করে নিরাপদ কক্ষে আশ্রয় নেয়। এদিন বিভিন্ন সার্ভিসের কয়েকশত অফিসার তাদের পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সিভিল সার্ভেন্টদের নেতা ড. মহীউদ্দিন খান আলমগীর সকল ক্যাডারের সদস্যদের নেতৃত্ব দিয়ে সাহসী ভূমিকা রাখেন। এই সময় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও আন্দোলনে যোগ দেয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পদত্যাগের হিড়িক লেগে যায়। অফিস কক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদের আলোকচিত্র অপসারণ শুরু হয় এবং সরকারী কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে সভায় তা পা দিয়ে মাড়াতে থাকেন।

রাজপথে টহলরত সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশের গাড়ী থেকে মিছিলের প্রতি হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানানো হয়। উৎসাহী মিছিলকারীরা সশস্ত্র বাহিনীর গাড়ীগুলির কাছে গিয়ে তাদের সাথে হাত মেলায় ও করতালি দেয়।

'এরশাদ কাইত হইছে'

তিন ডিসেম্বর রাতে বাংলাদেশ টেলিভিশনে জেনারেল এরশাদ শর্ত সাপেক্ষে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তিনি নির্বাচনের পনের দিন আগে তার সরকারের পদত্যাগের কথা বলেন।

৪ ডিসেম্বর (১৯৯০) এরশাদের নতুন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রাজপথে লাখো মানুষের ঢল নামে।

'এরশাদ তুই এখন যাবি' শ্লোগানে সমগ্র রাজধানী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এরশাদের কুশপুত্তলিকায় ছাত্র–জনতা আগুন ধরিয়ে দেয়।

বিকেলে তিন জোটের বিশাল গণজমায়েতে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে কাল বিলম্ব না করে এরশাদকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক আটদলের সভায় বলেন, 'এরশাদ কাইত হইছে, পড়ে নাই, তাকে আরেকটু ঠেলা দিতে হইব'।

এদিন রাতেই ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ টেলিভিশনে উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমেদ, এরশাদের প্রস্তাবের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন। এই মর্মার্থ ব্যাখ্যার সাক্ষাৎকার ধারণের জন্যে টেলিভিশনের কোনো প্রযোজক–পরিচালককে পাওয়া যায় নি। সংবাদ বিভাগের সাধারণ কর্মচারী মিয়া সালাউদ্দীন সাক্ষাৎকারটি নেন, কিন্তু তাঁকে সামনে থেকে দেখানো হয় নি, পেছন থেকে ক্যামেরা সেটে তিনি মওদুদকে প্রশ্ন করেন। এতে প্রমাণিত হয়ে যায়, সরকার আর নেই, সমগ্র কলকব্জা ভেঙে পড়েছে।

এদিন রাতে বি.বি.সি–র সাথে এক সাক্ষাৎকারে শাহ মোয়াজ্জেম বিরোধীদের এরশাদের পদত্যাগ দাবী প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে বলেন, পদত্যাগপত্র কি এরশাদ প্রেসক্লাবে বা জিরো পয়েন্টে দিয়ে আসবেন?

অবশেষে এরশাদের পদত্যাগ : মুক্তির আনন্দে বিজয় উল্লাস

কিন্তু এদিন রাতেই (৪ ডিসেম্বর, ১৯৯০) রাত দশটার বাংলাদেশে টেলিভিশনের ইংরেজী সংবাদে জেনারেল এরশাদ তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। কিন্তু বাংলাদেশের খুব কম লোকই এই বিজয় সংবাদ শুনতে পান। বাংলাদেশের মানুষ তখন ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদ বুলেটিন খুলে বসে আছে, দেশের সর্বশেষ

পরিস্থিতি কি জানার জন্য। দেশের রেডিও-টেলিভিশনের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই। ১৯৭১ সালে ছিল না, ১৯৯০ সালেও নেই। কিন্তু এখানেও কেউ পদত্যাগের খবরটি শোনে নি। কারণ ভোআ সর্বশেষ খবরটি তখনও পায় নি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সমান ভূমিকা পালন করে বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, বি.বি.সি গত কুড়ি বছর ধরেই এদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে প্রিয় বেতার কেন্দ্র। রাত সাড়ে দশটা। বি.বি.সি-র সংবাদ বুলেটিন খুলে বাংলার মানুষ অপেক্ষা করতে থাকে। বি.বি.সি বলে, জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করেছেন,।

সংবাদ শিরোনামে এই লাইনটি শোনার পর মানুষ আর দ্বিতীয় লাইন শোনার অপেক্ষা করতে পারে নি। লাখো কণ্ঠের চিৎকারে বাংলার আকাশ-বাতাস উল্লসিত হয়ে ওঠে। রাতের অন্ধকার ছিন্ন করে এই গভীর রাতেই রাজধানী সহ সারাদেশে বিজয় মিছিল বের হয়ে যায়। আনন্দে ছাত্র জনতা নৃত্য করতে থাকে এবং ঘন্টা, থালা, বাসন বাজাতে থাকে। ঘুমের কাপড় পড়েই মানুষ রাস্তায় নেমে যায়। মেয়েদের পরনে ছিল 'ম্যাক্সি'।

পায়ের তলায় পিষ্ট হতে থাকে জেনারেল এরশাদের প্রতিকৃতি। আল্লাওয়ালা ভবনে অবস্থিত জাতীয় পার্টির অফিস ও জাসদ (রব) অফিসে মানুষ এই রাতেই আগুন লাগিয়ে দেয়।

মন্ত্রীদের পলায়ন : মানুষের নৃত্য

মিন্টু রোডে অবস্থিত মন্ত্রিপাড়া থেকে মন্ত্রীদের পলায়ন শুরু হয়। জনতা চারদিক ঘিরে থাকে মন্ত্রিপাড়া। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লাখো মানুষ ঘিরে রাখে কাউকে পালাতে দেওয়া হবে না।

১৯৮২ সালে এরশাদ যেদিন ক্ষমতায় এসেছিলেন, সেদিন যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সেইসব ছাত্রনেতা এবং 'নব্বইয়ের সন্তান' ছাত্রনেতা যাঁরা এরশাদকে বিদায় করতে সমর্থ হয়েছেন, দুই প্রান্তের ছাত্রনেতা-কর্মীরা হাতে হাত ধরে বিজয় মিছিল বের করে। ৮২ সালের প্রায় সকল ছাত্রনেতাই ছাত্র রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে অন্য বৃহত্তর আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। ছাত্র রাজনীতিতে থেকেই এরশাদের বিদায় দৃশ্য তাঁরা দেখে যেতে পারেন নি।

এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের নেতা মোস্তফা ফারুক, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, জাসদপন্থী ছাত্রলীগের নেতা নাজমুল হক প্রধান। তাঁরা ৮২ সালে এরশাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাতের সাথে জড়িত ছিলেন এবং ১৯৯০ সালে এরশাদকে পদত্যাগ ও গ্রেফতার করে তারপর ছাত্র রাজনীতি থেকে বিদায় নেন।

পরদিন ৫ ডিসেম্বর (১৯৯০) ঢাকার রাজপথ লক্ষ কোটি মানুষের বিজয় উল্লাসের পদভারে স্ফুর্ত হয়ে ওঠে। চেনা নেই, জানা নেই, যে যাকে পাচ্ছে, তাকে ধরেই বুকে বুক মিলিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে থাকে। কাউকে কাউকে দেখা যায়। মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে মুক্তির নিশ্বাস নিচ্ছে। কেউ কেউ কাঁধে করে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে বিজয় উৎসবে যোগ দেয়।

৫ ডিসেম্বর তিন জোটের সারাদিন কাটে নতুন একজন অস্থায়ী ও তত্ত্বাবধায়ক রাষ্টপতির নাম ঠিক করতে। দেশের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নাম ঠিক হয়, তবে মতানৈক্য হচ্ছিল তিন জোটের নেতাদের মধ্যে।

মহাকাব্যিক পটভূমির নায়ক বাংলাদেশের বীর গৌরব গাঁথার রচয়িতা বাংলার ছাত্র সমাজকে এখানেও হস্তক্ষেপ করতে হয়। যদি ছাত্রনেতারা সেদিন তিনজোটের সভায় আকস্মিকভাবে উপস্থিত না হতেন, তাহলে কল্পনা করাও কষ্ট, এতো বড় একটা বিজয়ের পরিণতি কি হতো, কারণ ষড়যন্ত্র তখনো চলছিল, ভেতরে ভেতরে। নাম নিয়ে বিতর্ক, মতানৈক্য চলছিল তখনো, একমত হতে পারছিলেন না রাজনীতিকরা।

তিন জোটের সভাস্থলে ছাত্রনেতাদের উপস্থিতির কয়েক মিনিটেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্য কেউ নয়, দেশের প্রধান বিচারপতিই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন।

সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতায়

সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল নূরুদ্দিন খান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল আমীর আহমদ মোস্তফা ও বিমান বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার কমোডর ইরফান উদ্দিন সহ সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতা হস্তান্তরে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে। গুজব ছিল, শেষ চেষ্টা হিসেবে সামরিক আইন জারী করে আরো কয়েকদিন ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন জেনারেল এরশাদ। কিন্তু মানুষ তখন রাস্তায় তাজা প্রাণ নিয়ে। সশস্ত্র বাহিনী রাজী হয় নি তার শেষ খায়েশে।

বিশ্ব বেহায়ার বিদায়

৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে অনেকটা কুজো হয়ে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। 'বিশ্ব বেহায়া' খেতাব পেয়েছিলেন তিনি। ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিনি গাড়ীতে পতাকা উড়িয়ে এলেন, গেলেন পতাকা নামিয়ে। বিকেল তখন পৌনে তিনটা।

বাংলালাদেশের লক্ষ কোটি মানুষ ক্ষমতা হস্তান্তরের এই দৃশ্য টেলিভিশন সংবাদ বুলেটিনে উপভোগ করে। এই দুই দিন আগেও তিনি এই দেশের 'রাজা' ছিলেন। তাঁর রাণী 'বাংলাদেশের ইমেলদা' বেগম রওশন, যার কথায় সূর্য ডুবতো এবং ভাসতো বলে খ্যাতি ছড়িয়েছিল, তাঁদের প্রবল প্রতাপ এক মুহূর্তে কোথায় তলিয়ে গেল।

আর এরই মধ্য দিয়ে সাঙ্গ হল ব্যক্তিকেন্দ্রীক দুঃশাসনের আট বছর দুইশত ছাপান্ন দিন। জগদ্দল একটি পাথর নেমে গেল বাংলার বুকের উপর থেকে।

ইতিহাসের শিক্ষা

১৯৫৮ সালে গণতন্ত্রকে খুন করে এদেশে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব বন্দুক দিয়ে দেশ শাসন করতে এসেছিলেন, গলায় গামছা বেঁধে চামচা-চামুন্ডা সহ এদেশেরই জনগণ ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ তাদের গদী থেকে নামিয়ে ছেড়েছিল।

১৯৭১ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া শিক্ষা নিলেন না এর থেকে। ট্যাংক দিয়ে দেশ শাসন করতে চাইলেন। জনতা ট্যাংকও গুড়িয়ে দিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আবার গণতন্ত্র হত্যা করে ট্যাংক নামানো হল। দীর্ঘ পনের বছর লাগলেও ছাত্র-জনতা আবারো তার প্রতিশোধ নিল, শিক্ষা দিল নির্মম প্রতিশোধ, নির্মম শিক্ষা।

কৌতুক করে অনেকে বলেন, 'ইতিহাসের শিক্ষা হল, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না'। বাংলাদেশে একথা কি মিথ্যা হবে না!

সূত্র সম্পর্কিত তথ্য:

১. লে. জে এইচ. এম. এরশাদ, বাংলাদেশে আর্মী জার্নাল, জানুয়ারী ১৯৭৯ আরো দেখুন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ডিসেম্বর ৪ (১৯৮১) এবং সাপ্তাহিক হলিডে, জানুয়ারী ৩, ১০ (১৯৮২)

২. দৈনিক দেশ: ২৫,২৮,২৯, মার্চ এবং ১০ ও ১২ এপ্রিল

৩. সাক্ষাৎকার: মোস্তফা ফারুক (সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ১৯৮৯-৯০)

৪. সাক্ষাৎকার: খন্দকার মো: ফারুক ও আনোয়ারুল হক (সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন,,

৫. সাক্ষাৎকার: খন্দকার মোঃ ফারুক, ও আনোয়ারুল হক, মোস্তফা ফারুক

৬. জাতির প্রয়োজনে শিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩

৭. ছাত্রবার্তা (ডাকসুর মুখপত্র), ২১ অক্টোবর, ১৯৮২

৮. সাক্ষাৎকার: খন্দকার ফারুক, আনোয়ারুল হক, খ.ম জাহাঙ্গীর, (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ১৯৮২-৮৩), এবং মোস্তফা ফারুক

৯. সাক্ষাৎকার: প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, এবং ছাত্রবার্তা (১৪ নভেম্বর, ১৯৮২)

১০. ইশতেহার (জাসদপন্থী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মুখপত্র), নভেম্বর, ১৯৮২

১১. ঐ এবং সাক্ষাৎকার: মুশতাক হোসেন (সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ১৯৮৮-৮৯) এবং আনোয়ারুল হক, মোস্তফা ফারুক

১২. সাক্ষাৎকার: খন্দকার মো: ফারুক, আনোয়ারুল হক, মোস্তফা ফারুক

১৩. সাক্ষাৎকার: মোস্তফা ফারুক

১৪. সাক্ষাৎকার: মোস্তফা ফারুক ও আনোয়ারুল হক

১৫. সাক্ষাৎকার: মোস্তফা ফারুক

১৬. সাক্ষাৎকার: জিয়াউদ্দীন বাবলু (সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু ৯১৮১-৮২ ও

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ১৯৮০–৮৩)
১৭. সামনে আছে জোর লড়াই (পুস্তিকা), সংগ্রামী ছাত্র সমাজ–এর নামে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রকাশনা, ১৯৮২
১৮. ইশতেহার, ২৪ মে ১৯৮৩
১৯. সাক্ষাৎকার: জিয়াউদ্দীন বাবলু
২০. সাক্ষাৎকার: মোস্তফা ফারুক
২১. সাপ্তাহিক একতা, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৩
২২. সাক্ষাৎকার: মোস্তফা ফারুক
২৩. সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৮৬
২৪. সাক্ষাৎকার: আখতারুজ্জামান (সহসভাপতি, ডাকসু ১৯৮১–৮২ এবং সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ১৯৮০–৮৬) এবং
রফিকুল হক হাফিজ,(আহবায়ক, নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ, ১৯৮৪) এবং
আনোয়ারুল হক, (সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৮৫–৮৬)
দৈনিক খবর, ৪, ৬, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৮৬
২৫. সংবাদ, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৬
২৬. সাংবাদ, ৯ মার্চ ১৯৮৭
২৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রশ্নোত্তর বুলেটিন, ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা
২৮. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রশ্নোত্তর বুলেটিন, তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭
২৯ দৈনিক খবর, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৮৮
৩০. দৈনিক খবর, ১২ জুন ১৯৮৮
৩১. সংবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
৩২. বাংলারবাণী ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮, আজাদ ৩ জানুয়ারী ১৯৮৯, সংবাদ ১১ জানুয়ারী ১৯৮৯ এবং দৈনিক ইত্তেফাক ১০ মার্চ ১৯৮৯
৩৩. বাংলার বাণী ও সংবাদ ১৩ জানুয়ারী
৩৪ দৈনিক জনতা, ২৯ জানুয়ারী ১৯৮৯
৩৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

৩৬. সাক্ষাৎকার: মুশতাক হোসেন, মোস্তফা ফারুক
৩৭. সাক্ষাৎকার: মোস্তফাফিজুর রহমান বাবুল ও নাসির-উদ-দুজা (সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৮৯-৯১)
৩৮. সংবাদ, ২৪ অক্টোবর ১৯৮৯
৩৯. শামসুর রাহমান, ছাত্র ঐক্য অটুট রাখা চাই, সংবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
৪০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সময় বহিয়া যায়, সংবাদ, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
৪১. সাপ্তাহিক একতা, ১২ জানুয়ারী ১৯৯০
৪২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য অধিদপ্তর, তথ্য বিবরণী, নম্বর: ২৯৫২ তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ১৯৯০
৪৩. সাপ্তাহিক সানডে এক্সপ্রেস, ৪ নভেম্বর, ১৯৯০